অনীক

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৪
বর্ষ ৫০ ❑ সংখ্যা ৭-৮
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

অর্জিত অধিকার, অর্পিত অধিকার

তর্কবিতর্কের সময়ে প্রায়শ আমরা বলে থাকি— ''অধিকারের সীমা ছাড়িও না''। অধিকারের সীমাটা কী? কে ঠিক করে এই সীমারেখা? সেই উপনিষদের কালে গার্গী যখন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিলেন, ঋষি মশাই জবাব দিতে না পেরে গার্গীকে অধিকারের সীমারেখা লঙ্ঘনের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। রামরাজ্যে বেদ পড়ার অপরাধে শম্বুক চণ্ডালের মাথা কাটা গিয়েছিল। আধুনিক যুগে সিধো-কানহু লড়াই করেছিল জঙ্গলের অধিকারের দাবিতে। বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, ''স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার''।

অধিকারের বিস্তার বিপুল, বিন্যাস বহুতর। সমাজ যত এগিয়েছে, অধিকার চেতনার পরিসরও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার দাবিতে, দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্তির দাবিতে মানুষের অধিকার সচেতনতা সীমাবদ্ধ থাকেনি। মানুষ দাবি করেছে শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, চিন্তার অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও পরিবেশ রক্ষার অধিকার। রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'মানবাধিকারের সনদে' মনুষ্যত্ব বিকাশের এই মৌলিক দাবিগুলির অধিকাংশই স্বীকৃত। স্বাধীন ভারতের সংবিধানও তার নাগরিকদের দিয়েছে একগুচ্ছ মৌলিক অধিকার। তবু বিশ্বের অর্ধেক মানুষ খাদ্যের ন্যূনতম অধিকার থেকেই বঞ্চিত। মানুষের বাঁচার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, সংস্কৃতির অধিকারের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বাণিজ্যিক স্বার্থ, মুনাফার স্বার্থ। প্রান্তিক মানুষের জীবন-জীবিকার প্রাথমিক উৎসগুলি দখল করছে পুঁজি। যেমন হয়েছে ভারতে। বিদেশি কোম্পানি 'পস্কো' দখল করেছে উরিষ্যার প্রান্তিক মানুষের জমি-জিরেত। উরিষ্যারই প্রান্তরে নিয়মগিরির আদিবাসীদের তাদের সংস্কৃতি, জঙ্গল রক্ষার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে স্টারলাইট-বেদান্তের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার দাবির জন্য মারুতি কারখানার শ্রমিকদের ছাঁটাই-হাজতবাসের মুখোমুখি হতে হয়।

অধিকারকে কেন্দ্র করে যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে অবিরাম এক সংঘাত বহমান। রাষ্ট্র চায় অধিকারকে গণ্ডিবদ্ধ করতে। অপর দিকে অবস্থান করছে শাসিত, অবদমিত এবং প্রতিস্পর্ধী জনতা— যারা গণ্ডির অবরোধ ভাঙতে চায়। তাবৎ দুনিয়াকে পুঁজির গোলাম বানাতে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের এযাবৎ প্রাপ্ত ন্যায্য অধিকারগুলি। অনুদান প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিস্থাপিত করতে চাইছে অধিকার বোধকে। প্রাপ্য আর প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব, অর্জিত আর অর্পিত অধিকারের দ্বন্দ্ব তাই শেষ বিচারে শ্রেণী বিরোধেরই অভিব্যক্তি।

অনীক-এর এবারের সংখ্যার মূল বিষয়বস্তু 'অধিকার ভাবনা'। অধিকার যে বিমূর্ত কোনো বিষয় নয়, তা আদতে শ্রেণী ভাবনার ফসল এবং আধিপত্যকারী শ্রেণী তাদের আধিপত্য বিস্তারের কারণেই দেশে দেশে মানবাধিকার পদদলিত করে— এই বিষয়টাকেই 'মানবাধিকারের রাজনীতি' হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন *অনীক*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী। মানবাধিকার আন্দোলনের দিশা-সন্ধানী এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করা হলো।

বাজার অর্থনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থায় পুঁজির শাসনে শাসকের জোরজুলুম যথারীতি চলছে, শাসিতের অধিকারগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। শাসিতের অধিকার কীভাবে শাসকশ্রেণী কব্জা করছে, তারই বিশ্লেষণ করেছেন শ্রী শুভেন্দু দাশগুপ্ত।

উত্তর আধুনিক চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে মানবাধিকার আন্দোলনকে, শ্রেণী রাজনীতি বিরহিত নিছক এক সামাজিক আন্দোলন হিসাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গীকে তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন শ্রী রতন খাসনবীশ।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব জন্ম দিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। শ্রমিক-কৃষক-নারীর অধিকার, মানবাধিকার স্বীকৃতি পেল রাষ্ট্রিয় সংবিধানে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকার ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রী শ্যামল দাস।

অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সংবাদ মাধ্যম বা মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য কিন্তু বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। কর্পোরেট সংস্থা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে যে উৎসাহী তা নয়। বরং পুঁজির অনুশাসনই মেনে নেয়। কিন্তু সেই মিডিয়াই গণআন্দোলনের প্রবল চাপে অনেক সময়ই ইতিবাচক ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রী বিপ্লব রায়।

জমির উপর অগ্রাধিকার কার, পুঁজির না ভূমিজীবী মানুষের? ভূমি-নির্ভর মানুষের চিরন্তন অধিকারগুলির উপর পুঁজির আক্রমণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন শ্রী প্রণব দে।

যুগ যুগ ধরে বনাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলির বনভূমি কিংবা জঙ্গলজাত বস্তুর উপর কোনো অধিকার ছিলনা। ঔপনিবেশিক এই ভাবনায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছে 'সাম্প্রতিক বনাধিকার আইন'। কিন্তু আইন হলেও প্রয়োগে অনীহা সরকারের। বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন শ্রী সুমন গোস্বামী।

শাসক আর শাসিতের দ্বন্দ্বে রাজদ্রোহ এক পরিচিত সামাজিক ঘটনা। ভারতে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রদ্রোহের নামে কীভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে দমন করা হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন শ্রী সমরেশ মিত্র।

বিগত দশকে শ্রীলঙ্কা সরকারের তামিল-বিরোধী যুদ্ধে যে বহু সাধারণ তামিল নিহত হয়েছে, একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের যে অভিযোগ উঠেছে, তা সেই সরকার ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছে। ভারতের মানবাধিকার সংগঠনগুলিকে তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছেন পিইউসিএল নেতা ডঃ ভি সুরেশ।

শ্রীমতী সুচরিতা সেন প্রশ্ন করেছেন, যে দেশে কর্পোরেট সংস্থাগুলি নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন না দিলেও সরকার দৃকপাত করেনা, যে সরকার দেশে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নায়কের ভূমিকা নিয়েছে, সেই সরকার অন্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে ''কোন অধিকারে''?

অনেক দিকই অনালোচিত থেকে গেল। এছাড়া আছে নেপাল, দিল্লীতে 'আপ' উত্থান, নেলশন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা এবং আরও অনেক সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি। সহযোগিতার জন্য প্রেসের বন্ধুদের ধন্যবাদ।

কথা, শুধু কথা
সব্যসাচী দেব

আমরা যখন ভেবেছি রাত্রি পোহালে
টকটকে লাল হয়ে যাবে চারদিক
ভোর হবে বিপ্লবে বিপ্লবে
তক্ষক শুধু বলেছিল ঠিক ঠিক
আপ্তবাক্য পুঁথিতে বাণীতে উবাচ

আমরা নিজেরা চোখ বুজে থাকি বোবা
ভুলে গেছি পুঁথি তাক থেকে নিচে নামাতে
মন্ত্র ভুললে বলে উঠি তোবা তোবা

অক্ষর নিজে নীরব অর্থহীন
শিখিনি কি করে তাতে দিতে হয় প্রাণ
বিপ্লব যেন বাগানে বাহারি ফুল
জানলা খুললে ঘরে কুসুমিত ঘ্রাণ

আগাছার ভিড়ে চারপাশে জঞ্জাল
আমরা কেবল শৌখিন মজদুর
কথার ফানুসে বিপ্লব উড়ে যায়
মুক্তি হারায় দূর থেকে বহুদূর

রাজকাহিনী
বিশ্বনাথ গরাই

চাবুক এখন ভিন্ন রঙের, আবার হবো সোজা?

বাঁকা আঙুল তুলছো তুমি, যেমন তুলতো ওরা--
শুকনো ফুলের তোড়া
যেমন আছে তেমনই থাক, পাপড়িরা আধবোজা;

ঘুর্ণিপথে আবার হাঁটি, ধুলো কেবল ধুলো--
মাটির নীচে লুকিয়ে যদি শরীর করো খর্ব
আর এক খননপর্ব?

নতুন আঁচে, চাইছো জ্বলুক, আমারই চালচুলো!

কত দূরে যাবে?
বিশ্বজিৎ মিত্র

কতদূরে যাবে? গিয়েই দ্যাখোনা
ধুধু নীলাকাশ একই জলরেখা,
কত কাছে হায়! এসেই দ্যাখোনা
শুধু শ্বাসাঘাত পথ চলা একা।
ভিড়ে মিশে গিয়ে কলকোলাহলে
একরাশ ত্রুটি বুঝি ক্ষমণীয়,
স্বপ্নের ঘুড়ি চোখাচোখি হলে
গোলাপবালারা আমাকে বলিও

কতদূর যাবে? গিয়েই দ্যাখোনা
অচেনা মুখই কবেকার চেনা,
শুধু নীলাকাশ একই জলরেখা
কখনো দুচোখে কখনো বৃষ্টি—
একই প্রাণবায়ু আয়ুরও অচেনা
এমনই অমোঘ অপার সৃষ্টি।

শুধু মনে রেখো-- বিনম্রতার
বিনা প্রতিরোধে ফোটেনা কুসুম,
শীতের শুকনো পাতাতেই জ্বলে
লাল বসন্ত অশোক শিমুল।

বেলা বয়ে যায়, শীতের শুষ্ক
ধুলাবালি ওড়ে ডাইনে ও বামে--
কবে যে পাঠাবে ঠিকানাবিহীন
নির্জনপ্রেম বিকেলের খামে!
জানা নেই তাকে, চেনা নেই তার পূর্ণচ্ছেদ--
করপুটে শুধু রেখেছি নিজের
ভালবাসাটুকু চিরবিচ্ছেদ।

শুধু মনে রেখো, শুধু মনে রেখো--
যেখানেই যাও ধুধু নীলাকাশ
শুধু জলরেখা
চেনা জনপদ
প্রিয় জলবায়ু।

ছড়া
সৃজন সেন

শাসন, শাসন, শাসন, গণতান্ত্রিক শাসন
লাগে পুলিশ পার্মিশান আজ
করতে অন্নপ্রাশন!

দেবেন মেয়ের বিয়ে?
জলদি গিয়ে পার্মিশানটা
আনুন থানায় গিয়ে।
পাত্রটি কি বেলঘরিয়ার?
মাওবাদী নয়? করুন ক্রিয়ার,
নেবেই তুলে পাত্রটিকে
নইলে পুলিশ গিয়ে।

শোবেন বউয়ের পাশে?
আরে মশাই জানিয়েছেন
লোকাল থানার কাছে?
নইলে কিন্তু গভীর রাতে
পুলিশ দেবে হানা
বউটি উগ্রপন্থী কিনা
রাষ্ট্রের চাই জানা!

গণতান্ত্রিক দেশে কোনো
চলেনা বাড়াবাড়ি
গণতন্ত্রে তাই জরুরি
পুলিশি হানাদারি।

লিমেরিক
অশোক চট্টোপাধ্যায়

দিল্লিতে হেসেছে পদ্ম, হতাশায় নামো নতমুখ
বাঙলার ক্ষমতাময়ী ভীষণ উৎসুক
কী ঘটে কয়েকমাসে
ত্রাসে গ্রাসে সর্বনাশে
স্ফূটিত বসন্তের উপছে পড়া মুখ

কে যে কার হাত ধরে কে যে কার পা
কে কার আসনে বসে ডিমে দেয় তা
এসব অঙ্ক-ভাষে
কালো চুল সাদা হাসে
জুতো ফেলে দ্রুতবেগে ছোটে রণপায়

প্রধান দ্বন্দ্ব নিয়ে
মস্কো বেজিং গিয়ে
আজও যার হয়নিকো সঠিক সমাধা
তা নিয়ে আবার গোল
দেখে হাসে আমলাসোল
খচ্চোর কেমন করে হয়ে যায় গাধা

মোহন বাঁশির সুরে ময়ূর নাচেনা আর
পুঁজির কোমল প্রাণ করে শুধু ঘরবার
টাকার পাহাড়ে বসে
সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্ক কষে
উত্তর মেলাতে ব্যর্থ তিনি বারবার

রসাতলে ডোবে দেশ
দিবা হয়ে এলো শেষ
এখন শুধু বলো মন
জনগোন জনগোন
রয়েছে আমার সাথে, আমি আছি বেশ

নমো নমো নমো
সুন্দর মম
জননী ভারতভূমি
সা বলতে প্রাণ রে আনচান
গা মা পা ধা তুমি...

পাজি ছড়া
অচিন্ত্য সুরাল

১
কালিয়াপ্পন জয়রমন
বলতো ওজন তার ক'মণ
সেই ওজনের চাপে
গণতান্ত্রিক আমলাতন্ত্র
মন্ত্রী-সান্ত্রী কাঁপে

২
চুপ কর বোকা চুপ কর
চৌত্রিশ বছর এভাবে কাঁদতি
শুনছি আসছে মন্ত্রী-সান্ত্রী
কান্না এখন নিষেধ হয়েছে
কাঁদা সাজে শুধু মুর্খ'র

খিদে তো আসেই নিত্য নিত্য
মন্ত্রী কি আসে রোজ?
সহজ কথাটা বোঝ
পূর্ণ হবেই জীবনবৃত্ত
এইবেলা দলে ঢুকে তহবিল
পুরো তছরূপ কর

৩
আমায় অপদস্থ করা?
এসব চতুর তোমার ছক
কার্টুন বড় গোলমেলে হে
মাওবাদেরই সমার্থক

৪
চাল খেয়েছে মিড-ডে-মিলের
তাল করেছে তিল
মাল খেয়েছে বুদ্ধিজীবী
বিবেকের গোঁজামিল

৫
পালিতকেশ স্খলিতভাষা অকথা কুকথা বলিত
চুল্লুর ঝোঁকে সকাল সন্ধ্যে পথে বা বিপথে টলিত
প্রতিবাদ কেউ করেনি যদিও হাড় ও পিত্তি জ্বলিত
দল বদলিয়ে একদিন নেতা
হয়ে গেল ব্যাটা আইন প্রণেতা
এখন আমরা তাঁহারই ললিত ভাষণে মুগ্ধ মোহিত
মানুষের ডিমে ছাগলের ছানা না হলে দেশ কি চলিত!

৬
কৌন বনেগা ক্রোড়পতি
ক্যায়সে বনে বিপিএল
সব কুছ হ্যায় গুরুর কৃপা
বেওসায়ি আর নেতার খেল

৭
অক্ষরেতে চক্ষু রেখে মূর্খ এক নিরক্ষর
শিক্ষাখাতে দীক্ষা পেতে— বলল, লাগে তিন অক্ষর
শ্রদ্ধাস্পদ বোদ্ধা বিশাল অধ্যাপকে হাসে
গণ্য তো নয় জঘন্যটা— মান্যবরে কাশে
ব্যাখ্যা করে নিরক্ষরে, হাটে বিকায় শিক্ষা
ন গ দ তিন আখরের জোর থাকলেই হবে দীক্ষা

আদিবাসী
বিষাণ রুদ্র

দিনে তেলের মতন সারা গায়ে রোদ মেখে
রাতে জোছনা মেখে, না থাকলে
চিকচিকে আঁধার মেখে ওরা তোফা থাকে।

খেতে না পেলে
ক্ষুধাকেই ওরা চিবিয়ে চুষে,
চেটেপুটে খায়।

শিশিরের কোনো শব্দ নেই
শিশির ঝরে। লেগে থাকে গাছের পাতায়,
ঘাসের ডগায়, মানুষের গায়ে মাথায়।

শিশির-নিবিড়-নীরব
এই মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক।

পূর্ণিমা মধ্যরাত
বিষাণ রুদ্র

আদিবাসী মাদলের তালে
নাচন লাগে গাছে গাছে
বনের থেকে বেরিয়ে এসো বনময়ূরী যত
পেখম মেলে নাচে।

মধ্যরাতে পাখিরা সব জাগে
গলা মেলায় আদিবাসী যুবতীদের গানে।

বনভূমি মুখরিত আহা!
মানুষ ও প্রকৃতির ঐকতানে

কবিপরিচিতি

হিন্দী ভাষার যে কবিরা এমার্জেন্সি ও কংগ্রেসি অপশাসনের বিরোধিতা স্পষ্ট ভাষায় ও নির্ভীকভাবে করেছিলেন, রঘুবীর সহায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল সমাজবাদী আন্দোলনের প্রতি, কিন্তু তাও একেবারে নিঃশর্ত ছিল না। সংসদীয় রাজনীতির ক্রমিক অবমূল্যায়ন তাঁর কবিসত্তার গভীরে সঞ্চারিত করেছিল পবিত্র ক্রোধ, যা জন্ম দেয় এই পংক্তিগুলির—

> সেনাবাহিনীর নাম শুনলে/দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে/টেবিল বাজায় সভাসদ, ভদ্ ভদ্ ভদ্, কেউ হতে পারে না/রাষ্ট্রের--/সংসদ একটি মন্দির, এখানে কাউকে বলা যাবে না দ্রোহী/দুগ্ধপোষ্যরা মুখ মুছে এসে বসলেন, জীবনদায়ী গঁদ/-দাগি সদস্য ভুঁড়ি সম্মুখে রেখে/বললেন কবিতায় দেশপ্রেম হরিয়ানা প্রেম/আইসক্রিম প্রেম আনতে হবে/নিষ্পাপ মুখ বললো/আত্মা তার নকল চোয়াল যুক্ত মুখ খুললো। [ফিল্মকে বাদ চীখ (ফিল্মের পরের চিৎকার)]।

রঘুবীর সহায়ের জন্ম ১৯২৯ সনে, লখনউ-এ। ইংরাজি সাহিত্যে এমএ (১৯৫১) উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সাংবাদিকতায় নিবিষ্ট হয়ে পড়েন। আকাশবাণী, নব্‌ভারত টাইম্‌স্ ইত্যাদিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করে অবশেষে ''দিনমান'' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর নির্দেশনায় ''দিনমান'' হয়ে ওঠে হিন্দী বলয়ের প্রধানতম প্রতিবাদী মুখপত্র। আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রেও ''দিনমান''এর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। হিন্দী পত্রিকার পাঠককে বিশ্বসচেতন করে তুলতে এই পত্রিকাটির ভূমিকা বিস্মৃত হবার নয়।

সাতটি কবিতা সংগ্রহ, তিনটি গল্প সংগ্রহ ও ছয়টি প্রবন্ধ সংগ্রহের লেখক রঘুবীর সহায় ১৯৮২ সালে 'লোগ ভুল গয়ে হ্যাঁয়' কবিতাসংগ্রহের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। এ ছাড়াও অসংখ্য পাঠকের সম্মান পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। হিন্দী বলয়ের বা বিস্তারে বলতে গেলে গোটা ভারতের সাধারণ মানুষের হতদরিদ্র অবস্থা ছিল তাঁর প্রধান উদ্বেগের বিষয়। শাসকশ্রেণী দ্বারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিগুলির নির্লজ্জ লুণ্ঠন তাঁকে ক্রুদ্ধ করেছে, ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ করেছে। তাই ''পেলব'' কবিতা লেখায় কখনোই জুত করে উঠতে পারেননি তিনি। তাঁর কবিতা আক্রমণপ্রবণ। শাসকশ্রেণীর মুখোশ খুলে ফেলার অসামান্য দক্ষতা করায়ত্ত ছিল তাঁর।

'হাসো হাসো শিগগিরি হাসো' কবিতাটি তাঁর *হঁসো হঁসো জলদি হঁসো* সংগ্রহ থেকে নেওয়া। এই সংগ্রহের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত। এই পর্বেই সম্ভবত ''স্তাবকতা'' রাজনৈতিক কৃতিত্বরূপে পরিগণিত হতে থাকে। আজও এই পর্বটি অতিক্রম করা যায় নি।

১৯৯০ সালের ৩০ ডিসেম্বর রঘুবীর সহায়ের কর্মব্যস্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হাসো হাসো শিগগিরি হাসো

রঘুবীর সহায়

অনুবাদ: বিশ্বজিৎ সেন

হাসো, তোমাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে

হাসো কিন্তু নিজেকে নিয়ে নয় কারণ তার তিক্ততা তোমাকে
ধরিয়ে দেবে আর তুমি মারা পড়বে
হাসো এমনভাবে যেন মনে না হয় তুমি ডগোমগো
নইলে সন্দেহ হবে এ লোকটা আদৌ লজ্জিত নয়
আর তুমি মারা পড়বে

হাসতে হাসতে কাউকে জানতে দিও না যে হাসির লক্ষ্যস্থল কে
সবাই মেনে নিক যে তুমি আর সবার মতোই হেরে গিয়ে
আত্মীয়সুলভ হাসছো,
যেমন সবাই হাসে, কথা বলা এড়িয়ে যায়

যতক্ষণ উঁচু গোল গম্বুজে হাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, ততক্ষণ
নিজের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নাও
প্রতিধ্বনি থেমে যেতেই আবার হেসে ওঠো
কেন না তুমি চুপ করে থাকলে প্রতিবাদ করার দুর্নাম কুড়োবে
সব শেষে হেসে উঠলে সবার লক্ষ্যস্থল হবে আর বেঁচে যাবে

অবশ্যই হাসবে কিন্তু হাসির ছোট ছোট গল্পগুলোকে
এড়িয়ে গিয়ে

ওগুলোতে শব্দ আছে
অর্থও থাকতে পারে, যা একশ বছর আগে কেউ দিয়েছিল

যখন কোন কথা বলবে, তখন হাসাই বিধেয়
যাতে কথাগুলি কোন অর্থবহন না করে
হাসির ছুতোগুলো বাছাই করাও আবশ্যক
যখন তা অনিবার্য, তখনই হাসবে
যেমন গরিবকে বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রহার
যেখানে কারো কিছু করার নেই
সেই গরিবটি ছাড়া

আর সেও প্রায়শই হাসে--
হাসো হাসো শিগগিরি হাসো
তাঁরা চলে যাওয়ার আগেই হাসো
তাঁদের করমর্দন করতে করতে
চোখ নীচু করে
তাঁদের মনে করিয়ে দিতে দিতে হাসো,
যে তুমি গতকালও হেসেছিলে।

মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতা

আত্মস্থ প্রলয়ে

আলোকতরঙ্গ ছাড়া বস্তুপুঞ্জ অন্ধকার, অন্ধকার হ'লে
সমস্ত গাছের দেহ ঢাকা পড়ে রাত্রির বাকলে
ঢেকে যায় দিনরাত্রি— যেন দিবা-রাত্রি ভেদ নেই—
　　চতুর্দিকে স্বল্পবিত্ত অন্ধের সংসার,
ঢাকে না জ্বলন্ত সত্তা— সোনার চাবুকে জ্বলে তার
　　মধ্যরাত্রে নিজস্ব প্রহার।
দূরান্তরে বেজে ওঠে সমুদ্রগর্জনে সেই কালান্তর-বাঁশি—
অন্ধকারে জাগে গান, জেগে থাকে আত্মস্থ প্রলয়ে
শিল্পের সারাংশ নিয়ে শিল্পী ও সন্ন্যাসী।

এখানে সমুদ্র নেই, অন্ধত্ব সমুদ্র হয়ে আছে।
ভাঙাচোরা লোক ঘিরে ধুলো জমে চটকল-শহরে,
স্খলিত মানুষ, আর ধোঁয়া ধুলো,
　　খোলা-নর্মদার মতো জীবিকা-জীবন
একাকার হতে হতে গলিত চোখের নীচে জমা হয়,
　　প'চে ফুলে ওঠে—
পাটের আঁশের সঙ্গে উপস্বত্বভোগীদের
　　গড়ানো লালায় ভেজা এ শহর
মগজে পাচকতন্ত্রে বিনিময়বিষে আর চিন্তায় চর্চায়
বারুদের গন্ধমাখা রাত্রির ভিতরে ঢুকে পড়ে।
এখানে দুর্দান্ত কালো ঝাঁটা কিংবা ঝাড়ুদার নেই,
　　বেপরোয়া কব্জি কিংবা লেলিহান অট্টহাসি নেই।
মসৃণ ন্যাকামি-চাটা দালাল ফড়েরা আছে
চামচা আর চামচিকেরা আছে,
যক্ষ্মার জীবাণু-ভরা অগুণতি বস্তি আছে, আর
পাশাপাশি অন্ধকার পর্দা জুড়ে মস্কো-অলিম্পিক আছে—
পরমায়ু বাজি রেখে অন্ধরা খেলায় মাতে—
　　নিজের চামড়ায় তৈরী দু'রকম তাস—
সমস্ত শহর কালো, কালো দিন, কালো রাত্রি,
　　আলকাতরা আকাশ।

এই অন্ধ রাত্রি জুড়ে অন্ধরা ইস্কুল খোলে,
　　অন্ধ ছাত্র অন্ধরা শিক্ষক,
কেবল বিদেশ থেকে দুরকম লাঠি আসে সাহায্য হিসেবে
　　আজীবন ভর দিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাও,
ভিখিরি সমাজে কোনো নেতা নেই, প্রণেতাও নেই—
দুই প্রভু দুই দিকে, হে ভারত ভুলিও না, মাঝখানে তুমি ক্রীতদাস,
তোমার পায়ের নীচে মাটি নেই,
　　মাথার উপরে নেই স্বাধীন আকাশ।

অন্ধের সংসারে সেই কষ্ট পায়, যার চোখ আছে।
পাথরের দেশে সে-ই কষ্ট পায়— যার বুকে সৃষ্টির অঙ্কুর।
নোটের বাণ্ডিল-ওড়া এ শহরে স্নান নেই, গান নেই—
　　হৃদপিণ্ড পচেছে বহুদূর—
তবু কেউ কেউ জাগে, জেগে থাকে, হাতে তার হাতুড়ি-শাবল,
তাকে ঘিরে শহরের পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়, সে-ই আনে
　　দক্ষিণ সমুদ্র থেকে জোয়ারের জল।
প্রচণ্ড ঘর্ষণে কিংবা বিস্ফোরক আয়োজনে কিছু আলো
　　এবং আগুন পেতে পারি,
　　পেতে পারি মানুষের ঘ্রাণ—
রাত্রির দিগন্ত জুড়ে গেয়ে যাবো বিদ্রোহের গান,
পাথর ফাটিয়ে আনবো সশস্ত্র তৃষ্ণার জল
　　পাথরে জাগাবো মহাপ্রাণ।

অনীক, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৯৮০

গান্ধীনগরে এক রাত্রি

গোকুলকে সবাই জানে,
চিনে রাখলো ডিআইবি-র লোক
স্টেটসম্যান পড়ার ফাঁকে আড়চোখে,
গোকুলের মা
অন্ধকার হলে বলেছিল,
''আর নয়, এবার ফিরে যা''—
ফেরার আগেই খাকি রঙের বিদ্যুৎ দরজায়,
রিভলবার গর্জে ওঠে, গর্জায় গোকুল,
রাষ্ট্রীয় ডালকুত্তা ঝুঁকে ছিঁড়ে নিল এক খাবলা চুল
রাতকানা মায়ের চোখে কুরুক্ষেত্রে বেল্টের পিতল, বুট,
জলস্রোতে নামে অন্ধকার,
শবচক্র মহাবেলা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ,
পাথরে পাথরে গর্জে কলোনির সুভদ্রার শোক।
অধ্যাপক বলেছিল, ''দ্যাট্ স রঙ, আইন কেন তুলে নেবে হাতে?''
মাস্টারের কাশি ওঠে, ''কোথায় বিপ্লব,
　　　　　　শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!''
উকিল সতর্ক হয়, ''বিস্কুট নিইনি, শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে।''
চটকলের ছকু মিঞা, ''এবার প্যাঁদাবো শালা হারামি ওসি-কে।''
উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটে তেজী রক্তধারা
গোধূলী গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।

গান্ধীনগরে রাত্রি, ১৯৭৪

অধ্যয়ন

রক্তাক্ত সন্ধ্যার দিকে বেঁকে যায়
মেঘের নিজস্ব কেরামতি,
নিচু হাওয়া শিশির কুড়িয়ে নিয়ে
ধুলোবালি খায়,
দু'মানুষ সমান উঁচুতে বাবু জ্যোৎস্না
কাঁঠাল পাতার বিছানায়
পাশ ফিরে শোয়।

ক্রমশ কথনপটু চেলাদের
হাতসাফাই মোটামুটি রপ্ত হলে
দল বেঁধে কাজে নেমে পড়ে,
গতরে চেকনাই আসে—
জানেনা কোন্ দিক থেকে উঠে আসবে
তরঙ্গের তিরস্কার, জানেই না
বসতির আড়ালে আড়ালে বেড়ে উঠছে
নালি ঘায়ে রাত্রিভরা নুন।

কাটা বুড়ো আঙুলের টিপছাপ দিয়ে
হিরণ্যধনুর পুত্র
লেপে দিলো আকাশের শেষ,
এবং বিরুদ্ধ চরাচরে
খোলা মহাগ্রন্থে ঝুঁকে পড়ে
প্রতিটি নিজস্ব অভিপ্রায়, উঠে আসে
প্রতিটি নিজস্ব অবরোধ।

অনীক, মার্চ-এপ্রিল ২০০৪

মণিপুর : ২০০৪

পাথর ফেটে গিয়ে তরল আগুনের ফোয়ারা উঠে যায় শূন্যে
বুটের তলা থেকে শিশুরা শ্বাস নেয়
পেরেকে গেঁথে আছে তাদের জিভ,
বুলেট স্তনমূলে ছিদ্র করে দিয়ে বেরিয়ে চলে যায় পিঠ থেকে
ভাড়াটে নেকড়েরা মাংস খুলে নিয়ে চর্বি উগরে দেয় অন্ধকারে,
অন্ধ প্রেতযোনি রাতকে পিষে নেয় রাতের ভিতরে রক্তরাত,
বনের পশুপাখি এনেছে বধিরতা ভাঙা আতঙ্কে কাঁপছে ঘাস,
মাংসপিণ্ডতে সাজিয়ে মোমবাতি জ্বালায় শহরের প্রান্ত ভাগে
যারাই জেগে থাকে তাদের নাভিদেশে রাষ্ট্র পুঁতে দেয় বেয়নেট,
একটি মনোরমা হাজার মনোরমা তুমুল ব্যারিকেড রাত্রিদিন
হাজার মনোরমা অযুত মনোরমা পাহাড় ফেটে যায় রাত্রিদিন...

অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৪

নির্বাচনের পরে

সুটকেস হাতে নিয়ে স্কন্ধকাটা পুরুষেরা লোমে ঢাকা সুঠাম শরীর
সংরক্ষিত ভোজে এলো, তৈলসিক্ত নারীদলও এলো
কেউ এলোকেশী নয় কারণ তাহারা মুন্ডহীন,
কারও গায়ে বস্ত্র নেই, প্রসাধন থলি হাতে আছে,
সুশীতল পান্থশালা— সব কক্ষ ভিতরের দরজা দিয়ে
যুক্ত করা আছে,
গলন্ত চর্বির ভাঁজে সাপের মিথুনক্রিয়া, চোখ বন্ধ করো,
এই অগ্রদানী ভোজে অন্নপিন্ড নেই ধোয়া তুলসী পাতা আছে,
'একাংশ' বা 'অধিকাংশ' নিজের সুবিধামতো বসাবে পাঠক,
পাঠক ও ফক্কড়, ভোজে এক ফাঁকে সাট করে ঢুকে যেতে পারে,
কাছের পাহাড় থেকে মাতৃস্তন্যহীন চন্দ্র দেখে নেয় সব,
সৌর বিপণন কেন্দ্রে ইচ্ছেমতো উল্কা বিক্রি হয়,
মলমল রাত্রির পেটে নিঝুম গাড়ির সারি—
ভিতরে ঘুমন্ত ড্রাইভার,
পাহারে মন্দির আছে, খড়্গ হাতে দেবী আছে,
অবশ্য নেহাতই পাথরের...

অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫

ক্রয়ক্ষমতা

ছিলো রাত্রি সম্মেলনে পচামাংস রন্ধন-ভাষণে,
ঘন পোষকতা পেয়ে ভাগফল ছিলো পদ্মাসনে,
ভাষা ছিলো মালপোয়া হাতে স্টিক কামার্ত ম্যাজিক
উরুর লাবণ্য ঢেলে প্রথমেই ভেঙে দিলো দিক,
সেই দিকছিদ্র দিয়ে এঁটোকাঁটা নীচে হলো জমা,
সমস্ত আঙুল কেটে রেখে দিলো মূর্ছিত মধ্যমা—
যাতে শুধু শৌচকর্ম চলে কোনোমতে,
গ্রীষ্মের পেট্রল থেকে এক গ্লাস তুলে নিয়ে
ঢেলেছিল সদ্যোজাত ক্ষতে,
এসব পাবে না কোনো ধর্মগ্রন্থে যেমন গীতায়,
ছিলো রাত্রি সম্মেলন আমদানি-বহুল চিতায়...

অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫

কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্যের প্রয়াণে অনীক তাঁর
স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে

কথা : কমলেশ পাল, সুর ও স্বরলিপি : ভাস্বতী ঘোষ

পায়ের কাছের এই পরাজয় উঠে দাঁড়াও
ভিতরে যে মলিন খাপে মুখ লুকানো শঙ্কা কাঁপে
সেই ভিতুটার ঝুঁটি ধরে বাইরে তাড়াও
শরীরে যে লাগলো ধুলো ও কিছু নয়
আঘাত মারের চিহ্নগুলো ও কিছু নয়
দুঃখ হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে কদম বাড়াও

সামনে চাবুক চোখ রাঙানি ও কিছু নয়
আমার থালা কান ভাঙানি ও কিছু নয়
শিকল তোলা দরজাখানা ধরে নাড়াও
চলতে চলতে সবার সঙ্গে কাঁটা মাড়াও
ভাবছো পথে বিঘ্ন পাবে ভাবছো কিছু রক্ত যাবে
চলতে পায়ের বাঁধন ছাড়া আর কি হারাও?

পা	পা	পা	পা	পা	-া	মা	মা	পা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা
পা	য়ে	র	কা	ছে	র	এ	ই	প	রা	জ	য়
সা	জ্ঞা	-া	মা	পা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	পা
উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	০	০	০	০	০	০	ও
মা	মা	-া	মা	মা	-া	মা	মা	মা	মা	মা	-া
ভি	ত	০	রে	যে	০	ম	লি	ন	খা	পে	০
সা	সা	জ্ঞা	সা	জ্ঞা	-া	সা	মা	জ্ঞা	সা	সা	-া
মু	খ	লু	কা	নো	০	শা	ং	কা	কাঁ	পে	০
-া	-া	-া	-া	-া	-া	মা	মা	মা	মা	মা	মা
০	০	০	০	০	০	সে	ই	ভি	তু	টা	র
মা	মা	-া	পা	মা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	পা	না	-া
ঝুঁ	টি	০	ধ	রে	০	বা	ই	রে	তা	ড়া	ও
মা	মা	পা	না	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	র্সা
বা	ই	রে	তা	ড়া		০	০	০	০	০	ও
র্সা	র্সা	-া	ণা	ণা	ণা	পা	পা	-া	মা	মা	মা
উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	ও	উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	ও
জ্ঞা	মা	জ্ঞা	সা	সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	সা
উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	০	০	০	০	০	০	ও
মা	মা	-া	মা	মা	-া	জ্ঞা	মা	-া	জ্ঞা	মা	-া
শ	রী	০	রে	যে	০	লাগ্	লো	০	ধু	লো	০
মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	সা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	-া
ও	০	কি	ছু	ন	য়	ও	০	কি	ছু	ন	০
-া	-া	-া	-া	-া	সা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
০	০	০	০	০	য়	আ	ঘা	ত	মা	রে	র
মা	-া	পা	মা	পা	-া	সা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	-া
চি	ন্	হ	গু	লো	০	ও	০	কি	ছু	ন	য়
সা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	-া	-া	-া	-া	-া	সা
ও	০	কি	ছু	ন	০	০	০	০	০	০	য়
মা	মা	মা	পা	মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	পা	ণা	-া
দু	ঃ	খ	হাও	য়া	য়	উ	ড়ি	য়ে	দি	য়ে	০
মা	পা	পা	ণা	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	র্সা
ক	দ	ম	বা	ড়া	০	০	০	০	০	০	ও

ণা	র্সা	ণা	পা	পা	পা	মা	পা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা
উ	টে	০	দাঁ	ড়া	ও	ও	ঠে	০	দাঁ	ড়া	ও
সা	জ্ঞা	-া	মা	পা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	পা
উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	০	০	০	০	০	০	ও
পা	পা	পা	মা	পা	পা	মা	মা	পা	মা	পা	পা
সা	ম	নে	চা	বু	ক্	চো	খ্	রা	ঙা	নি	০
সা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	মা	জ্ঞা	সা	সা	-া
ও	০	কি	ছু	ন	য়	ও	০	কি	ছু	ন	০
-া	-া	-া	-া	-া	সা	না	না	না	না	নপা	-া
০	০	০	০	০	য়	আ	মা	র	থা	লা	০
র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	ণা	ণা	পা	মা	মা	মা
কা	ন্	ভা	ঙা	নি	০	ও	০	কি	ছু	ন	য়
পা	মা	জ্ঞা	সা	সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	সা
ও	০	কি	ছু	না	০	০	০	০	০	০	য়
মা	মা	মা	পা	মা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	পা	ণা	-া
শি	ক	ল্	তো	লা	০	দ	র	জা	খা	না	০
মা	পা	-া	ণা	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	র্সা
ধ	রে	০	না	ড়া	০	০	০	০	০	০	ও
ণা	র্সা	ণা	পা	পা	পা	মা	পা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা
ও	ঠে	০	দাঁ	ড়া	০	উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	ও
সা	জ্ঞা	০	মা	পা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	পা
উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	০	০	০	০	০	০	ও
প্া	প্া	-সা	প্া	প্া	সা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	সা	সা	মা
চ	ল্	তে	চ	ল্	তে	স	বা	র	স	ং	গে
জ্ঞা	জ্ঞা	-া	সা	সা	সা	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	সা	সা	সা
কাঁ	টা	০	মা	ড়া	ও	ঝাঁ	টা	০	মা	ড়া	ও
{ মা	মা	মা	জ্ঞা	মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	জ্ঞা	মা	-া
{ ভা	ব্	ছো	প	থে	০	বি	ঘ্	ন	পা	বে	০
পা	পা	পা	মা	পা	-া	মা	মা	পা	মা	পা	-া }
ভা	ব্	ছো	কি	ছু	০	র	ক্	ত	যা	বে	০ }
পা	পা	পা	ণা	পা	পা	মা	পা	পা	না	র্সা	-া
চ	ল্	তে	পা	য়ে	র	বাঁ	ধ	ন্	ছা	ড়া	০
পা	পা	ণা	র্সা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	-া	র্জ্ঞা
আ	র	কি	হা	রা	০	০	০	০	০	০	ও
র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	-া	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা
উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	ও	উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	ও
ণা	র্সা	ণা	পা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	পা
উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	০	০	০	০	০	০	ও
র্সা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	র্সা
উ	ঠে	০	দাঁ	ড়া	০	০	০	০	০	০	ও

নেপালে বামপন্থা ও গণতন্ত্র

এক দশকব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ, বিশাল ঘাঁটি এলাকা গঠন, নেপালের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে মাওবাদীদের প্রভাব বিস্তার, ও তার পর গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ২০০৬ সালে শক্তি সঞ্চয় করার পর মাওবাদীরা অন্যান্য সংসদীয় দলের সঙ্গে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। তারপর নেপালের সংবিধান সভা নির্বাচন, তাতে মাওবাদীদের সাফল্য, প্রবল উৎসাহের সঙ্গে রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে নেপালকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, হিন্দু রাষ্ট্রের বদলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা— এগুলো প্রমাণ করেছিল যে দক্ষিণ এশিয়া নেপালেই বামপন্থীদের, বিশেষ করে বিপ্লবী বামপন্থীদের শক্তি সবচেয়ে বেশি। কিন্তু মাওবাদী নেতা প্রচণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই নানা প্রশ্ন উঠতে থাকে— নেপালের মাওবাদীরা কি তাদের রাজনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। নতুন করে ভূমিসংস্কার হলো না, যদিও শান্তিচুক্তিতে ভূমিসংস্কারের কথা বলা হয়েছিল। পুরনো মাওবাদী ঘাঁটি এলাকায় যে ভূমি সংস্কার হয়েছিল, সেই জমি জমিদারদের ফিরিয়ে দেওয়া হলো। সরকারের অন্য কার্যকলাপেও বিপ্লবী দিশা তেমন কিছু দেখা গেল না, অন্যদিকে নানা পার্টির মধ্যে লড়াইয়ে সংবিধান সভার কার্যকলাপ বারবার ব্যাহত হতে থাকল। নেপাল আর আমাদের উদ্বুদ্ধ করে না।

এর মধ্যে মাওবাদীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নানা বিতর্ক দানা বাঁধে, যা জন্ম দেয় ভাঙনের। মোহন বৈদ্যের নেতৃত্বে নতুন পার্টি তৈরি হয়— সিপিএন(এম)। এদিকে এগিয়ে আসে নির্বাচন। সিপিএন(এম) সেই নির্বাচন বয়কট করে। নভেম্বর মাসে নির্বাচন হয়। এবং তার ফল হয় অত্যন্ত হতাশাজনক। গতবারের বিজয়ী মাওবাদীরা এবার তৃতীয় অবস্থানে।

কী ঘটলো? ২০০৬ সাল থেকে মাওবাদীরা কী কী করলেন আর কী কী করলেন না? কোথায় কোথায় তারা সফল আর কোথায় ব্যর্থ? ব্যর্থতার কারণ কী? এরকম নানা প্রশ্ন আমাদের মনে। এ নিয়ে সন্দেহ নেই যে সরকারে আসার পর মাওবাদীরা ভূমি সংস্কারের মতো জরুরি ব্যাপারগুলো বেশি গুরুত্ব না দিয়ে নানা গোষ্ঠীর সাথে, বিশেষত মদেসি দলগুলির সাথে সমঝোতা করে সংসদীয় শক্তি বাড়ানোয় গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। এসবের ফলেই ঘটেছে ভাঙন, তার ফলে আরও শক্তি হ্রাস। এই সব বিষয় নিয়ে দুটি লেখা আমরা প্রকাশ করছি। একটি লেখা নেপালের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম শ্যাম শ্রেষ্ঠা-র। নেপালের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ও ব্যর্থতা— দুদিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন তিনি। প্রবন্ধটির প্রথমাংশ *আইডিএসকে*-র একটি সেমিনারে পাঠ করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি *অ্যানালিটিক মান্থলি রিভিউ* থেকে নেওয়া। নেপালে স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মরত জোহান পিটার অ্যান্ডারসন নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, মাওবাদী পার্টিতে ভাঙন এই খারাপ ফলের অন্যতম কারণ। —সম্পাদকমণ্ডলী

গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও নেপালের বামপন্থীরা

শ্যাম শ্রেষ্ঠা

নেপালে কমিউনিস্টদের বলা হয় বামপন্থী। কিন্তু শুধু কমিউনিস্টরাই বামপন্থী এরকমটা ভাবলে ভুল হবে। নেপালের সবগুলি কমিউনিস্ট পার্টিকেই সাধারণভাবে বামপন্থী আখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু র‍্যাডিক্যাল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়ায় এমন প্রতিটি রাজনৈতিক শক্তিকেই বামপন্থী বলা যায়। সেদিক থেকে দেখলে নেপালে বামপন্থীদের তিনটি প্রধান ধারা: কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার নেতা ও কর্মীরা, এবং র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীরা।

বর্তমান পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও কমিউনিজমকে মনে করা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর জিনিস। কিন্তু নেপালে তার ঠিক বিপরীত। গত পঞ্চাশ বছর ধরে নেপালের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেপালি কমিউনিস্টরা সর্বদাই সামনের সারিতে। জনগণের যে দুটি ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন নেপালের রাজনৈতিক মানচিত্রে বিশাল বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে সে দুটি নেপালের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব ছাড়া কখনোই সফল হতে পারত না। ১৯৮৯ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সেটির নেতৃত্বে ছিল নেপালি কংগ্রেস দল ও সাতটি কমিউনিস্ট দলের জোট ইউনাইটেড লেফ্‌ট ফ্রন্ট[১]। ২০০৬ সালের এপ্রিল বিপ্লব নেপালে প্রথম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল, আর তা ঘটল সাতটি সংসদীয় রাজনৈতিক দলের মোর্চা (সিএসপিপিপি[২]) ও তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) বা সিপিএনএম-এর নেতৃত্বে।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় নেপালে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বেশি শক্তিশালী, বেশি প্রভাবশালী ও জনপ্রিয়। প্রথম গণপরিষদে (কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) এদের সংখ্যা ছিল ৬২ শতাংশ, যদিও নির্বাচনের আগে তাদের কোনো নির্বাচনী জোট হয়নি, নির্বাচনে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ভয়ানকভাবে লড়েছে। ১৯৯০-এর দশকে নেপালের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে মধ্য-দক্ষিণপন্থী নেপালি কংগ্রেসকে ঘিরে। কিন্তু বর্তমানে নেপালের রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে নেপালের বামপন্থীদের ঠিক করা বিষয়সূচি ঘিরে।

নেপালে বামপন্থীদের সাফল্য

২০০৬ সালের এপ্রিল থেকে নেপালে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছে। এই সব পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে কারণ নেপালে লিবারেল বুর্জোয়াদের সাথে যুক্তভাবে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে তার কেন্দ্রে আছে বিপ্লবী বামপন্থী নেতৃত্ব। দু হাজার বছরের

পুরনো সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো হয়েছে। কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি-র প্রথম সভার সিদ্ধান্তে নেপাল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হয়েছে। ২০০৬ সালের কমপ্রিহেনসিভ শান্তি চুক্তি সই হওয়ার পর এক দশকব্যাপী গৃহযুদ্ধের বলা যায় সমাপ্তিই ঘটেছিল, আর ২০১২ সালের মার্চে নেপালের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদী সেনাবাহিনীর সংযুক্তিকরণের ফলে সেই সমাপ্তি সম্পূর্ণতা পেল। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট নেপাল রূপান্তরিত হয়েছে ফেডারেল রাষ্ট্রে। বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র এখন এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিবর্তিত। এগুলি আধুনিক নেপালের ইতিহাসে যুগান্তকারী বৈপ্লবিক সব ঘটনা।

সামাজিক ন্যায়বিচারের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার অধিকারের মধ্য দিয়ে এই প্রথম নেপালে কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক নতুন ধরনের অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের অনুশীলন শুরু হয়েছে।

২০০৬ সালের নভেম্বরে প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানে[৩] সমানুপাতিক অংশগ্রহণের নীতির ভিত্তিতে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নারী, দলিত, জনজাতিগুলি, মদেসি, নিপীড়িত গোষ্ঠীগুলি, শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের সমানুপাতিক অংশগ্রহণ সামাজিক ন্যায়বিচারের মৌলিক অধিকার হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। নতুন খসড়া সংবিধানেও এই বিশেষ অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।[৪] দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোনো দেশে সমানুপাতিক অংশগ্রহণের এরকম এক প্রগতিশীল ব্যবস্থা নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পায় নি।

অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান ও খসড়া সংবিধানেও নিম্নলিখিত সামাজিক সুরক্ষার অধিকারগুলি প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হওয়ার ফলে নেপাল একটি কল্যাণকারী সমাজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে:

- কর্মসংস্থানের অধিকার
- বিনাখরচায় মাধ্যমিক স্কুলশিক্ষার অধিকার
- বিনাখরচায় মৌলিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকার
- খাদ্যের অধিকার
- শিশু, বয়স্ক, বিধবা ও অনাথদের সামাজিক সুরক্ষার অধিকার

এইসব অধিকার ছাড়াও, নতুন খসড়া সংবিধানে দলিত ও দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারীদের জন্য ঠিকঠাক বাসস্থানের অধিকার ও নিখরচায় উচ্চশিক্ষার অধিকার যোগ করা হয়েছে।[৫]

নারীদের অধিকার ও রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে।

২০০৬ সালে নতুন করে বসার পর নেপালের সংসদ কর্তৃক সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে নারীদের ৩৩ শতাংশ কোটা ঘোষণা ছিল নেপালের ইতিহাসে নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণের এক বিশেষ সংকেতবাহী ঘটনা। এর আগে নেপালের নারীরা কখনো সরকারি কাজে বা দেশের সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থায় এতখানি অংশ নেওয়ার সুযোগ পায় নি।

তখন থেকে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে সামাজিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে।

২০০৬-র আগে অবধি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে (রাষ্ট্রের সচিব স্তর) কোনো নারী ছিলেন না। ২০১০ সালে ছিলেন ২ জন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তখন নারীদের সংখ্যা ৮ শতাংশ। ২০১০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৩ শতাংশ— ৫ বছরে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি। ২০০৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের মধ্যে কোনো নারী ছিলেন না। এখন একজন আছেন।[৬] প্রথম সংবিধান-সভার ভাইস-চেয়ারপার্সনও ছিলেন এক নারী। ২০০৬ সালের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানে নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক কোটা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে প্রথম সংবিধান-সভায় নারীদের সংখ্যা ছিল ৩২.৮ শতাংশ (৬০১ জনের মধ্যে ১৯৭ জন)। এটি ভারতীয় সংসদে নারীদের অনুপাতের তিনগুণ, আর মার্কিন কংগ্রেসে নারীদের অনুপাতের দ্বিগুণের বেশি।[৭] এটা একটা গর্বের ব্যাপার যে নতুন উদীয়মান গণতন্ত্রের দেশ নেপাল সংসদে নারীদের অনুপাতের নিরিখে বিশ্বে ২৫তম, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ৮১তম, আর ভারত ১১০তম স্থানে।

২০০৬ সালের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানে নেপালি নারীদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা হয়: প্রথমত, পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে মেয়ে ও ছেলের সমান অধিকার; দ্বিতীয়ত, প্রতিটি শিশু মায়ের নামেও নাগরিকত্ব পেতে পারবে; এবং তৃতীয়ত, প্রজননের অধিকার ও জনন-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যের অধিকার।[৮]

সংবিধানের নতুন খসড়ায় নারীদের জন্য আরও প্রগতিশীল অধিকার প্রস্তাবিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি এলাকায় সংখ্যানুপাতিক অংশগ্রহণের অধিকার (৩৩ শতাংশ থেকে বেড়ে এবার ৫০-৫০)। খসড়া সংবিধানে এটাও নিশ্চিত করা হয়েছে যাতে এখন থেকে কোনো ধরনের কোনো লিঙ্গগত বৈষম্য না থাকে। নারীদের বিশেষ সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। শিক্ষায় অধিকার, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা বা সদর্থক বৈষম্য। পরিবারের সম্পত্তি ও পারিবারিক বিষয়ে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার হবে সমান, তাদের বক্তব্য সমান গুরুত্ব পাবে। প্রজনন ও উত্তরাধিকারের ব্যাপারে প্রতিটি নারীর অধিকার থাকবে। তাছাড়া, স্থির করা হয়েছে যে আইনসভার কোনো একটি পদ যদি একটি লিঙ্গের মানুষ পান, দ্বিতীয় পদটি পাবেন বিপরীত লিঙ্গের মানুষ।[৯] সময়ের সাথে সাথে এইসব অগ্রগতি নেপালি নারীকে আরো সম্পূর্ণভাবে পুরুষের সমকক্ষ করে তুলবে। নেপালি সমাজে নারীর অবস্থানের বিরাট পরিবর্তন আসবে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে সংবিধানের এই নতুন খসড়ায় প্রতিটি নেপালি শ্রমিককে ধর্মঘটের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যৌথ দরকষাকষির অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষার অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে।[১০] শ্রমিক ও কৃষকদেরও তাদের সংখ্যার অনুপাতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। নতুন খসড়া সংবিধান অনুসারে এগুলো শ্রমিকের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই সব অধিকারগুলি নেপালের শ্রমিকদের সরকারে ও আইনসভায় অংশগ্রহণের জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

নেপালি দলিতদেরও এই প্রথম প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে, তাদের সংখ্যার অনুপাতে, এবং সবাইকে নিয়ে (ইনক্লুসিভ)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের ওপর যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তারা বাড়তি আসন পাবে— ফেডারেল স্তরে ৩ শতাংশ ও প্রদেশ স্তরে ৫ শতাংশ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে দলিতদের বিশেষ সুবিধার অধিকার থাকবে, এবং তাদের প্রথাগত পেশা, জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তির ব্যবহার, সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য বিশেষ সুবিধা পাবে, সদর্থক বৈষম্যের ভিত্তিতে। নেপালে দলিতদের অধিকারের তালিকাটি যদি কাজে পরিণত করা হয় তাহলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে যেখানে দলিতরা আর দলিত থাকবে না।[১১]

স্টেট রিস্ট্রাকচারিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ স্টেট পাওয়ার কমিটি মদেসি, জনজাতি ও মুসলিমদেরও সব স্তরের রাষ্ট্রীয় সংস্থায় ও তার নেতৃত্বে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিয়েছে।

নিঃস্ব, প্রতিবন্ধী ও অত্যন্ত প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, খাদ্য ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত প্রান্তিক ও যাদের অস্তিত্বই বিপন্ন সেরকম গোষ্ঠীগুলি বিশেষ সুরক্ষার অধিকার ও ফেডারেল ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

একেবারে নতুন সংবিধান লেখার জন্য গঠিত অত্যন্ত ইনক্লুসিভ প্রথম সংবিধান সভা (৩৩ শতাংশ নারী, ৮ শতাংশ দলিত, ৩৪ শতাংশ মধেসি, ৩৫ শতাংশ জনজাতি ও ৩ শতাংশ মুসলিম) নির্বাচনটিই ছিল এক বিরাট সাফল্য অর্জন। ১৯৪৯ সালে নেপালি কংগ্রেস প্রথম সংবিধান সভার দাবি তোলে, কিন্তু সেই দাবি অর্জিত হয় প্রাথমিকভাবে নেপালি বামপন্থীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে এবং তেরো হাজারের বেশি প্রাণের মূল্যে।

এইসব অগ্রগতি ছাড়াও, সংবিধানের নতুন খসড়ায় আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে, যেমন—

- প্রদেশ স্তরে ও স্থানীয় স্তরে অধিকতর স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও ভাগাভাগি করে শাসন
- যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর তিনটি স্তর— ফেডারেল, প্রাদেশিক ও স্থানীয়
- নির্বাচিত সরকার, সংসদ ও ইতিহাসে প্রথম স্থানীয় স্তর পর্যন্ত নির্বাচিত আদালত
- সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত ও সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন— এই দুইয়ের সংমিশ্রণে মিশ্র নির্বাচন ব্যবস্থা

প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছেন যে নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এইসব প্রাথমিক খসড়াগুলিতে যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেগুলি যদি নতুন সংবিধানে রেখে দেওয়া হয় তবে নেপালের সংবিধান হবে এশিয়ার অন্য সব দেশের সংবিধানের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিশীল। শুধু বামপন্থীরাই যে এইসব পরিবর্তন এনেছে সেটা বলা ঠিক হবে না। উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট বেঁধে বামপন্থীরা এইসব রাজনৈতিক রূপান্তরকে সম্ভবপর করে তুলেছে। অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে নেপালকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করা সহ বিরাট বিরাট বৈপ্লবিক রূপান্তরের এজেন্ডাগুলি নেপালের বামপন্থীদের, বিশেষ করে নেপালি মাওবাদীদের স্থির করা।

ব্যর্থতা ও অপারগতা

নেপালি বামপন্থীদের রাজনৈতিক সাফল্য যেমন বেশি, তাদের ব্যর্থতা ও অপারগতাও কম নয়।

রাজনৈতিক রূপান্তরের পাশাপাশি যদি যথেষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর না ঘটে তবে কোনো গণতান্ত্রিক বিপ্লবই সাফল্যলাভ করবে না। রাজনৈতিক পরিবর্তন শুধু রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোকে পরিবর্তিত করে। সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটা তো কাজের মাধ্যম মাত্র। নিপীড়িত জনতা ও শ্রমিক শ্রেণীর জীবন পাল্টে দেওয়ার জন্য ঠিক কী দেওয়া হবে, তা এই উপরিকাঠামো নির্ধারণ করে না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া রাজনৈতিক বিপ্লব যেন জল আসার ব্যবস্থা ছাড়াই এক সোনার জলের কল। বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলি যা পাবে তা নির্ধারিত হবে সুষম, ইনক্লুসিভ, বৈপ্লবিক বিকাশ দিয়ে, প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার ও শিল্পবিকাশ দিয়ে, সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো দিয়ে, মূলত সমাজের শ্রেণী কাঠামো ও শ্রেণী সম্পর্ক দিয়ে। কিন্তু নেপালি বামপন্থীরা নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হলেও নেপালকে অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিকশিত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে রাষ্ট্র ও সমাজের শ্রেণী কাঠামো ২০০৬ সালের এপ্রিল বিপ্লবের পরও মূলত একই থেকে গেছে। এটা নেপালি বামপন্থীদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার একটি।

ভূমি সংস্কার ও সব রকমের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের অবসানের এজেন্ডাটি সর্বাঙ্গীণ শান্তি চুক্তির সময়েই ছিল। মাওবাদী ও সিপিএন-ইউএমএল নেতৃত্বাধীন সরকার

থাকার সময়ও সেটি একেবারেই কাজে রূপান্তরিত করা হলো না। ভূমি সংস্কারের এজেন্ডাটি একেবারে নির্বাচনী প্রচারে পর্যবসিত হলো। রাস্তায় শ্লোগান দেওয়ার সময় বলা হয়, কিন্তু ক্ষমতায় থাকার সময় কাজে করা হয় না। এটা লক্ষণীয় যে সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় অনুপস্থিত জমিদারদের যে সব জমি ও সম্পত্তি দখল করে ভূমিহীন কৃষক ও বর্গা-চাষ করা কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল সেগুলি ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়েছিল ইউসিপিএন-এম। নেপালে বামপন্থীদের করা সবচেয়ে বড় ভুলগুলির মধ্যে এটি একটি।

নেপালে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো-র ২০১০-১১ সালের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে নেপাল এখনো একেবারে কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের ৭৬ শতাংশ পরিবার (হাউসহোল্ড) কৃষিকাজ করেন। কিন্তু কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলির ৫৩ শতাংশই গরিব ও ক্ষুদ্র চাষি, তাদের নিজস্ব জমির পরিমাণ মাত্র ০.৫ হেক্টর; মোট কৃষিজমির মাত্র ১৮ শতাংশ জমি চষেন তারা। বড় চাষি, যাদের চষা জমির পরিমাণ ২ হেক্টরের বেশি, তাদের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ, কিন্তু তারা দেশের মোট কৃষিজমির ২২ শতাংশ দখল করে আছে। এটা নেপালের ভূমি-মালিকানার ক্ষেত্রে একটা বড় দ্বন্দ্ব ও সমস্যা। তার ওপর, কৃষক পরিবারগুলির ২ শতাংশ একেবারেই ভূমিহীন, এক-তৃতীয়াংশ পরিবার (৩২ শতাংশ) এখনো বর্গাচাষি— জীবনধারণের জন্য এরা অন্যদের বড় বা ছোট জমি নিয়ে বর্গায় চাষ করে।[১২] অনুপস্থিত জমিদাররা এখনো নেপালে ভালোমতোই আছেন। ভূমি সংস্কার ও কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে যতদিন না এই ধরনের অন্যায় ও ভারসাম্যবিহীন ভূমি-মালিকানা থেকে উৎসারিত নানা দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সমাধান করা হয় ততদিন নেপালের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাপ্তি হবে না, নেপাল একটি সম্পদশালী দেশ হয়ে উঠবে না। নেপালে বামপন্থী রাজনীতির সমস্যা হলো যে বামপন্থী পার্টিগুলি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের এই সমস্যার বামপন্থী সমাধানের মতো অবস্থানে নেই।

নেপালের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, যেমন নেপালের সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশের রূপান্তর বা সংস্কারের বিরাট সুযোগও হাতছাড়া করা হয়েছে। এগুলি তৈরি হয়েছিল সম্পূর্ণ রাজতন্ত্রের আমলে, এখনো এগুলি পুরনো জমানার অনেক অবশেষ বয়ে চলেছে। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, দেরি করানোর সংস্কৃতি, জনমুখী ও দরিদ্রমুখী মনোভাবের অভাব এখনো এই সব কাঠামোয় অত্যন্ত বেশি পরিমাণে রয়ে গেছে। ধনী ও ক্ষমতাশালীরা, অথবা ক্ষমতাশালী লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে যাদের, তারাই শুধু এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ঠিক সময়ে ঠিকভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু বিশাল সংখ্যাগুরু জনগণ এখনো এদের মনোভাব আগের মতোই দেখতে পান। জমানার পরিবর্তন তাঁরা টের পান না। শুধু দেখতে পান সরকারের লোকগুলো পাল্টে গেছে। ২০০৮ সালে যখন প্রচণ্ডের নেতৃত্বে মাওবাদীরা ক্ষমতায় এলো, তখনই ছিল রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংস্কার শুরু করার সঠিক সময়। সবাই তখন এরকম সংস্কারের জন্য তৈরি ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড স্থির করলেন যে প্রথমে সংস্কার শুরু না করে পুরনো ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে। তারপর যখন তিনি সেনাবাহিনীর প্রধানকে আদেশ অমান্য করার জন্য অবসর গ্রহণের মাস দুয়েক আগে বরখাস্ত করার পদক্ষেপ নিলেন, তাতে ফল হলো উল্টো। প্রচণ্ডকেই ক্ষমতাচ্যুত হতে হলো।

সংবিধান সভার পতনের একটা প্রধান কারণ হলো বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ভাঙন, বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতা। নতুন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সরকারের ধরন, এগুলি নিয়ে কোন্‌খানে সমঝোতা করা যায় আর কোথায় তা করা যায় না তার পার্থক্য করতে পারেনি তারা। তার ওপর, ১৫ মে, ২০১২ যে সমঝোতায় পৌঁছানো গেছিল, যাতে সংবিধান সভার সবগুলি দ্বন্দ্বের বিষয় প্রায় সমাধান করা গিয়েছিল, মদেসি দলগুলির চাপে সেই সমঝোতা থেকে পেছিয়ে আসে মাওবাদীরা।

নেপালে দ্বিতীয় বৃহত্তম বামপন্থী দল হলো কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (ইউনাইটেড মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট) বা সিপিএন (ইউএমএল)। সংবিধান সভায় তাদের আসনসংখ্যা ছিল নির্ধারক। তারা যে পক্ষ নেবে, সে পক্ষই চরম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। কিন্তু তারা পরিচিতির এজেন্ডার বিরুদ্ধে দাঁড়াল, তাদের নিজেদের পার্টির সিদ্ধান্ত ও নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর বিরুদ্ধে গিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করল। সংবিধান সভার চেয়ারপার্সন ছিলেন সিপিএন-ইউএমএল থেকে। তিনি যদি সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন যে সংবিধান সভার সময়তালিকা মেনে চলবেন তা হলে তিনি সর্বসম্মতির মাধ্যমে বা ভোটের মাধ্যমে বিবাদের বিষয়গুলির মীমাংসা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সংবিধান সভার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বসম্মতির পক্ষেও গেলেন না, আবার বিবাদের বিষয়গুলি নিয়ে ভোটেও গেলেন না। সংবিধান সভার শেষ অধিবেশনে, যেটা তিনি নিজেই ডেকেছিলেন, যখন ঝামেলার বিষয়গুলির নিষ্পত্তি ঘটানো যেত, সংবিধান সভাকে বাঁচানো যেত, তাতে তিনি উপস্থিতই হলেন না।

এই সব ঘটনা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সত্যি সত্যি দৃঢ়সংকল্প থাকলে, সেটাকে প্রাধান্য দিলে নেপালের বামপন্থীরা সংবিধান সভাকে রক্ষা করতে পারত, নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে পারত।

নতুন আসা ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি মাওয়িস্ট বা ইউসিপিএন(মাওবাদী) সহ নেতা ও কর্মীদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অধঃপতন লক্ষ্য করার মতো। সম্প্রতি ইউসিপিএন(এম) আর আগেই সিপিএন-ইউএমএল বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে রূপান্তরিত করতে এসেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া

রাষ্ট্রই তাদের রূপান্তর সাধন করল।

বামপন্থী সংগঠনগুলি ও বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে সংগঠনে নেওয়ার ব্যবস্থায়, মতাদর্শগত-সাংস্কৃতিক অভিমুখ ও ধরনে কোনো মৌলিক ও বাস্তব পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। রক্ষণশীল সংসদীয় দলে রূপান্তরিত সিপিএন-ইউএমএল-ই শুধু নয়, মাওবাদী দলও সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল, অপরাধী ও দুর্নীতিগ্রস্তদের বড় সংখ্যায় দলে নিয়ে নিচ্ছে, কোনো ঝাড়াই বাছাইয়ের পদ্ধতি ছাড়াই। এর উদ্দেশ্য হলো পার্টিকে আরও বড় করে যে কোনো ভাবে বুর্জোয়া সংসদে নির্বাচন জেতা। মাওবাদী নেতা ও কর্মীদের জীবনযাত্রায়ও বড়লোকি ভাব দেখা যাচ্ছে। তৃণমূল স্তরের সংগঠন গড়ে তোলা ও চালানোর জন্য গ্রামে যাওয়া প্রায় হয় না বললেই চলে। বলা যায় তারা একটি নতুন এলিট শ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলত পার্টি নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলির দূরত্ব ক্রমে বাড়ছে। সব মিলিয়ে, নেপালের বামপন্থীরা মতাদর্শগতভাবে, সাংস্কৃতিক ভাবে ও সাংগঠনিকভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের নেতৃত্বে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য এলেও তাদের জনপ্রিয়তা কমছে।

এই অবস্থায়, গত ৪ নভেম্বর নেপালে নতুন সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে এতে নেপালের বামপন্থীদের যে একটা বিরাট ব্যর্থতা দেখা যাবে সেটা নিশ্চিত। এই ব্যর্থতা হয়ত একটা শক থেরাপি হিসাবে কাজ করবে, তারা নিজেদের শোধরাতে বাধ্য হবে।

ঐক্যবদ্ধ হলে ও নিজেদের শুধরে নিলে নেপালে বামপন্থীরা এখনও একটা বড় শক্তি, যাদের কেউ হারাতে বা অস্বীকার করতে পারে না। তারা যদি তাদের বর্তমান রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুলগুলি শুধরে নেয়, তাদের সমঝোতার মনোভাব, তাদের ভুলগুলি ঠিক করে নেয়, মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অধঃপতনের বিপরীত পথ নেয় তাহলে এখনও আশার যথেষ্ট কারণ আছে যে নেপালের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বামপন্থীদের নেতৃত্বে চলবে ও তা সম্পূর্ণ হবে। নেপালে বামপন্থীদের পরাজিত করতে পারে শুধু তারা নিজেরাই, বারবার ভুল করে, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের মাধ্যমে, এবং অতি দক্ষিণপন্থী ও অতি বাম রাজনৈতিক কাজের মধ্যে দিয়ে।

১। সাতটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল: (ক) নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (ফোর্থ কনভেনশন), (খ) নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট), (গ) নেপাল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি, (ঘ) কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মার্কসিস্ট), (ঙ) কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (ইউনাইটেড), (চ) কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (বর্মা), (ছ) কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (অমত্য)

২। সাতটি সংসদীয় দল ছিল: (ক) নেপালি কংগ্রেস, (খ) নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনাইটেড মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট), (গ) জনমোর্চা নেপাল, নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনিটি সেন্টার)-এর ওপেন ফ্রন্ট, (ঘ) নেপালি কংগ্রেস (ডেমোক্রাটিক), (ঙ) ইউনাইটেড লেফ্‌ট ফ্রন্ট, (চ) নেপাল সদভাবনা পার্টি (আনন্দীদেবী), (ছ) নেপাল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজ্যান্ট পার্টি (সাতটি দলের মধ্যে চারটিই বামপন্থী দল বা বামপন্থী দলের জোট)

৩। ইউএনডিপি নেপাল, ২০০৯। দ্য ইন্টারিম কনস্টিটিউশন অফ নেপাল, ২০৬৩ (২০০৭), আর্টিকল নং ২১, পৃ. ৭২

৪। দ্য সেক্রেটারিয়েট অফ পার্লামেন্ট, ২০১৩। সংবিধান সভা দর্পন, পৃ. ৩৫৪

৫। ঐ : দ্য সেক্রেটারিয়েট অফ পার্লামেন্ট ২০১৩, পৃ. ৩৫১-৫৫

৬। নেপালের সুপ্রিম কোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, ১ অক্টোবর, ২০১৩

৭। ভারতের বর্তমান সংসদে নারীদের অনুপাত ১১ শতাংশ, আর মার্কিন কংগ্রেসে ১৭.৮ শতাংশ

৮। ইউএনডিপি নেপাল ২০০৯। দ্য ইন্টারিম কনস্টিটিউশন অফ নেপাল, ২০৬৩ (২০০৭), আর্টিকল নং যথাক্রমে ২০, ৮ ও ২০, পৃ. ৭২ ও ৬০

৯। দ্য সেক্রেটারিয়েট অফ পার্লামেন্ট ২০১৩। সংবিধান সভা দর্পণ, পৃ. ৩৫২ ও ৩৫৪

১০। ঐ, পৃ. ৩৫২

১১। ঐ, পৃ. ৩৫৩

১২। কেন্দ্রীয় ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, অক্টোবর ২০১১। নেপাল লিভিং স্ট্যান্ডার্ড সার্ভে ২০১১/১২: হাইলাইট্‌স। নেপাল সরকার। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন সেক্রেটারিয়েট। কাঠমান্ডু। নেপাল।

পার্টি বিভাজনের ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলির প্রতিনিধিত্ব কমেছে

জোহান পিটার অ্যান্ডারসন

২০০৬ সালের শান্তি চুক্তি ও তার পর ২০০৮ সালে নির্বাচনে বিজয়, যাতে মাওবাদীরা সংবিধান সভায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন, তার পর বিপ্লবী শক্তিগুলির মধ্যে মতপার্থক্য বাড়তে থাকে। ফলস্বরূপ ২০১৩ সালে মাওবাদী দলটি ভেঙে যায়, তার একটি অংশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) থেকে বেরিয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) গঠন করে।

সিপিএন(এম)-এর বয়কট

১৯ নভেম্বর ২০১৩ যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার সম্পর্কিত বিভিন্ন দাবিদাওয়া রাখে সিপিএন(এম)। সেইসব দাবি মেনে নেওয়া হয়নি। তারা সেইজন্য নির্বাচন বয়কটের একটি উদ্যোগ নেয়, যাতে মোট ৩৩টি পার্টি অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে

অংশ নিয়েছিল ১২২টি পার্টি। সেখানে ৩৩টি পার্টির বয়কট কম নয়।

এই বয়কট কীভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে। কিছু পরিসংখ্যান দিলে তার আভাস পাওয়া যাবে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে ১.৭৭ কোটি ভোটার নথিভুক্ত হয়েছিল। ২০০৬ সালের পর যাদের বয়স ১৮ হয়েছিল তাদের সেবার নানা কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছিল। নইলে সংখ্যাটা আরো বেশি হতো। ভোট পড়েছিল ১০,৭০০,০০০, বলা যায় ৬৩ শতাংশ। এটাকে ভাবা হয়েছিল বেশি, কারণ ভোটারদের ভোট দিতে নিজের গ্রামে যেতে হয়েছিল। নেপালে গরিব মানুষের অনেকেই শহরে আসেন জীবিকা অর্জনের জন্য আর সেখানেই থেকে যান, কিন্তু তাদের সরকারি ঠিকানা থেকে যায় গ্রামেই। দেশের বাইরে যারা থাকেন তারাও ভোট দিতে পারেন নি। পুরুষমানুষরা যেহেতু বেশি বাইরে থাকেন তাই ভোটদাতাদের ৫২ শতাংশ ছিলেন নারী।

২০১৩ সালে ভোট দেওয়ার উপযুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১.৭৪ কোটি। এদের মধ্যে ভোটের জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন ১.২১ কোটি। ২০১৩ সালে নথিভুক্তি প্রক্রিয়া ছিল ২০০৮ সালের চেয়ে অনেক কঠিন। প্রক্রিয়া একই রকম থাকলে এবার কতজন নথিকরণ করতেন সেটা বলা অসম্ভব।

১০ লক্ষ কম ভোটদান

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নথিভুক্তির সংখ্যা ৫০ লক্ষ কম। সেটা স্বেচ্ছায় হোক, বা অন্য কারণে হোক। সংখ্যাটা বিশাল। আর সেজন্য নির্বাচনের ফলে তার প্রভাব পড়েছে। সহজ করে বললে বলা যায় যে, এই সংখ্যার মধ্যে যতজন নির্বাচন বয়কট করেছেন, নির্বাচনে বিপ্লবীদের অংশগ্রহণ ততখানি কমে গেছে। অর্থাৎ তারা ইউসিপিএন(এম)।

নথিভুক্তদের মধ্যে যারা ভোট দিয়েছেন তাদের অংশ ২০১৩ সালে ২০০৮ সালের তুলনায় অনেক বেশি। নথিভুক্তদের ৭৮ শতাংশ ভোট দিয়েছেন, যেখানে ২০০৮ সালে ভোট দিয়েছিলেন নথিভুক্তদের ৬৩ শতাংশ। এর অর্থ, ৯৫ লক্ষ জন ভোট দিয়েছেন। সংখ্যাটা ২০০৮ সালের চেয়ে ১০ লক্ষ কম। এর থেকে মনে হয় যে এবার যারা নথিভুক্ত করেছিলেন তারা ভোট দিতেই চেয়েছিলেন, আর নথিভুক্তির প্রক্রিয়া যারা নথিভুক্তি করতে চেয়েছেন তাদের পক্ষেই শুধু কঠিন হয়নি, এর ফলে ভুল নথিভুক্তিও কম হয়ে হয়েছে।

২০০৮ সালে বা ২০১৩ সালে, কোনোবারই যারা বিদেশে বাস করেন, বা বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকেন, তারা ভোট দিতে পারেন নি। কিন্তু ২০০৮ সালে এই ধরনের লোকেদের অনেকেরই নথিকরণ হয়েছিল, কারণ সেবার পরিবারের প্রধান পরিবারের অন্যদের নাম নথিকরণ করতে পারতেন। ২০১৩ সালে তা করা যায় নি। এবার নথিকরণ করতে গেলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিজেকেই তা করতে হতো।

যাই হোক, নথিকরণ হয়েছে ৫০ লক্ষ কম, আর ভোট পড়েছে ১০ লক্ষ কম। স্বাভাবিকভাবেই সিপিএন(এম) সমর্থকরা দাবি করতে পারেন যে অন্তত ৫০ লক্ষ মানুষ তাদের বয়কটকে সমর্থন করেছেন। নথিকরণ করেছেন অথচ ভোট দেন নি এমন ২২ শতাংশ বা ২৪ লক্ষকেও তারা বয়কটের মধ্যে ধরতে পারেন। তবে বিচার বিবেচনা করে বলা যায় যে ২০-৩০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে ভোট বয়কট করেছেন। আর বলা বাহুল্য যে এরকম বিরাট পরিমাণ বয়কট নির্বাচনের ফলে বিশাল প্রভাব ফেলবে— যে নির্বাচনে মোট ৫৭৫ জন প্রতিনিধির ২৪০ জনই আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে নির্বাচিত (ভারতের মতো— অনুবাদক)। আর এতে ক্ষতি হয়েছে ইউসিপিএন(এম)-এরই, অন্য মধ্যপন্থী দল যেমন নেপালি কংগ্রেস বা সিপিএন(ইউএমএল)-এর নয়।

ইউসিপিএন(এম)-এর ভোট কমেছে ১৭ লক্ষ

২০০৮ সাল ও ২০১৩ সালে তিনটি প্রধান দলের প্রাপ্ত ভোটের মধ্যে তুলনা করলেও বয়কটের ফল সম্পর্কে কিছুটা বোঝা যাবে: নেপালি কংগ্রেস ২০১৩ সালে পেয়েছে ২৪ লক্ষ ভোট, ২০০৮ সালে পেয়েছিল ২২ লক্ষ ভোট; সিপিএন(ইউএমএল) ২০১৩ সালে পেয়েছে ২২ লক্ষ ভোট, আর ২০০৮ সালে তারা পেয়েছিল ২১ লক্ষ ভোট; আর ইউসিপিএন(এম) ২০১৩ সালে পেয়েছে ১৪ লক্ষ ভোট, যেখানে ২০০৮ সালে তাদের ভোট ছিল ৩১ লক্ষ। আর রাজতন্ত্রীদের ভোট ৫ লক্ষ বেড়েছে। ইউসিপিএন(এম)-এর পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা যে ১৭ লক্ষ কমে গেছে যেখানে অন্যান্য দলের ভোট মোটামুটি একরকমই আছে, এটা যদি আমরা বিচার করি, তার থেকে মনে হয় যে বয়কটের ফলই ছিল নির্ধারক।

নেপালে অসন্তুষ্টি/ক্ষোভ শুধুমাত্র যে ইউসিপিএন(এম)-এর প্রতিই ছিল এমন নয়। অন্য দলগুলির প্রতিও একই রকম ক্ষোভ আছে। শোনা যাচ্ছে, বয়কট সমর্থক বিপ্লবীদের কেউ কেউ নাকি ইউসিপিএন(এম)-কে শাস্তি দিতে নির্বাচনে নেপালি কংগ্রেস বা সিপিএন(ইউএমএল)-কে ভোট দিয়েছেন, যদিও তারা এই পার্টিগুলিকে সমর্থন করেন না।

নির্বাচনের ফল থেকে নতুন সংবিধান সভার আসন সংখ্যা এরকম হবে বলে মনে হয়: নেপালি কংগ্রেস ১৯৬, সিপিএন(ইউএমএল) ১৭৫, ইউসিপিএন(এম) ৮০। দুটি রাজতন্ত্রী পার্টি (আরপিপি ও আরপিপি-এন) ৩৩। সব মিলিয়ে নতুন সংবিধান সভার প্রতিনিধি সংখ্যা হবে ৬০১।

নির্বাচনের এই ফলের অর্থ শুধুমাত্র সংসদীয় কাজকর্মের উপর নির্ভর করলে মাওবাদীদের নতুন সংবিধানে কী থাকবে তা স্থির করতে পারবে না। বরং, নেপালি কংগ্রেস ও সিপিএন (ইউএমএল) যেরকম সংবিধান করতে চাইবে সেটি হবে—

১৯৯৬ সালে যার বিরুদ্ধে মাওবাদীরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তার মতোই— শুধু রাজা থাকবে না।

নির্বাচনে কারচুপি?

এ বছরের নির্বাচনের বিরুদ্ধে সমালোচনা উঠেছে, বিশেষত যারা হেরে গেছে তাদের পক্ষ থেকে। ইউসিপিএন(এম) একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেছে, এবং ঘোষণা করেছে যে অন্য কিছু ঘোষণা না করা পর্যন্ত তারা নতুন সংবিধান সভায় অংশ নেবে না। কিছু কিছু কারচুপি যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তার একটা আভাস পাওয়া যায় এই তথ্য থেকে, যে ১২২টি পার্টি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল তার মধ্যে ৭৮টি ১০,০০০-এর চেয়ে কম ভোট পেয়েছে। কিন্তু নির্বাচনে দাঁড়াতে গেলে তাদের অন্তত ১০,০০০ জনের স্বাক্ষর জমা দিতে হয়। এর অর্থ এই যে ঐ স্বাক্ষরগুলির অনেকগুলিই ছিল ভুয়া, জমা দেওয়া তালিকা ভালো করে দেখা হয় নি। কিন্তু ২০০৮ সালের চেয়ে ২০১৩ সালে বেশি কারচুপি হয়েছে এরকম বলা কঠিন।

এই ভোটে হারাটা ইউসিপিএন(এম), সিপিএন(এম)-এর পক্ষে, নেপালে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে কী সংকেত দেয়? সেটা বলা সহজ নয়। বয়কটকারী ৩৩টি দল নতুন সংবিধান সভার বিরোধিতা করবে, এটিকে বেআইনি আখ্যা দেবে। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়াই নতুন সংবিধান পাশ করা হলে সেটিকেও তারা গ্রহণ করবে না। ইউসিপিএন(এম)-ও নিশ্চয়ই নতুন সংবিধানের বিরোধিতা করবে। ৮০টি আসন নিয়ে, সংসদে তারা বিশেষ কিছু করতে পারবে না। তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লব আবার ছড়িয়ে পড়বে রাস্তায়, কাজের জায়গায়, গ্রামে।

দুর্নীতির অভিযোগ

ইউসিপিএন(এম)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা একটা সাধারণ দুর্নীতিগ্রস্ত সংসদীয় দলে অধঃপতিত হয়েছে। সন্দেহ নেই যে ইউসিপিএন(এম)-এর মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে। এতেও সন্দেহ নেই যে ইউসিপিএন(এম) নেতৃত্ব পার্টির তৃণমূল স্তরের সংগঠনকে দুর্বল করে ফেলেছেন, "গণলাইন" পরিত্যাগ করেছেন, তারা শহরে ক্ষমতার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। কিন্তু এখন তারা যেরকম শাস্তি পেয়েছেন, তাতে নিশ্চয় পার্টির মধ্যে একটা শুদ্ধিকরণ ঘটবে। আর তাতে নতুন সিপিএন(এম)-এর একটা ভূমিকা থাকবে।

২০০৬ সালের পর নেপালের রাজনৈতিক বিকাশ থমকে গেছে। ২০০৮ সালে নির্বাচিত সংবিধান সভা যে নতুন সংবিধান তৈরি করতে পারল না সেটা স্বাভাবিক নয়। ২০০৬ সালের শান্তি চুক্তিতে সাধারণ মানুষের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুই বাস্তবায়িত হয় নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ভূমি সংস্কারের বিষয়ে কিছুই করা হয় নি।

প্রধান যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা রাষ্ট্রের ধরনে। রাজার ক্ষমতা চলে যাওয়ার ফলে রাষ্ট্রের ধরনটা এখন অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। কিন্তু সেনাবাহিনী একই থেকে গেছে, সামান্য কিছু প্রাক্তন মাওবাদী সৈন্য তাতে জায়গা পেয়েছে মাত্র। মাওবাদী সেনাবাহিনী তুলে দেওয়া হয়েছে।

মাওবাদীরা যে নতুন কিছুর প্রতিনিধি— এই মর্মে দেশের মধ্যে ও দেশের বাইরে জনগণের যে আশা ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত খুব হতাশ ও দুঃখজনক দেখায়। ঐতিহাসিকভাবে নেপালি কংগ্রেস ও সিপিএন(ইউএমএল)— এরাও সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু তাদের নেতারা শহরের, বিশেষ করে কাঠমান্ডু উপত্যকার উচ্চ শ্রেণীর অংশ হয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে যেন এবারও অবস্থা সেদিকেই যেতে পারে। কিন্তু সেটাই ঘটবে এমন ভাবার কারণ নেই।

প্রথমত, সিপিএন(এম)-এর মধ্যে একটা বাম সংগঠিত বিরোধীপক্ষ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক লাইন নিয়ে ইউসিপিএন(এম)-এর মধ্যে এখনও সংগ্রাম রয়েছে।

সিপিএন(এম)-এর কাছে কোনো গ্রহণযোগ্য বিকল্প নেই

সিপিএন(এম)-এর ক্ষেত্রে বলা যায়, তাদের ইউসিপিএন(এম)-এর সঠিক বিকল্প হিসাবে দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচনের আগে তাদের প্রধান দাবি ছিল একটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, যেখানে দেশের সব প্রধান রাজনৈতিক দল বসে মৌলিক বিষয়গুলিতে ঐকমত হবে।

কিন্তু সেটাকে নির্বাচনের বিকল্প পথ হিসাবে দেখা কঠিন, কারণ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে নেপালি কংগ্রেস ও সিপিএন(ইউএমএল)-এর সঙ্গে একমত হতে হবে। এটা বাস্তবসম্মত নয়। এই পার্টিগুলি জনযুদ্ধে বিপরীত পক্ষে ছিল।

পার্টিতে ভাঙনও মাওবাদীদের প্রভাব কমিয়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে, ইউসিপিএন(এম)-এর তৃণমূল স্তরের সংগঠনের দুর্বলতা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য দৈনন্দিন সংগ্রামে গুরুত্ব না দেওয়াটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভুল। সন্দেহ নেই যে ইউসিপিএন(এম) ও সিপিএন(এম) মিলে গণআন্দোলনের একটা বড় অংশের প্রতিনিধি। ২০০৬ সালের শান্তি চুক্তির পর এই আন্দোলনকে আরও বিকশিত করার অক্ষমতা দেখিয়ে দেয় যে এদের নেতৃত্ব যুদ্ধের ক্ষেত্রে ভালো হলেও, এপর্যন্ত তারা সংগঠিত গণশক্তির জন্য লড়াই আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা দেখিয়েছে।

(অ্যান্ডারসন নেপালে 'হেলথ টিম ফর নেপাল— সলিডারিটি উইথ ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট ইন নেপাল'-এর সংগঠক। জনযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই এরা নেপালের ঘাঁটি এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতেন। লেখাটি *অ্যানালিটিক মান্থলি রিভিউ*, ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে পাওয়া)

নেলসন ম্যান্ডেলা : উপকথার উন্মোচন

শুচিব্রত সেন

দক্ষিণ আফ্রিকা, মহাত্মা গান্ধীর সুবাদে, ভারতীয়দের কাছে সুপরিচিত। সেটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। যদিও শুরুটা একটু আগে (১৮৯৩-১৯৪১)। সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশ শাসকের বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর আন্দোলন। অ্যাপারথাইড (Apartheid) শব্দটি, যার অর্থ পৃথকীকরণ বা বর্ণভিত্তিক বঞ্চনা, তখনও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস যে খাতে প্রবাহিত হতে থাকে তার থেকে উঠে আসেন প্রবাদ-প্রতিম এক নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। ২০১৩-র ৬ ডিসেম্বর ৯৫ বৎসর বয়সে এই নেতার মৃত্যুতে সমস্ত বিশ্বের নেতৃত্ব যেভাবে তাঁর প্রশস্তি গান করেছেন তা নিঃসন্দেহে এক চমকপ্রদ বিষয়। সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে তাঁর মূল্যায়নে মনে হয় যে তাঁর কৃতিত্ব আকাশছোঁয়া। অনেকেই আবার, বিশেষ করে ভারতীয়রা তাঁকে গান্ধী শিষ্য বলে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন। ইতিহাসের কঠিন বিচারে অবশ্য সব মূল্যায়নই পুনর্গঠিত হয়, আর সেটুকু মনে রেখেই এই প্রবন্ধ ম্যান্ডেলার এক যথাসাধ্য নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ।

সময় ও ম্যান্ডেলা

যে কোন নেতৃত্ব, তা তিনি যত উল্লেখযোগ্যই হোন, এক বিশেষ সময়ের ফসল। আর এই সময় মানেই ইতিহাসেরই এক পরিপ্রেক্ষিত। তাই ম্যান্ডেলার উত্থানের পশ্চাতের এই পরিপ্রেক্ষিতটি প্রথমেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের এক তিক্ত ফসল দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। দক্ষিণ আফ্রিকা লুঠের অভিযানে প্রথম অগ্রগামী হল্যান্ড। ১৭৯৫ পর্যন্ত এটি ওলন্দাজ উপনিবেশই ছিল। সেখানে ওলন্দাজ বসবাসকারিরা নিজেদের পরিচিতি দিত Afrikaner বা বূয়ার হিসাবে, যার অর্থ চাষী বা Farmer। এরা দেশীয় আফ্রিকানদের জমি দখল করে তাদের দাস হিসাবে ব্যবহার করত। ১৮১৪-র পর এখানে ব্রিটিশ আধিপত্য শুরু হয়। ১৮১৮ সালে ব্রিটিশ আইন অনুসারে দাসপ্রথা বে-আইনি ঘোষণায় ওলন্দাজরা প্রমাদ গোনে। বূয়র যুদ্ধে (১৮৯৯-১৯০২) ব্রিটিশরা ওলন্দাজদের পরাজিত করে নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট নিয়ে গঠন করে Union of South Africa। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কেপ কলোনি। এই নবগঠিত বৃটিশ অধীনস্থ দক্ষিণ আফ্রিকার জন বিভাজনের একটি আনুমানিক হিসাবে পাওয়া যায়—

শতকরা ৭০ ভাগ কালো আফ্রিকান যারা বান্টু নামে পরিচিত; শতকরা ১৮ ভাগ ইউরোপীয় বংশজাত, যার মধ্যে আবার শতকরা ৬০ ভাগ ওলন্দাজ, বাকিরা বৃটিশ; শতকরা ৯ ভাগ মিশ্র জাতি যারা 'Coloured' নামে চিহ্নিত এবং শতকরা ৩ ভাগ এশীয়।

এই বিপুল সংখ্যক কালো মানুষদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম রাখত মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ। বিস্তৃত বিবরণে না গিয়ে বলা যায় কালো মানুষরা, দাসপ্রথা উঠে গেলেও ছিল এক ধরনের দাস। তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হতো Passlaws আইনের দ্বারা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতে গুরুতর পরিবর্তন আসে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর কমনওয়েলথে জাতিগত সমতা বৃদ্ধিতে শ্বেতাঙ্গরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। প্রায় সমস্ত শ্বেতাঙ্গ, বিশেষত ওলন্দাজরা, জাতিগত সমতার বিরুদ্ধে ছিল। আফ্রিকানার ন্যাশনাল পার্টির Dr. Malan এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন। শ্বেতাঙ্গরা ঘোষণা করল তারা প্রভুর জাতি এবং কালোরা নিম্নস্তরের মানুষ। এমন কি ডাচ রিফর্মড চার্চ বাইবেল উদ্ধৃত করে (ভুলভাবে) বলতে লাগল যে শ্বেতাঙ্গরাই একমাত্র যীশুর সন্তান। ১৯৪৮ সালে Dr. Malan-এর দল ক্ষমতায় এসে 'black menace' বা কালোর দূষণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য ঘোষণা করল Apartheid বা সবরকমভাবে কালোদের পৃথকীকরণ। যথার্থ অর্থে এদের হিটলারের উত্তরসূরী বলা যেতে পারে। যেহেতু কালো মানুষ ছাড়া চাষবাস, খনিশ্রমিক পাওয়া যাবে না, তাই তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়নি।

Apartheid নীতি তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলল অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীদের আমলেও। কিন্তু এবার এল প্রতিরোধ। কিন্তু প্রতিরোধ অত সহজ ছিল না। ইতিমধ্যে ঠান্ডাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেই কমিউনিস্ট আন্দোলন বলে চিহ্নিত করে মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার নামিয়ে আনা হতে লাগল। সময় পালটালেও বলা যায় "The Spectre of Communism is hunting South Africa". আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো দক্ষিণ আফ্রিকারও কিছু কালো মানুষ দেশে ও বিদেশে শিক্ষালাভ করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯১২ সালের ৮ই জানুযারি প্রতিষ্ঠিত হয় সাউথ আফ্রিকান নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেস। এর প্রথম সভাপতি জন দুবে (John Dube)। একজন কবি হিসাবেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ১৯২৩ সালে তৈরি হলো আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (ANC)। এই কংগ্রেসেই নেতৃত্ব দিতে ষাট-এর দশকে উঠে এলেন নেলসন ম্যান্ডেলা।

Thembu রাজ পরিবারে Madiba গোষ্ঠীর সন্তান ম্যান্ডেলা। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি লাভ করেছিলেন একাধারে রাজ ও অন্যদিকে জনজাতি বা ট্রাইব মতাদর্শ। জোহানসবার্গ থেকে আইন পাশ করে তিনি দক্ষিণ আাফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালে শুরু হয় Defiance Campaign। অহিংস ভাবেই শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন, যে কারণে তাঁকে অনেকে মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী বলে থাকেন। কিন্তু ম্যান্ডেলা বুঝতেন Real Politic। প্রয়োজন অনুসারে তাঁর মতাদর্শ বদলাতেন। শ্বেতাঙ্গ সরকারের দমননীতি থেকে তিনি বোঝেন যে অহিংস নীতি কার্যকর হবে না। ইতিমধ্যে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে তিনি সাউথ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টি (SACP) র কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে লাগলেন গোপনে। স্বভাবতই দেশদ্রোহিতার তকমা লাগলো গায়ে। ১৯৫৬-৬১ পর্যন্ত তাঁর ও অন্যান্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে চলল Treason Trial। ১৯৬১ থেকে ম্যান্ডেলা তাঁর আন্দোলনের অভিমুখ বদলালেন। প্রাণহানি না করে তাঁরা শুরু করলেন নাশকতামূলক কাজকর্ম। ইতিপূর্বে ১৯৬০-এ প্রতিবাদ আন্দোলন পৌঁছায় এক চূড়ান্ত পর্যায়ে। Passlaws-এর বিরুদ্ধে এক বিরাট বিক্ষোভ আন্দোলন জোহানসবার্গের কাছে আছড়ে পড়ে। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় ৬৭ জনের, আহতের সংখ্যা ততোধিক। গ্রেপ্তার হন ১৫,০০০ আফ্রিকান। নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এএনসিআই। দক্ষিণ অফ্রিকার রাজনৈতিক আন্দোলনে এটি একটি মোড় ঘোরানো ঘটনা। ম্যান্ডেলা ও অন্যান্য নেতাদের উপলব্ধি হল যে হিংসার জবাব হিংসা দিয়েই দিতে হবে। তৈরি হল একটি গোপন সামরিক সংগঠন। Umkhontowe-sizwe, অর্থাৎ Spear of the Nation। বিভিন্ন হিংসাত্মক প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হলেন ম্যান্ডেলা। ১৯৬২ সালে বিখ্যাত বা কুখ্যাত Rivora Trial-এ তাঁর যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। রোবেনা দ্বীপে ২৭ বছর কারাদণ্ডের পরে ১৯৯০ সালে তিনি মুক্ত হন। অন্যতম নেতা Chief Luthuli কিন্তু অহিংস পথ থেকে সরে আসতে রাজি ছিলেন না। তাঁর আত্মজীবনী Let My People Go আজও এক বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালে তাঁকে হত্যা করা হয়। যদিও কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যার তত্ত্ব খাড়া করেছিল। সেদিক থেকে ঐ নেতাকেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

১৯৯০-এ ম্যান্ডেলা যখন মুক্তি পান, তখন আফ্রিকার ভিতরে ও বাইরে ঘটে গেছে অনেক পরিবর্তন। সোভিয়েতের পতন ঘটেছে। গোটা পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ পরাজয়ের পথে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক জগৎ বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে মুখর। কমনওয়েলথ, ইউএনও এবং অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি এই প্রতিবাদের অন্যতম শরিক। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নি। ইতিমধ্যে অ্যাঙ্গেলা ও মোজাম্বিক দীর্ঘ সংগ্রামের পর পর্তুগীজ শাসন মুক্ত হয়েছে। জিম্বাবোয়ে স্বাধীনতা পেল ১৯৮০ তে। দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন আফ্রিকার দেশগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেল। স্বাধীনতা ব্যতীত তাদের বিশ্রামের অবকাশ নেই— স্বভাবতই এই ঘোষণা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে চিন্তিত করে তুলল। দেওয়ালের লিখন পড়তে ভুল হয়নি নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বোথা-র। ১৯৭৯ সালেই তিনি বললেন:

> A revolution in South Africa is no longer a remote possibility. Either we adapt or we perish. White domination and legally enforced appertheid are a recipe for permament conflict.

একটা সেফটি ভাল্বের প্রয়োজন ছিল। কিছু কিছু সংস্কার করা হলো, তার মধ্যে প্রধান হল ১৯৮৬ তে পাস ল-র অবলুপ্তি। ১৯৮৯ এ নূতন প্রেসিডেন্ট হলেন F W de Klerk। আন্তর্জাতিক বিরোধিতা, স্বাধীন আফ্রিকার দেশগুলির অশান্ত মনোভাব, এবং দেশের ভিতর আরও একটি বিপ্লবী দল Zulu Inkatha-র অভ্যুত্থান ম্যান্ডেলার মুক্তিকে ত্বরান্বিত করল। ১৯৯০ হলো সেই সময়।

মুক্তি পেয়েই ম্যান্ডেলা পুনরায় ফিরে গেলেন অহিংস নীতিতে। সমঝোতাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর প্রধান অস্ত্র। শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি নিজের জাতির বিরোধিতা সত্ত্বেও Klerk-এর কাজ অনেক সহজ করে দিল। ১৯৯৩-র নির্বাচনে ANC বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করলো। Inkatha ও Nationalist Party (শ্বেতাঙ্গ) সরকারের শরিক হলো ম্যান্ডেলার প্রচেষ্টায়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কালো প্রেসিডেন্ট হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা, উপরাষ্ট্রপতি হলেন Klerk। সম্ভব হয়েছিল এক সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ এড়ানো। কৃতিত্বটা ম্যান্ডেলার সঙ্গে ক্লার্ক-এরও প্রাপ্য।

ম্যান্ডেলা : হিংসা ও অহিংসা

নেলসন ম্যান্ডেলা, তাঁর পারিবারিক জীবন বাদ দিলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিতর্কিত চরিত্র। ANC-র অহিংস রাজনীতির ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি হিংসাত্মক আন্দোলনকে প্রকাশ্যেই সমর্থন জানিয়ে যুক্তি সাজিয়েছিলেন। মার্কসবাদের সংস্পর্শে আসার ফলে অন্তত তিনি মনে করেছিলেন, "The communists disdain to conceal their aims"। নেলসনের নিজের ভাষায়: "We believe that as a result of Government policy, violance by the African people had become inevitable... Even after 1949, the ANC remained determined to avoid violence"। কিন্তু যে কোন রকম আন্দোলনই সরকারের অপছন্দ ছিল, এবং তাকে

দমন করার হাতিয়ার ছিল Suppression of Communism Act— আমেরিকার ঘোষিত নীতি Containment of communism এর শাখা নীতি। ANC-র স্বেচ্ছাসেবকরা যে শপথ নিতেন সেখানে হিংসার কোন কথা ছিল না। আফ্রিকার সংসদে যেহেতু কালোদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, সেহেতু সেখানকার পাশ হওয়া আইন তাঁরা মানতে বাধ্য নন। এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৭৭৬) এই সেই বিখ্যাত উক্তি "No taxation without Representation"— প্রতিনিধি না থাকলে করও দেওয়া হবে না।

ম্যান্ডেলার প্রদত্ত বক্তৃতা বা বিচারের সময় তাঁর ভাষণেই ফুটে ওঠে এই হিংসা-অহিংসা নিয়ে তাঁর নিজেরই দ্বন্দ্ব। যে কোন বিক্ষোভ মিছিলে কড়া নির্দেশ ছিল, "careful instructions were given to organisers to avoid any recourses to violence"— সংগঠকদের ভালোভাবে নির্দেশ দেওয়া ছিল যাতে হিংসার আশ্রয় না নেওয়া হয়। সম্ভবত ক্রমাগত অত্যাচারের মুখে দলের নীচের তলার চাপ ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধের। তিনি একই সাথে বলছেন, "But the hard facts were that fifty years of non-violence had brought the African people nothing but more and more repressive legislation and fewer and fewer rights" (সত্য এই যে পঞ্চাশ বছরে অহিংস আন্দোলন আফ্রিকার জনগণকে আরো আরো নিপীড়নমূলক আইন, আরো আরো কম অধিকার ছাড়া আর কিছু দেয়নি)। কাজেই, violence is the only way out— হিংসা ছাড়া পথ নেই।

কিন্তু সশস্ত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। সামগ্রিক বিপ্লব তাঁর লক্ষ্য কখনই ছিল না। চার রকমের সশস্ত্র আন্দোলনের কথা তিনি বলেছেন। ১) নাশকতা, ২) গেরিলা যুদ্ধ, ৩) সন্ত্রাসবাদ, ৪) প্রকাশ্য বিপ্লব। এর মধ্যে যেটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা হলো শুধু নাশকতা। আরেকজন আফ্রিকাবাসী ফ্রানজ ফেনন আলজিরিয়ার ফরাসী উপনিবেশ বিরোধী যুদ্ধে দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পেরেছিলেন, "Decolonisation is a violent phenomenon"।

এখানেই অবশ্য শেষ নয়। ম্যান্ডেলা গণআন্দোলনকে অস্বীকার করেননি। আবার বিদেশে গিয়ে সামরিক শিক্ষাও তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর এ কথাও মনে হয়েছিল যে সরকারপক্ষ অনমনীয় থাকলে সন্ত্রাসবাদ ও গেরিলা যুদ্ধও শুরু হতে পারে। "We decided, therefore, in our preparations for the future, to make provisions for the possibility of guerrilla warfare". আন্দোলনের পথ সম্পর্কে ম্যান্ডেলার এই দ্বিধাগ্রস্ততা কি তাঁর নিজেরই চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল, নাকি ও সব শুধু বাগাড়ম্বর, তা জানার উপায় নেই, কেননা এরপরেই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে কারান্তরালে চলে যান। তবে সমঝোতা যে তাঁর রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সে কথা পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত।

স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা ও ম্যান্ডেলা

কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ম্যান্ডেলার বক্তব্য অবশ্য পরিষ্কার। তিনি তাদের সাহায্য নিয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসানের জন্য, এর বেশি কিছু নয়: "The Communist party sought to emphasise class distinctions whilst the ANC seeks to *harmonise* them. This is, My Lord, a vital distinction"— কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেয়, আর এএনসি চায় তাদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে। ম্যান্ডেলা কোন ভাবেই গান্ধী ধাঁচের ও নেহরু ধরনের সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্র তো দূরস্থান। জানা যায় যে সরকার গঠিত হওয়ার আগেই শ্বেতাঙ্গদের সাথে তাঁর এক সমঝোতা হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গদের সম্পত্তি, সম্পদ ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষার সমঝোতা। পরিবর্তে ৮৫০ মিলিয়ন ডলার আইএমএফ এর ঋণের প্রতিশ্রুতি। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর বক্তব্য অনুসারে স্বাধীনোত্তর দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল "tighten your belts" এবং "accept low wages so that investment would flow"— কোমরের কষি শক্ত করে বাঁধো, আর কম মজুরি মেনে নাও, যাতে বিনিয়োগ আসে। ধনতান্ত্রিক জীবন যাপনের বেশ কিছু বদভ্যাস তিনি রপ্ত করেছিলেন। *দি গার্ডিয়ান* পত্রিকা ম্যান্ডেলার মৃত্যুর পর এক শোকবার্তায় লিখেছিল যে তিনি বিভিন্ন বিদেশি ব্যবসায়ীদের সহায়তায় বিলাসবহুল ভ্রমণ করতেন, এবং তাঁর কন্যা জিনজি-র বিবাহের আতিথ্যের খরচা বহন করেছিলেন ক্যাসিনো-রাজ সল কের্জনার।

এগুলি যদি বিদেশি পত্রিকার অপপ্রচার হয়, তবে দেখা যেতে পারে শ্বেতাঙ্গ শাসনের তুলনায় স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যান্ডেলার অধীনে কতখানি উন্নতি হয়েছিল। তিনি তাঁর নিজের বক্তৃতাতেই শ্বেতাঙ্গ জাতির অধীনে কালো মানুষদের অসহায়তার কথা তুলে ধরেছিলেন। ব্যাঙ্ক, সোনার খনি এবং জমি জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি সেখানে ছিলো। শ্বেতাঙ্গ শাসনে যেখানে সাদা ছাত্রছাত্রীদের মাথা পিছু সরকারি খরচ ছিলো ১৪৪.৫৭ টাকা, সেখানে কালোদের জন্য বরাদ্দ ছিলো মাত্র ১২.৪৬ টাকা। জনজাতির উদাহরণ তুলে তাঁর বক্তব্য ছিলো, জমি কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তা গোষ্ঠী বা সমাজের। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিজস্ব সম্পদ ছিলো অনেক বেশি। অথচ দারিদ্র্য, অপুষ্টি এবং রোগ কালোদের নিত্যসঙ্গী। শুধু ১৯৬১তেই যক্ষা রোগে মৃত্যু হয় ৫৮,৪৯১ জনের। স্বাস্থ্যের এই চূড়ান্ত অবনতিতে ম্যান্ডেলা কালো মানুষদের ধ্বংসের আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। দেশের

মানুষদের নিজস্ব মর্যাদা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর জোর ছিল সেই আদর্শ রূপায়ণে যেখানে সমস্ত মানুষই এক গণতান্ত্রিক বাতাবরণে মিলিত (harmony) ভাবে বাস করতে পারবে। "...it is an ideal for which I am prepared to die".

সুযোগ যখন এল তখন ম্যান্ডেলা কী করলেন? বর্ণবিদ্বেষ অবসানের ২০ বছর পর দেখা যাচ্ছে যে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি এখনও অধিকাংশের নিত্যসঙ্গী। শতকরা ৫০ ভাগের বেশি বাস করে দারিদ্রসীমার নীচে। এই দেশে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ চিকিৎসার সুযোগ পায়। ২০১১-তেও সাধারণ মানুষের আয়ুষ্কাল গড়ে মাত্র ৫৮ বছর। জমি, খনি ব্যবসা প্রায় সবই বহুজাতিক সংস্থার অধীনে। এ সবেরই প্রতিবাদে ২০১২-র ১৬ই আগস্ট প্ল্যাটিনাম খনির শ্রমিকরা যখন বিক্ষোভ দেখান, তখন ৩৪ জন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এ ক্ষেত্রে এএনসি এবং সহযোগী ট্রেড ইউনিয়ন এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের জন্য দায়ী। ম্যান্ডেলা তখনও জীবিত। কিন্তু এ কোন উত্তরাধিকার রেখে গেলেন তিনি?

এ কথা ঠিক যে ম্যান্ডেলা মাত্র ৫ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৯৯-এ তিনি ক্ষমতা থেকে সরে যান। অথচ এর পরেও তিনি বেঁচেছিলেন প্রায় আরো ১২ বছর। প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। কেন তিনি ক্ষমতা থেকে স্বেচ্ছায় সরে গেলেন। এটি কি কোন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফল? SACP-র জ্যাকব জুমা বিপুল সমর্থন নিয়ে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন। তাঁকে অভিহিত করা হলো 'man of the people' নামে। ম্যান্ডেলার জনপ্রিয়তা কি কমছিলো? নাকি সব কিছুই চলে যাচ্ছিলো তাঁর হাতের বাইরে?

ম্যান্ডেলার মূল দুর্বলতা এখান থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর কাছে মূল দ্বন্দ্বটা ছিল race বা বর্ণভিত্তিক। শ্রেণীভিত্তিকে তিনি বিবেচনার মধ্যে আনেন নি। কমিউনিস্ট পার্টি থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামের অংশীদার করা হয়নি। এটি শুধু ম্যান্ডেলার নয়, SACP-র মত কম্যুনিস্ট পার্টির দুর্বলতা।

অনেক বিশ্লেষক মনে করেন যে জনজাতীয় (tribe) উত্তরাধিকার ম্যান্ডেলার মতাদর্শকে প্রভাবিত করেছিলো। তিনি নিজেও এ কথা অস্বীকার করেন নি। সেই মতাদর্শে সমঝোতা একটা বৈশিষ্ট্য। যে কোন ট্রাইব বা গোষ্ঠীতে প্রতিযোগিতা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার পায় consensus বা ঐকমত্য। ম্যান্ডেলার কাছে, "It was democracy in its purest form"। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এই জনজাতির গণতন্ত্রের ধারণা এক পুঁজিবাদ-পূর্ব অবস্থান। পুঁজিবাদী পর্বের শ্রেণী ধারণার সঙ্গে তা আদৌ খাপ খায় না, কারণ জনজাতীয় সম্পত্তির যৌথ মালিকানার অবসানে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। এমন কি বিভিন্ন জনজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও। জাতীয়তাবাদের ধারণাটাই তো ধনতন্ত্রের ফসল। কাজেই ম্যান্ডেলার মতাদর্শের মধ্যেই ছিলো যথেষ্ট বৈপরীত্য। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত তিনি অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য এক ধরনের সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন। যেমনটা আমাদের জওহরলাল নেহরুও ছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পনার ভক্ত। কিন্তু শ্রেণী ধারণা স্বচ্ছ না থাকায় উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা ছিলো অনিবার্য। ১৯৯২ সুইজারল্যান্ডের দাভোস সম্মেলন থেকে ফিরে এসে ম্যান্ডেলা একদম বিপরীত মেরুতে চলে গেলেন। বললেন,

> We have observed the hostility and concern of businessmen towards nationalisation, and we can't ignore their peceptions... we are well aware that if you cannot co-operate with business. you cannot suceed in generating growth. (জাতীয়-করণের প্রতি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধতা আমরা দেখেছি, তাদের চিন্তাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না... আমরা ভালোই জানি যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে প্রবৃদ্ধি ঘটানোয় সাফল্য আসে না)

অন্ত্যভাষ

সময় বা পরিস্থিতি যেমন কোন আন্দোলনের জন্ম দেয়, তেমনি তার সার্থকতা নির্ভর করে নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উপর। আবার এই সার্থকতাও সময় নিরপেক্ষ নয়। ইতালির ঐক্য আন্দোলনে কাভুর, এবং জার্মানীর ক্ষেত্রে বিসমার্ক তাই সার্থক। বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশক এক অস্থির সময়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন ও এক-মেরু বিশ্ব আমেরিকার উত্থানের সঙ্গে আবির্ভূত বিশ্বায়নের 'বেনে দানব'। শুধু অর্থনৈতিক একাধিপত্য নয়, সামরিক প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির কেন্দ্রবিন্দুতেও আমেরিকা। ইরাক ও আফগানিস্তান তার উদাহরণ। আফ্রিকার নিজেদের দেশগুলির মধ্যেই ঐক্যের অভাব। সেই পরিস্থিতিতে নেলসন ম্যান্ডেলার পক্ষে এক জাতীয় বিপ্লব পরিচালনা করা কি আদৌ সম্ভব ছিল? ১৯৭৯-তে বোথা দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বিপ্লবের আশঙ্কা করেছিলেন, ১৯৯০-এর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কি তার সহায়ক ছিলো? বিপ্লব সম্পন্ন না করার জন্য নেলসন ম্যান্ডেলার দায়ভার বোধহয় বিশেষ নেই, কিন্তু এক সৎ ও পরিষ্কার প্রশাসন তিনি তাঁর দেশবাসীকে দিতেই পারতেন। তাঁর জনপ্রিয়তার কোন খামতি ছিলো না। দুঃখের বিষয়, সেটুকুও দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁর কাছ থেকে পেলো না।

এই প্রবন্ধটি লেখার সময় তথ্য সরবরাহ করার জন্য আমি অধ্যাপক শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

মূল্যবৃদ্ধি : অন্য চোখে

মানস

জার্মানি ১৯২২। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। জনৈক দম্পতি ঠিক করলেন আর নয়, এখানে আর নয়, এই দেশটাতে আর নয়। বাড়ি-ঘর-জমি-জমা সবকিছু বেচে দিয়ে এবার বরং আমেরিকায় পাড়ি জমানোই শ্রেয়। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সবকিছু বেচে দিয়ে ভদ্রলোক যখন সপরিবারে এয়ারপোর্টে গেলেন টিকিট কাটতে, দেখলেন তাঁর সমস্ত টাকা দিয়েও টিকিটের দামটাও মেটাতে পারছেন না। অগত্যা ফিরতে হবে এয়ারপোর্ট থেকে। ট্যাক্সি নিলেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটানোর সময় দেখলেন— তাঁর সমস্ত সম্পত্তির দাম দিয়ে তখন ট্যাক্সির ভাড়াও মেটানো যাচ্ছে না। কারণ সেই সময়টা ছিল হাইপার-ইনফ্লেশান বা অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির যুগ। জিনিসপত্তরের দাম প্রকৃতই মিনিটে বাড়ছিল। এক ভদ্রলোক ১৯০৩-এ একটি দীর্ঘমেয়াদি পলিসি করেছিলেন। স্বপ্ন ছিল ম্যাচুরিটির টাকা পেলে বাড়ি-গাড়ি কিনবেন। ১৯২২ এ যখন পলিসি ম্যাচিওর করল— সেই টাকায় উনি ১ পাউন্ড রুটি ছাড়া কিছুই কিনতে পারলেন না। কারণ ওই অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি। তখন এক মার্কিন ডলার সমান ছিল ১ ট্রিলিয়নেরও বেশি জার্মান মার্ক। জার্মানির মুদ্রা মার্কের মূল্য একেবারে তলানিতে। ফলত জিনিসপত্রের দাম একেবারে আকাশ ছোঁয়া এবং ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। একটি দোকানে দেখা গেলো প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর একজন বেয়ারা একটা টেবিলে উঠে চা-কফির বর্ধিত দাম ঘোষণা করছে। সকাল দশটায় যদি ১ কাপ কফির দাম হয় ৪০০ মার্ক তবে ১০:১৫-য় বেয়ারা জানাবে যে কফির দাম বেড়ে হয়ে গেছে ৪৫০ মার্ক। বস্তা বস্তা নোট নিয়ে গিয়েও এক পাউন্ড রুটি পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ ওই অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি। প্রসঙ্গত উঠে এল হাইপার-ইনফ্লেশান বা অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির যুগের কিছু গল্প, তবে এ লেখার বিষয় সেটা নয়। এ লেখার উদ্দেশ্য হলো ভারতবর্ষের আজকের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টাকে একটু অন্য চোখে দেখে নেওয়া। অর্থাৎ মুক্ত-বাণিজ্যের কারবারিরা যেভাবে বিষয়টাকে দেখাতে চান তার থেকে একটু অন্যভাবে ব্যাপারটাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানি ছেড়ে আজকের ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধের দিকে যদি তাকাই তাহলেও একপ্রকার বিধ্বস্ত জনজীবন চোখে পড়ে। আইপিএল-এর অভূতপূর্ব স্ফূর্তির মধ্যেই চোখে পড়ে বিপিএল-দের জীবনের জমাট অন্ধকার। আর বিগত কয়েক বছরের একটানা মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় এই অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে। গরিব-মধ্যবিত্তের জীবন হয়েছে দুষ্কর। ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঝাঁপ পড়েছে ঝুপঝাপ। ক্ষুদ্র চাষিদের অবস্থা হয়ে উঠেছে সঙ্গিন। এসব কিছুর মূলে একটা অন্যতম কারণ হল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আগুন বাজার দর। এখন প্রশ্ন হলো, কেন হঠাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং তার মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের বাজার দর হয়ে উঠলো আকাশছোঁয়া?

মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারবারিদের ব্যাখ্যা

এক্ষেত্রে প্রথমেই দেখে নেবো মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধ্বজাধারীদের ব্যাখ্যা। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অশোক সঞ্জয় গুহর ব্যাখ্যাটি (*দি টেলিগ্রাফ*, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৩) উল্লেখযোগ্য। চাহিদা-যোগানের সহজ সম্পর্কের বিন্যাসের মাধ্যমে উনি খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। এবং ট্র্যাডিশান মেনেই উনি কাঠগড়ায় তুলেছেন বাজারের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ এবং সেই সংক্রান্ত সরকারি 'ভ্রান্ত' নীতিকে— যথা এনআরইজিএ প্রকল্প। ওনাদের অত্যন্ত প্রিয় চাহিদা-যোগানের নীতিকে ব্যবহার করে মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত ওনার ব্যাখ্যাটি হল এরকম— এনআরইজিএ-র সরকারি নীতিটিই ওনার মতে যত নষ্টের মূলে। এর দুরকম 'কুপ্রভাব' দেশের অর্থনীতির ওপর দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, এনআরইজিএ-র ফলে গ্রামের গরিব মানুষের কাছে প্রচুর টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ছে। এটা হল ডিমান্ড সাইড বা চাহিদাজনিত ব্যাখ্যা। আর দ্বিতীয়ত ওনার সাপ্লাই বা যোগান সংক্রান্ত ব্যাখ্যাটি আরও মজার। সেটি এরকম। এনআরইজিএ প্রকল্পের জন্য গ্রামের শ্রমিকদের একটি বৃহৎ অংশ খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে সরে আসছে আর এর ফলে শ্রমিকের অপ্রতুলতায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে গেছে। ওনার মতে মোদ্দা কথাটি হল এই যে- এনআরইজিএ-র ফলে একদিকে খাদ্যশস্যের যোগান কমছে আর অন্যদিকে গ্রামের বাজারে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ছে। আর এই দুই-এর সম্মিলিত পরিণতি স্বরূপ খাদ্যশস্যের বাজারে অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। তাই ওনার মতে চাহিদা-যোগানের অমোঘ নিয়মেই খাদ্যশস্যের এই আগুন দাম।

চাহিদা-যোগানের বেড়াজাল

এখানে প্রথমেই মুক্ত-বাজার অর্থনীতির প্রচারকারীদের অত্যন্ত 'আদরের' এই চাহিদা-যোগানের বধ্যভূমিতে ঢুকেই দেখে নেবো অধ্যাপক গুহর মতামতের সারবত্তা। আর তারপরে চাহিদা-যোগানের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের সাপেক্ষে এই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাটিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

অধ্যাপক গুহর ব্যাখ্যার সাপেক্ষে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে— যে

এনআরইজিএ— পুরো বছরের নয়, মাত্র ১০০ দিনের জন্যই কাজ দিতে পারে। এবার আইনের পাতা ছেড়ে বাস্তব চিত্রটির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে এনআরইজিএ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২-১৩ সালে অর্থাৎ গত বার্ষিক বর্ষে মাত্র গড়ে ৩৯ দিনের কাজ তৈরি হয়েছে। তার আগের বছরের হিসেবটি বলছে ২০১১-১২তে এনআরইজিএ প্রকল্পে মাত্র ২৯ দিনের কাজ তৈরি করা হয়েছিলো। এনআরইজিএ প্রকল্পের অসফল রূপায়ণের গল্প সুবিদিত। আর এখানে পরিসংখ্যান থেকেও দেখতে পাওয়া যায় যে কর্মসংস্থান তৈরির নিরিখে এর অবদান নগণ্য। এখন ডিমান্ড সাইড বা চাহিদাগত দিক থেকে প্রশ্নটি হচ্ছে যে, বছরে গড়ে ৩০-৪০ দিন কাজ দেওয়ার ফলে এমন কী পরিমাণ টাকা গ্রামের গরিবদের হাত গেল যার ফলে দেশব্যাপী খাদ্যশস্যের বাজারে আগুন লেগে গেল? তা এ তো গেল ওনার বক্তব্যের চাহিদাজনিত ব্যাখ্যার সমস্যা। এবার সাপ্লাই সংক্রান্ত বা যোগান সংক্রান্ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রশ্ন উঠবে যে এনআরইজিএ প্রকল্পের গড়ে ৩০-৪০ দিনের কর্মসংস্থানের ফলে কৃষিক্ষেত্রের শ্রমশক্তির কী এমন অপ্রতুলতা তৈরি হতে পারে যাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়? এক্ষেত্রে উল্লেখ্য অমর্ত্য সেনের 'ছদ্ম-বেকারত্ব' সংক্রান্ত গবেষণাটি। যেখানে উনি দেখিয়েছেন কীভাবে ভারত তথা বিভিন্ন অনুন্নত দেশের কৃষিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুর নিযুক্ত হয়ে আছেন, যারা আপাতভাবে কর্মে নিযুক্ত কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন এদের শূন্য বা তার কাছাকাছি। তাই 'ছদ্ম বেকারত্ব' কথাটি এসেছে, এবং এর ফলস্বরূপ কৃষির উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা পত্রে এই সত্য স্পষ্ট ভাবেই বারবার সামনে এসেছে যে ভারতীয় কৃষি অতিরিক্ত শ্রমিকের ভারে নুব্জ হয়ে আছে। অর্থাৎ গুহ সাহেব একটিও গবেষণা পত্রের উল্লেখ না করে অবলীলায় যে যুক্তির ডালি সাজিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে অজস্র ফাঁক-ফোঁকর। এমনকি দেখা যাচ্ছে যে ওনার সুপরিচিত চাহিদা-যোগানের বেড়াজালের মধ্যেও ওনার যুক্তিগুলি ধোপে টিকছে না। কষ্ট করে গ্রামে যাওয়ার দরকার নেই, ঠান্ডা ঘরে বসে থেকেও উনি যদি একটু এনআরইজিএ-র প্রয়োগ সংক্রান্ত তথ্যগুলি দেখতেন তাহলে এই বালখিল্য যুক্তি সাজাতেন না।

চাহিদা - যোগানের বেড়াজাল ভেঙে

আমার মতে চাহিদা-যোগানের নির্ধারিত সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে এসে ধনতন্ত্রের বিকাশের সাপেক্ষে যদি আমরা মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাটিকে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে সমস্যাটিতে অনেক বেশি আলোকপাত করা সম্ভব হবে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী অবাধ বিচরণের শুরুর সময় থেকেই আগের চেয়েও বেশি বেশি করে আক্রান্ত হতে থাকে কৃষি। বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের উৎপাদনের তথ্য থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে ১৯৮০ সালে বিশ্বব্যাপী গড় মাথাপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩৫৫ কিলোগ্রাম, যা ২০০০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৪৩ কিলোগ্রামে। অর্থাৎ গত তিন দশকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে বিশ্বব্যাপী মাথাপিছু গড় খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমেছে। ভারতবর্ষের দিকে তাকালেও প্রায় অনুরূপ চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে ২০০১-০২ এ মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ২১২.৯ মিলিয়ন টন। আর পরবর্তী পাঁচ বছরে মোট উৎপাদনের তথ্যগুলি হল যথাক্রমে ১৭৪.৮, ২১৩.২, ১৯৮.৪, ২০৮.৬ ও ২১৩ মিলিয়ন টন। এই তথ্যগুলি থেকে ভারতবর্ষেও খাদ্যশস্যের উৎপাদনের স্থিতাবস্থার চিত্রটি পরিষ্কার। পরবর্তী বছরগুলিতে সরকারি মতে উৎপাদন বাড়লেও মূল্যবৃদ্ধির আগুন নেভেনি। এর কারণ হল কৃষির প্রতি দীর্ঘকালীন অবজ্ঞা, নব্বইয়ের দশকের নিও-লিবারেল নীতির ফলস্বরূপ নব্বইয়ের দশকের গভীর কৃষিক সংকট, কৃষিকাজে সরকারি বিনিয়োগ ও সহায়তার ক্রমাবলুপ্তি ইত্যাদি। খাদ্যশস্যের উৎপাদনজনিত 'স্থিতাবস্থায়' (stagnation) বিভিন্ন ছোট-বড় কারণে মারাত্মক মূল্যবৃদ্ধির সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের কিছু কারণ হল— বুশ প্রশাসনের ভর্তুকি দিয়ে খাদ্যশস্যের ব্যবহার করে 'ইথানল' বা জৈব জ্বালানি (bio-fuel) তৈরি চেষ্টা, যার ফলে বিশ্ব-বাজারে ব্যাপক পরিমাণের খাদ্যশস্য জ্বালানি তৈরির কাজে চলে যায়। আর অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী কোটি -কোটি মানুষ ভুখা দিন কাটায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষেও ২০০১-০২ এ খাদ্যশস্য মজুত করে রাখার গুদামের অভাবে পচে যাচ্ছিল। তাই মাননীয় তদানীন্তন সরকার বাহাদুর সেই খাবার সস্তায় জাপানের পোলট্রির খাদ্য হিসেবে বেচে দেয়, যখন কিনা ভারতেই কয়েক কোটি লোক না খেয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। এছাড়াও মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা অবৈধ খাদ্যশস্যের মজুত করার চিরকালীন নীতি, খাদ্যশস্যের বাজারে নতুন শুরু হওয়া ফাটকাবাজি ইত্যাদিও। এই ধরনের এক সামগ্রিক উৎপাদন-জনিত স্থিতাবস্থায় (stagnation) এইসব কয়টি কারণেই চরম মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে।

সমাধানের খোঁজ?

১৯৭০ এর দশক থেকেই বিশ্বায়িত পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের কাল (যাকে অনেকে 'বিশ্বায়ন' ও বলে থাকেন) থেকেই ক্রমশ পিছু হঠতে থাকে কৃষি। পৃথিবীব্যাপী পুঁজির অভূতপূর্ব আগ্রাসনে কৃষিজমির অধিগ্রহণ মারাত্মক ভাবে বেড়ে যায়। 'প্রিমিটিভ অ্যাকুমুলেশান' বা 'অ্যাকুমুলেশান বাই ডিসপসেশানের' প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলির যথা ভারতের ব্যাপক মাত্রায় খাদ্যশস্যের জমির অধিগ্রহণ হতে থাকে শিল্প অথবা খাদ্যশস্যের জমির রূপান্তর ঘটানো হয় অর্থকরী ফসল রপ্তানির উদ্দেশ্যে। এরই সাথে নিও-লিবারেল নীতির জন্য কৃষিতে সরকারি

বিনিয়োগ কমে আসা, এছাড়াও মহাজন ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের বাড়বাড়ন্তের ফলে ছোট চাষিদের অবস্থা হয় অত্যন্ত শোচনীয়। ফলস্বরূপ মুক্ত-বাজার অর্থনীতির প্রয়োগের প্রথম দশকেই ভারতবর্ষে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন আড়াই লক্ষ কৃষক। নব্বইয়ের দশকে কৃষির বৃদ্ধি শতকরা ২ ভাগেরও নিচে নেমে যায় যা কিনা তদানীন্তন জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অপেক্ষাও কম ছিল। এই সবকিছুরই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো আজকের খাদ্যশস্যের এই সুস্থায়ী মূল্যবৃদ্ধি। যার কোন চটজলদি সমাধান সম্ভব নয়, যতদিন না ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে।

জার্মানির প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কথা দিয়ে এ লেখা শুরু করেছিলাম, শেষটাও করব সেই সূত্র ধরেই। ''সেই সময়ে একদিকে ছিল যুদ্ধের ভয়াবহ বর্বরতা আর একদিকে মুক্তির পথ হিসেবে সামনে এসেছিল সমাজতন্ত্র। আর আজ একদিকে আছে অগুনতি ভুখা পেট, অপরিসীম দারিদ্র্য আর একদিকে বিকল্প হিসেবে আছে সমাজতন্ত্র (প্রভাত পটনায়েক, ২০০৮)''।

তথ্যসূত্র

প্রভাত পাটনায়েক, ''ক্যাপিটালিসম অ্যান্ড কনটেম্পোরারি ইনফ্লেশান'', প্রগতি, ২০০৮

অলোক সঞ্জয় গুহ, ''স্টাং বাই অনিওন'', ''দি টেলিগ্রাফ, ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৩

অমর্ত্য সেনের বিভিন্ন লেখাপত্র

আম আদমি পার্টি : রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল শুদ্ধিকরণই দেশে বদলের উপায়!

মুনমুন

ভূমিকা

সামনে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন। পরপর দুটো ইউপিএ সরকারের শাসনকালে 'আম-আদমি'-র জন্য জনমোহিনী নীতির (১০০ দিনের কাজ ও খাদ্য সুরক্ষা বিল যার মোহনীয়তম সংযোজন) অভাব ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা তো আম-আদমি-র হাতে পৌঁছানোর আগেই হাওয়া! ইউপিএ সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন, রালেগান সিদ্ধি গ্রামের আম-আদমি আন্না হাজারে-র ডাকে দিল্লির যন্তর-মন্তর দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন তখন প্রচারের শিরোনামে। মন্ত্রী-আমলারা সরকারি প্রতিনিধি হয়ে পকেটে টাকা ভরবে রাশি রাশি! এ তো বিলিয়নিয়র শিল্পপতি বা তাদের স্বার্থে লালিত কর্পোরেট মিডিয়ার বা শিল্পপতিদের সরকারি কর ফাঁকি দেওয়া টাকায় পালিত 'জনকল্যাণকামী' কাজের প্রচারে আকাশ-বাতাস কাঁপানো এনজিও-নাইজড্ ব্যক্তি বা সংগঠন, কারো পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়! সকলেই ভিড় করে যন্তর মন্তরে, হাই-প্রোফাইল মানুষ। গাড়ি, ক্যামেরার ভিড়ে ব্রাত্য বোধহয় 'আম আদমি'-ই! মধ্যবিত্তের খবরের কাগজ কাঁপানো, উচ্চশিক্ষিতের নিউজ মিডিয়া মাতানো সেই আন্দোলনের পরিণতি যাই হোক না কেন, থেমে যায়নি 'আম আদমি' ঢাক।

২০১৩-র বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দিল্লিতে সরকার গঠনের ভূমিকায় নতুন দল 'আম আদমি পার্টি' (*আপ*) ও তার নবীন কাণ্ডারী অরবিন্দ কেজরিয়াল। প্রথমে *আপ*-এর ঝাড়ু বা নজরকাড়া ইস্তেহারকে পাত্তা না দিলেও, ক্ষমতায় আসার পর তাদের ভাবনাকে দৃষ্টান্তমূলক বলে ওজন ভারী করার খেলায় নেমেছে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী থেকে সংসদীয় বামদলগুলি সবাই। কর্পোরেট মিডিয়ার নরেন্দ্র মোদী ক্যাম্পেন চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে চোখ ধাঁধানো সাফল্য পেয়েও থমকে গেছে *আপ* সফর দেখে। নিঃসন্দেহে, *আপ*-এর 'ভিশন ডকুমেন্ট', নির্বাচনী ইস্তেহার বা অরবিন্দ কেজরিয়াল রচিত *স্বরাজ* নামের বই-এ ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির গতানুগতিকতার মাঝে রয়েছে 'বৈপ্লবিক' কিছু চমক। কিন্তু সেই চমক, *আপ*-দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে রাজনৈতিক-অর্থনীতিগত বোধশূন্যতা বা বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও তার ক্ষমতার বিন্যাস না বোঝাটাকে ঢাকতে অপারগ।

অতীত থেকে আজ : অরভিন্দ কেজরিয়াল

খড়গপুর আইআইটি-র প্রাক্তনী, পরবর্তীতে টাটা স্টিল-এ কর্পোরেট চাকরি, ১৯৯২-তে আইআরএস, আয়কর বিভাগের যুগ্ম কমিশনার অরভিন্দ কেজরিয়াল, ২০০০ সালে সরকারি পদ থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে হাত দেন 'পরিবর্তন'-নামের এনজিও তৈরির কাজে। এই এনজিও-র হাত ধরেই দিল্লি শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে কাজের সূত্রপাত। এই সময়েই আরটিআই আন্দোলনে অংশগ্রহণ। এরপর ২০০৬ সালে বরাবরের জন্য সরকারী চাকরিতে ইস্তফা। ২০১১-১২তে আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন। এরপরই দিল্লীর মসনদে *আপ*-এর উত্থান। আজ তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীদের জন্য অনাড়ম্বর জীবন, নিরাপত্তার বাড়াবাড়ি-তে আপত্তি তার আম-আদমি হিসেবে আইকন হয়ে ওটার অন্যতম কারণ। তার *স্বরাজ* বইয়ের শুরুতে বা 'ভিসন ডকুমেন্ট'-এ কেন এই পার্টি প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন, তখন সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন— 'আম আদমি'র জীবনে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে গেলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। অর্থাৎ সৎ সরকারি অফিসার হয়ে বা স্বেচ্ছাসেবী

সংস্থার মধ্যে দিয়ে সামাজিক কল্যাণের নামে তা সম্ভব নয়। কারণ, এর প্রতিনিধিরাই শোষণমূলক রাষ্ট্র-কাঠামোর অংশ। প্রয়োজন হল সেই রাষ্ট্র-কাঠামোর বদলের। সেই অর্থে মধ্যবিত্ত পরিবারের, সমাজের চোখে 'মেধাবী' ছাত্রের সমাজ-কল্যাণের স্বার্থে এই উপলব্ধিতে পৌঁছনো উৎসাহজনক।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই অরভিন্দ কেজরিয়াল-ই ২০০৬ সালের সংরক্ষণ বিরোধী (ইউথ ফর ইকুয়ালিটি) আন্দোলনের শরিক ছিলেন। ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম প্রথার মূল যে গভীরে প্রোথিত, তার প্রভাব সংক্রান্ত উপলব্ধির এই অভাব প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব, কারণ *আপ*-এর কর্মসূচিতেও বলা হয়েছে যে তারা জাত-বর্ণ ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধী। এখানে উল্লেখ করব যে এই আন্দোলনে মূলত উচ্চবর্ণের অর্থনৈতিক ভাবে অগ্রসর, মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং-ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার উচ্চবিত্তের প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল, যারা ভারতীয় সমাজ, তার ইতিহাস, অর্থনীতি, বেশিরভাগ মানুষের জীবন সম্পর্কে বিশেষ খবর রাখেন না (যদিও সেটা ঠিক তাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি)।

যাই হোক, প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে বলব, কেজরিয়ালের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত বোধহয় বিভিন্ন উন্নত কেন্দ্রীয় বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির রাজনৈতিক সচেতনতার জায়গা থেকে একেবারেই আনকোরা ছাত্রছাত্রীরা, আর বৃহত্তর অর্থে একাডেমিক জগতের এতদিন রাজনীতিতে নেহাৎ অনুৎসাহী ব্যক্তিরা। বিদেশের, বিশেষ করে আমেরিকার ক্যাম্পাসগুলিতে পাঠরত/কর্মরত এনআরআই-রাও কেজরিয়ালের ভূমিকায় অত্যন্ত উৎসাহী এবং তারা নানাভাবে তার সহায়তার কাজ করছেন নিবিড়ভাবে। *আপ*-এর উত্থানের সাথে নিঃসন্দেহে এটা বড় পাওয়া। খড়গপুর আইআইটি-র ছাত্রছাত্রীরা তো অনেকেই ভবিষ্যতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে মানুষের জন্য কাজ করার সংকল্পও করছেন। এই বড় অংশের ছাত্র-যুবারা রাজনৈতিকভাবে তুলনায় সচেতন হয়ে উঠছেন। দিল্লী বিধানসভায় ক্ষমতায় আসার পর অবশ্য পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে। এনজিও অ্যাক্টিভিস্ট থেকে শুরু করে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, মল্লিকা সারাভাই থেকে মেধা পটেকার, অনেকেই *আপ*-এর সম্ভাবনায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন। কিন্তু এখানেই ঘনীভূত হচ্ছে একটা আশঙ্কা। এই উৎসাহ ধরে রাখা বা প্রকৃতভাবে সমাজ বদলে কাজে লাগাতে পারার ভবিষ্যত সম্ভাবনা কতটুকু!

আম আদমি পার্টি— পথ চলার দৃষ্টিভঙ্গি

আপ-এর দৃষ্টিভঙ্গি মেলে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'ভিশন ডকুমেন্ট'-এ। আসা যাক সরাসরি সেই প্রসঙ্গে। এই ডকুমেন্টের শুরুতেই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশটি তুলে ধরে বলা হয়েছে : স্বাধীন ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য 'গণতন্ত্র', 'সামাজিক ন্যায়বিচার', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সার্বভৌমত্ব'-এর ভিত্তিতে সমাজ গঠনই হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন ছিল, যা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ, তাদের মতে, ভারতবর্ষ শাসনের ঔপনিবেশিক কাঠামোকে বদলানো হয়নি। বদল বলতে কেবল ব্রিটিশ শাসকের জায়গায় দেশীয় শাসক দায়িত্ব নিয়েছে। বদলযোগ্য কাঠামোটি তাহলে কী? *আপ*-এর মতে দেশের আইন-প্রণয়ন ও কার্যনির্বাহী (legislative and executive) ব্যবস্থার মধ্যে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র বা সরাসরি মতামত দেওয়ার সুযোগের অভাব রয়েছে। বদল হিসেবে তাই তারা কার্যনির্বাহী ক্ষমতাকে সরাসরি গ্রামসভা বা মহল্লসভা-র মতো অঞ্চলভিত্তিক জনগণের সাধারণ সভার হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলছেন। পার্লামেন্ট বা বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই থাকবে আইন-প্রনয়ণ ব্যবস্থা, কিন্তু জনগণের রায়কে প্রাধান্য দিতে, আইন বদল বা নির্মূলের অধিকার ("referendum") বা সরাসরি আইন প্রণয়নে জনউদ্যোগ ("direct initiatives") ব্যবস্থা রূপায়ণের কথা বলছেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকাকে জনগণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'right to reject', 'right to recall'-এর কথা বলছেন এবং গোটা প্রক্রিয়াটি সুপরিচালনার জন্য অস্ত্র হিসেবে থাকছে তথ্যের অধিকার আইন আর দুর্নীতির মূল উপড়ানোর দায়িত্বে থাকছে 'লোকপাল'। অর্থাৎ, *আপ* বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোর বড় রকমের আমলাতান্ত্রিক পরিবর্তন আনার কথা বলছেন। যার প্রয়োগ হলে নিঃসন্দেহে বর্তমান আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর তুলনায় বহুগুণে গণতান্ত্রিক এক রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি হবে (মূল অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো বদল না করেও)। আর এইখানেই আম আদমি পার্টি-র সবচেয়ে 'বিপ্লবিক' পরিবর্তন প্রস্তাবের দিক, এবং যুক্তিবাদী এক অংশের মানুষের কাছে 'পরিবর্তনপন্থী' হিসেবে আর এর গ্রহণযোগ্যতার দিকও বটে। কিন্তু পার্লামেন্ট, বিধানসভা, রাজ্যসভার মতো কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে টিকিয়ে রেখেই তারা সমান ক্ষমতার একটা সমান্তরাল বিকেন্দ্রীভূত কাঠামো প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। এর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কি তারা যথেষ্ট ভেবে দেখেছেন? ইতিমধ্যে কাশ্মীর প্রসঙ্গে তাদের এই প্রস্তাব বড়রকম বাস্তব ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছে, কোন রকমে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ধুয়ো দিয়ে কাশ্মীরের মানুষের বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিকে গিলে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন তারা।

ভারতের বিচার-ব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে অত নির্দিষ্টতায় কিছু না বললেও, বিচার-ব্যবস্থার কেন্দ্রীভূত কাঠামোকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, সাধারণ মানুষ টাকার জন্য বিচার পায় না, কেন্দ্রীয় বিচারালয়ে পৌঁছানোও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ন্যায়বিচার মানুষের অধিকার আর

অন্যায়ের বিচার হওয়া উচিত এলাকা-ভিত্তিক বা গ্রাম-ভিত্তিক ভাবে, একথা তারা বলেছেন। বিচারব্যবস্থার আমূল বদলের ডাকও তারা দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, *আপ* কি এখানে জন প্রতিনিধিত্বমূলক, বিকেন্দ্রীভূত ন্যায়বিচার ব্যবস্থার কথা বলছেন? আবার সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার বিপক্ষেও কোন সওয়াল করেনি।

আসা যাক অর্থনৈতিক 'ভিশন'-এর প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে যেটা স্পষ্ট যে রাষ্ট্র পরিচালনার সরকারি ব্যবস্থাপনা (governmentality) সম্পর্কে *আপ* বা তার 'ভিশন ডকুমেন্ট' যতটাই নির্দিষ্ট (concrete), অর্থনৈতিক প্রশ্নে তত্ত্বগত ও পরিকল্পনাগত শূন্যতায় ততটাই আক্রান্ত, মোটের ওপর *আপ*-র দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে সততা বা স্বচ্ছতার সমস্যা। আর্থিক বৈষম্যের ভিত্তি তাদের মতে, কিছু ব্যক্তির অসৎ উপায়ে সঞ্চিত সীমাহীন সম্পদ। তাদের অর্থনৈতিক নীতি খুব সরল, যা কিনা দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ও সৎ (genuine) ব্যক্তিদের বিকাশের পক্ষে। *আপ*-র পক্ষ থেকে বর্তমান ভারতবর্ষে নয়া উদারনৈতিক সঞ্চয়ন নীতির বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকার লড়াই-এর পাশে থাকার অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ, বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণের বিরোধী (মুখে যদিও সমস্ত সংসদীয় দলই বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণের বিরোধী)। ভারত সরকারের কৃষিনীতি-তে যে আড়াই লক্ষের ওপর কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে, সে সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল। তাদের আশা, ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত হলে এ সমস্যার নিরসন হবে। স্বামীনাথন রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষকরা ব্যয়ের ওপরে শতকরা ৫০ ভাগ লাভ করতে পারবেন। মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করবে *আপ*? তাদের মতে, মৌলিক কিছু পণ্যের দাম ঠিক করতে হবে জনগণের মতামত নিয়েই। কিন্তু কীভাবে? এ প্রশ্নে আপাতত তাদের অবস্থান সুস্পষ্ট নয়, যদিও তারা বাজার অর্থনীতির মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে মোটেই বিরোধিতা করছেন না বলেও জানিয়েছেন। তারা নীতিগতভাবে 'ঠিকা প্রথা'-র বিরোধী, কিন্তু কীভাবে ভারতবর্ষের ৯২ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্র ও সংগঠিত ক্ষেত্রেও বহুলভাবে প্রচলিত লাভজনক পুঁজিবাদী ঠিকা-প্রথার নিরসন তারা করবেন, সে উত্তর বিশ বাঁও জলে। কী হবে সরকারি কর্মসংস্থান নীতি আর বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মুনাফার লক্ষে কর্মসংস্থান নীতির আত্মসম্পর্ক? অন্যদিকে সর্বশক্তি নিয়ে এনআরইজিএ-র মতো সরকারি কর্মসংস্থান নীতির সমালোচনায় নেমেছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শিবিরের একাংশ, মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে তারা দেখাচ্ছেন মজুরি বৃদ্ধি। মজুরি ও মুনাফার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে ভেবে ওঠার সুযোগ সম্ভবত তারা এখনো পাননি।

আপ তার সার্বিক বাচনে, সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান নীতির পক্ষে সওয়াল করেছে, যদিও এই সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের, এসব ক্ষেত্র থেকে মুনাফা লোটার জন্য বেসরকারি অনুপ্রবেশ-এর বিরোধিতা করেনি।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে *আপ*-এর বক্তব্যের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, সংরক্ষণ ব্যবস্থার বৃহত্তর প্রয়োগের স্বার্থে তারা সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধী। ভারতবর্ষের সব ধরনের (জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে) বঞ্চিত মানুষকে তারা 'অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ' বর্গের অন্তর্ভুক্ত করছে। এদের শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সবরকম সুযোগের ব্যবস্থা যেহেতু তারা করবে, তাই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন থাকবে না। *আপ*-ভাবনার অ-ঐতিহাসিকতা এখানে সর্বোচ্চ রূপ পায়। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজে বর্ণভেদ প্রথা অতি প্রাচীন। তার গভীর প্রভাব হিসেবে মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে আজো চরম শোষণমূলক বিভেদ-কাঠামোর টিকে থাকা-কে *আপ* এক কথায় উপেক্ষা করে গেছে। একই যুক্তি কাঠামোয় তারা কি বাসে-ট্রামে মেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষণ বা ট্রেনে মহিলা কামরারও বিরোধিতা করবে? *আপ*-এর এই অবস্থানে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ তাদের গোটা সমাজ বদলের ভাবনার মধ্যে ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা, উৎপাদনসম্পর্ক ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা রাজনৈতিক কাঠামো সংক্রান্ত বোঝাপড়ার অভাব বোধ হচ্ছে। কিছু সামাজিক সমস্যাকে ঐতিহাসিক নিরবিচ্ছিন্নতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে হঠাৎই তারা যেন আবিষ্কার করে ফেলেছেন এবং তা সমাধানের পথ বাতলে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে ময়দানে নেমেছেন। এক্ষেত্রে তাদের 'সৎ-সরল' প্রচেষ্টাকে বাহবা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বদলের আশা নেহাৎ ক্ষীণ।

ভিশন ডকুমেন্ট সংক্রান্ত আলোচনা আরো দীর্ঘায়িত করা যায়। যেমন সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্নে আপ-এর বক্তব্যও সহজ-সরল, ভালো ভালো কথায় ভরা। সাম্প্রদায়িকতা টিকিয়ে রাখায় ক্ষমতাশীল বা শোষক শ্রেণীর স্বার্থের দিক, বা অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিভেদের মিথোজীবিতার রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে তারা আদৌ ভাবিত নয়। বৈদেশিক নীতি, বা বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষার নানা দিক বনাম ভারত রাষ্ট্রের অবস্থান নিয়ে এখনো *আপ* খাপ খোলেনি।

আপ-ভাবনার বিশ্লেষণ— কিছু প্রশ্ন

১। *আপ* জনপ্রতিনিধিদের আম-আদমির মতো জীবনযাপন *আপ*-চমকের সবচেয়ে পপুলার দিক। তারা জোরেসোরে ঘোষণা করেছে যে কোন *আপ* জনপ্রতিনিধি গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার করবে না, কোন বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবহার করবে না। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাই তো হওয়ার কথা ছিল! এখানে উল্লেখযোগ্য বিশ্বের প্রথম শ্রমজীবী মানুষ পরিচালিত রাষ্ট্র প্যারি

কমিউনের কথা। ১৮৭১ সালে রাষ্ট্রীয় শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমজীবী মানুষের তৈরি করা এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের (যাকে মাত্র ৭২ দিন টিকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল) প্রথম প্রস্তাবনাই ছিল: সমস্ত কমিউনের সদস্য, পরিচালক হিসেবে ভূমিকারত ব্যক্তি এবং চার্চের প্রতিনিধি, সকলের বেতন হবে সর্বোচ্চ ৬০০০ ফ্রাঙ্ক, যা একজন শ্রমিকের মজুরির কাছাকাছি। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর ডিক্রি জারি হয়েছিল: সকল কর্মরত ব্যক্তির বেতন হবে একজন প্রশিক্ষিত শ্রমিকের বেতনের সমান। সমাজে খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির স্বার্থে পরিচালিত যে কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাপন না করলে, তাদের সমস্যাই বা বুঝবেন কী করে? আর শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই বা কেন, প্রধান বিচারালয়ের প্রতিনিধি, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রতিনিধিরা— সকলেরই জীবনযাপনের প্রশ্নে সমতা আসা উচিত, কারণ একজন সাধারণ শ্রমিকও যেমন সমাজের কাজ করছে, এরাও তাই করছে। এই বিভিন্ন ভূমিকাগুলিকে মাঝেমধ্যে অদলবদল করলেও হয়। দেশের প্রেসিডেন্টের অতিরিক্ত খরচা-সাপেক্ষ পদটি তো এখনি তুলে দেওয়া উচিত। *আপ* কি জীবনযাপনের প্রশ্নে সেই ধরনের বৈষম্যহীনতার কথাই বলছে? নাকি, লালবাতির অ-ব্যবহারকেই পুরো নম্বর দিতে হবে!

২। *আপ* প্রস্তাবিত জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বডি হবে জনগণের সাধারণ সভা। এখন আমাদের সমাজ শ্রেণী-বিভাজিত। তাদের শ্রেণী-স্বার্থও পরস্পরবিরোধী, একজন বড় চাষি ও তার জমিতে কর্মরত খেতমজুররের স্বার্থ একে অপরের বিরোধী। তারা একই গ্রামসভার সদস্য হলে কীভাবে রক্ষিত হবে উভয়েরই স্বার্থ! গোটা ভারত জুড়ে যে নয়া উদারনৈতিক উন্নয়ন ভাবনার আগ্রাসন চলছে; তাতে চাষির জমি যাচ্ছে, গ্রাম-কে-গ্রাম উচ্ছেদ হচ্ছে, বহু মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে তাদের জীবন ও জীবিকার ন্যূনতম অধিকার থেকে, কিন্তু উচ্ছেদ হওয়া জমিতে যে বৃহৎ শিল্প বা মাল্টি-কমপ্লেক্স হচ্ছে তাতে চাকরি হচ্ছে বা তার সুফলের ভাগিদার হচ্ছে কিছু মানুষ। সরকারি জমিতে প্রাইভেট নার্সিংহোম হলে তার উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় একদল মধ্যবিত্ত মানুষকে চিকিৎসার জন্য আর বিদেশ পাড়ি দিতে হয় না। অর্থাৎ এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণী-স্বার্থকে কি সাধারণ সভার মতো আনুভূমিক (horizontal) সিদ্ধান্ত-গ্রহণ কাঠামোর মধ্যে দিয়ে মীমাংসা করা সত্যিই সম্ভব হবে? নয়া উদারনৈতিক উন্নয়ন নীতির সুবিধাভোগী (কিছুটা হলেও) মধ্যবিত্ত ভোটারদেরই বা কীভাবে সামলাবে *আপ*?

৩। কেবল শ্রেণীস্বার্থই নয়, মুখোমুখি হতে পারে ঐতিহাসিকভাবে সমাজে টিকে থাকা আধিপত্য কাঠামোও। যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ভিত্তিক আধিপত্য কাঠামো। গ্রামসভার মধ্য দিয়ে কি কোনরকম সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়াই সকল অবদমিত নিম্নবর্গের মানুষের সমান অংশগ্রহণ সম্ভব? উদাহরণস্বরূপ খাপ পঞ্চায়েতের কথাই ধরা যাক। আপাতভাবে বিকেন্দ্রীভূত, জনগণের অংশগ্রহণমূলক এই কাঠামোর প্রতিক্রিয়াশীলতার সাথে কীভাবে আপস করবে *আপ*?

৪। *আপ*-এর 'নৈতিকতা'-র প্রসঙ্গ : ভিশন ডকুমেন্ট বা 'স্বরাজ'-ভাবনার ছত্রে ছত্রে রয়েছে 'সৎ', 'স্বচ্ছ', 'নীতিনিষ্ঠ', মানুষের পক্ষে সমাজ চালানোর কথা। যেমন *আপ*-এর অর্থনৈতিক নীতির শুরুর কথাই হলো, বর্তমান অর্থনৈতিক নীতি অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে। যা কিনা হওয়া উচিত 'সৎ' ছোট-বড় ব্যবসায়ী, শিল্প ও কৃষি শ্রমিকদের পক্ষে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'সততা' বা 'নৈতিকতা'-র ধারণা কি স্থান, কাল অর্থনৈতিক অবস্থান (শ্রেণী অবস্থান) নিরপেক্ষ? দেশের রাজার 'নৈতিকতা' আর একজন সাধারণ প্রজার 'নৈতিকতা' কি একই হবে, যদি না মৌলিক ভাবে রাজা আর প্রজার আধিপত্যমূলক সম্পর্কের বিরোধিতা করি! এই দুই 'নৈতিকতা' কি পরস্পর-বিরোধী হতে পারে না? নাকি রাজা যতই সৎ ভালোমানুষ হোক না কেন, রাজ্যপাট চালাতে হলে তার প্রজার সমস্ত দুঃখদুর্দশা দেখলে চলবে না। সৎ ব্যবসায়ীও চাইবে বেশি বেশি মুনাফা করতে, তাই শ্রমিকের মজুরিও একই হারে বাড়ানো সম্ভব হবে না তার পক্ষে! একটি বুর্জোয়া সমাজের নৈতিকতার মধ্যেই পড়ে সঞ্চিত পুঁজিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা। একদল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিরাট পরিমাণ পুঁজির যে পাহাড় জমে আছে, তার দখল পাওয়া ব্যতীত ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এই আধিপত্যকে কিভাবে ক্ষমতাচ্যুত করবে 'স্বরাজ'? পুঁজির এই সঞ্চয়নের ইতিহাসই হল পুরনো 'নৈতিকতা'-কে পদদলিত করে পুঁজির 'নৈতিকতা' প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এখন ভেবে দেখুন 'পুঁজি' নামক এই বিরাট সম্পদের প্রকৃত উৎস দুই : এক, প্রকৃতির সম্পদ আর দুই, মানুষের শ্রম। এই দুটি কারো একার বা মুষ্টিমেয় কয়েক লোকের সম্পত্তি নয়, বরং সমাজের। তাহলে সমাজের সব মানুষের প্রয়োজন সেটা দখল করা কি *আপ*-এর 'নৈতিকতা'-র মধ্যে পড়বে না।

আপ-উত্থানের নেপথ্যে

১৯৭০-এর দশক থেকেই কেইনসীয় অর্থনীতি অনুসারী রাষ্ট্র-কাঠামোর সুরক্ষামূলক ভূমিকার প্রতিস্থাপনে বিশ্বজুড়ে একটু একটু করে মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে নয়া উদারনীতিবাদ। রাষ্ট্রকাঠামোর সুরক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব পুঁজির জন্য উন্মুক্ত ক্ষেত্র তৈরিতে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও জনমানসে আস্থা হারাতে শুরু করেছে। এই অনাস্থাকে আধার দিতে বিশ্ব পুঁজিবাদের তত্ত্বাবধানেই গোটা বিশ্ব জুড়ে ক্রিয়াশীল হয়েছে এনজিও নেটওয়ার্ক। ৯০-এর দশকে ভারতবর্ষে মুক্ত অর্থনীতির সাথে সাথেই বিকশিত হতে থাকে এই নেটওয়ার্ক। যেমন ১৯৯৬

সালে ভারতে ক্রিয়াশীল মোট এনজিও-র সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। বর্তমানে এই সংখ্যা বহুগুণ বেশি। নব্য শিক্ষিত প্রজন্মের একটা বড় অংশের রাজনৈতিক সচেতনতাকে বি-রাজনীতিকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে এই নানান ধরনের এনজিও-গুলি, এদের কেউ 'social welfarist' কেউ বা 'grass-root activist', কেউ বা আবার নেহাৎই 'charitable'। এদের গালভরা ব্যাখ্যা হয়েছে non profitable agencies বা স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা। দেশি-বিদেশি পুঁজির টাকায় চলা এইসব সংস্থারা মানুষের প্রতিবাদ স্পৃহাকেও মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নে পৌঁছানোর আগেই সফলভাবে অ-রাজনীতির গন্ডিজালে বেধে ফেলেছে। *আপ*-এর উত্থানের পেছনেও আছে এই অ-রাজনীতির গণ্ডি। আসলে এই অ-রাজনীতির আধারে মৌলিক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশ্নের বদলে তাই *আপ* ভাবনায় অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে 'স্বচ্ছতা'র দাবি। স্বচ্ছতার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, তবে রাজনীতিকে বাদ দিয়ে শুধু 'সততা', 'স্বচ্ছতা' বেশি দূর যেতে পারে না।

বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদ স্থায়ী ধরনের সংকটে। শুধু তাই নয়, এই সংকট মোকাবিলার যে যে উপায় তারা বাতলেছে, তা ছোট-বড় নানা ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে বিশ্ব জুড়েই। এমত অবস্থায় সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে আস্থা হারাচ্ছে সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষ, পুঁজির স্বার্থে চলা সরকারি পরিচালনা আর মানুষকে প্রয়োজনীয় রিলিফটুকুও দিতে পারছে না। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র-কাঠামো যত মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণীর হস্তগত হয়েছে, তার দুর্নীতিগ্রস্ততা সীমাহীন হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ততার কারণে সংসদীয় রাজনীতি যত তার জমি হারাচ্ছে, তাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈধতা ক্ষয় পাচ্ছে। তাই স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র কাঠামো বানাতে আন্তর্জাতিকভাবেই পুঁজিবাদ তৎপর হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃত্বে দুর্নীতি-বিরোধী উদ্যোগ নির্দিষ্ট রূপ পাচ্ছে ২০০৫ সাল থেকেই। 'United Nations Convention against Corruption (UNCAC)' সারা পৃথিবীর মতো ভারতেও লাগু হয়েছে। সংকট মোকাবিলার উপায় হিসেবেই আগামী দিনেও পুঁজিবাদ এমন যে সব নীতি নিতে বাধ্য হবে, তা ব্যাপক সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। আপাত দুর্নীতি বিরোধী একটা স্বচ্ছ রাষ্ট্রকাঠামো বানানো ও তা চালানো তাই অত্যন্ত জরুরি। *আপ*-এর কর্মসূচিতে এই প্রয়োজনীয়তাই বাস্তবে রূপ পেয়েছে। আর ভারতের দেশীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস-বিজেপির মতো পুরনো দলগুলির দীর্ঘদিন চলা, নানা সময়ে গজিয়ে ওঠা আঞ্চলিক দলগুলির বিকাশ ও অধঃপতনে অভ্যস্ততা যে শূন্যতা তৈরি করেছে, তারই খাপে নতুনের বার্তা *আপ*।

শেষ করার আগে শুধু বলব, ইতিহাসে পুঁজিবাদ তার নিজের প্রয়োজনে রাষ্ট্র-কাঠামোকে কখনো দৃঢ় করেছে (পুঁজিকে সুরক্ষা দেওয়ার কাজে) কখনো বা শিথিল করেছে (মুক্ত বাজারের বিকাশের স্বার্থে)। তবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামো তার সর্বাধিক বৈধতা পেয়েছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সময়ই। তাই আপাত নিরপেক্ষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত পরিচয় আসলে পুঁজির শাসনযন্ত্র। তাই পুঁজিকে ক্ষমতাচ্যুত করার বদলে রাষ্ট্রকাঠামোর শুদ্ধিকরণের কথা বলা মানেই বর্তমান ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও জনমানসে আরো বৈধ করে তোলার অভিপ্রায়। শুধু তাই নয়, সমস্যার মূল অক্ষত রেখে রোগ নিরাময়ের নতুন প্রচেষ্টা সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর মানুষের বিশ্বাস আরো কিছুদিন টিকিয়ে রাখারই উদ্যোগ।

দেবযানী উপাখ্যান : ভারত-মার্কিন সংঘাত

সুদীপ্ত সেন

গত ১২ ডিসেম্বর মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি কনসাল-জেনারেল দেবযানী খোবরাগাড়ে (সিং)-এর গ্রেপ্তার এবং পুলিশে হেপাজতে তার হেনস্থার সংবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে এদেশের সংবাদ-মাধ্যমগুলি, ভারতের পক্ষ থেকে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়, ভারতে নিযুক্ত মার্কিন কূটনীতিবিদদের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তা যথেষ্ট সংকুচিত করা হয়, এমনকি নয়া-দিল্লীর মার্কিন দূতাবাসের সামনে থেকে নিরাপত্তা বলয়ও (Security cordon) সাময়িক ভাবে প্রত্যাহার করা হয়। এরপর মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেননকে ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর ভারতের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় দেবযানীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে এবং মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু এরপরই বেঁকে বসে ওয়াশিংটন। তাদের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, মামলা প্রত্যাহারের কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং ক্ষমা চাওয়ারও কোন কারণ নেই। তাদের বক্তব্য, দেবযানীর বিরুদ্ধে পরিচারিকাকে কম বেতন দেবার এবং ভিসার আবেদন-পত্রে তথ্যের কারচুপি করার অভিযোগ রয়েছে, কাজেই তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। এর পরই সুর নরম করতে আরম্ভ করে নয়াদিল্লী। যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সলমন খুরশিদ প্রথমে বলেছিলেন যে দেবযানীকে দেশে ফিরিয়ে আনানোর দায়িত্ব তাঁর এবং ঐ কাজে সফল না হলে তিনি আর সংসদে প্রবেশ করবেন না, তিনি এর পরে অবস্থান পরিবর্তন করে বলেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই এই

সমস্যায় সমাধান করতে হবে এবং সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এর জন্য যাতে কোনভাবেই ভারত-মার্কিন 'সুসম্পর্ক' নষ্ট না হয়। শেষ পর্যন্ত দেবযানীকে রাষ্ট্রসঙেঘর স্থায়ী মিশনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যাতে ঐ মুহূর্তে তাঁকে গ্রেপ্তার করা না যায় এবং এর ফলে মামলা চলাকালীন দেবযানী খোবরাগাড়েকে ব্যক্তিগত হাজির থাকারও প্রয়োজন হবে না। যখন এই প্রতিবেদন লিখতে বসেছি তখন পর্যন্ত শেষ খবর হল রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে সমস্ত কাগজপত্র মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তারা তা খতিয়ে দেখছেন; তাই দেবযানী এখনও তার নতুন পরিচয় পত্র পাননি, কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী ভারতীয় মিশনে স্থানান্তরিত হলেও দেবযানীর 'অপরাধ' যেহেতু তার আগেই সংঘটিত হয়েছিল সেজন্য তার বিরুদ্ধে মামলা চলতেই থাকবে এবং অপরাধী প্রমাণিত হলে তার ১৫ বছর পর্যন্ত হাজতবাস হতে পারে।

যে কোন অভিযোগের ক্ষেত্রেই সর্বাগ্রে প্রয়োজন দু'পক্ষের বক্তব্য খতিয়ে দেখা। মার্কিন আইনজীবী প্রীত ভারারা জানিয়েছেন যে দেবযানী তার পরিচারিকা সঙ্গীতা রিচার্ডসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন-অনুযায়ী সর্বনিম্ন মজুরির তুলনায় অনেক কম বেতন দিতেন এবং তাকে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার থেকে অনেক বেশী সময় খাটানো হত। দেবযানীর তরফ থেকে অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে তাকে কখনই বেশি সময় খাটানো হতো না, বরং সে ছুটির দিনে কাজ করতে চাইলেও তিনি তাতে রাজি হতেন না কারণ তা মার্কিন আইন লঙ্ঘনের সামিল হতো (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২০শে ডিসেম্বর; *আজকাল*, ২৩শে ডিসেম্বর ২০১৩)। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সঙ্গীতা রিচার্ডসের যে চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে কিন্তু সঙ্গীতা জানিয়েছেন যে দেবযানী তার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছেন, অতএব তার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের বা তাকে বেশি সময় কাজ করানোর যে অভিযোগ দেবযানীর বিরুদ্ধে উঠেছে তা কতখানি সত্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। এদিকে দেবযানীর বাবা উত্তম খোবরাগাড়ে আবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে সঙ্গীতা রিচার্ডস সিআইএ-র চরও হতে পারে। তাঁর এ জাতীয় মন্তব্যের কারণ হলো যে ২৩শে জুন সঙ্গীতা হঠাৎ দেবযানীর বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলে দেবযানী যখন থানায় সেকথা জানান তখন নিকট-আত্মীয় ছাড়া আর কারুর পক্ষে নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত ডায়েরি (Missing-Diary) করা সম্ভব নয় বলে তাকে সে ডায়েরি করতে দেওয়া হয়নি। এরপর সঙ্গীতা, হঠাৎই নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি অফিসে হাজির হন ৮ই জুলাই। সেখানে গিয়ে তিনি সাধারণ ভারতীয় পাসপোর্ট দাবি করেন (তাঁর কাছে আগে কেবলমাত্র কূটনৈতিক পাসপোর্ট ছিল)। একথা জানতে পেরে ভারত তার পাসপোর্ট বাতিল করে। ওইদিনই দেবযানীর স্বামী, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক আকাশ সিং, সঙ্গীতার বিরুদ্ধে চুরি করার অভিযোগ এনে পুলিশের কাছে যান। অবশ্য কী কী জিনিস চুরি হয়েছে তার তালিকা তিনি দিতে পারেন নি (*The Telegraph*, Orissa Edition, 23.12.2013)।

অবশ্য এসবের পরও আমাদের পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে দেবযানী সম্পূর্ণ নির্দোষ, বিশেষত আমরা যখন ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। কিন্তু এ ব্যাপারে মার্কিন-প্রভুদের যেরকম উদ্ধত আচরণ করতে দেখা গিয়েছে তার বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যেভাবে কোনরকম কূটনৈতিক শিষ্টাচার না মেনে দেবযানীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্ধত এবং অমানবিক আচরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেবযানী এবং তার আইনজীবীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, গত ১২ই ডিসেম্বর দেবযানী যখন তাঁর মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যান তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্যে হাতকড়া পরানো হয়। তারপর পুলিশি হেফাজতে আনার পর দেবযানীকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা করা হয় এবং তাঁর শারীরিক তল্লাশি করা হয়। শুধু তাই নয়, চোরাচালানকারী বা ড্রাগ পাচারকারীদের মত তার গহ্বর-তল্লাশি (Cavity-Search) করা হয় অর্থাৎ গোপনাঙ্গেও আলো ফেলে বা হাত দিয়ে তল্লাশি করা হয়। এ অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে ম্যানহাটনের মার্কিন আইনজীবী প্রীত ভারারা বলেন দেবযানীর সঙ্গে নাকি কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়নি। তাকে মেয়ের সামনে গ্রেপ্তার করা হয়নি। গহ্বর-তল্লাশির কথা অস্বীকার করলেও দেবযানীকে যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করা হয়েছিল এবং তার শরীর তল্লাশি করা হয়েছিল সেকথা স্বীকার করতে কিন্তু তিনি বাধ্য হয়েছেন। এবিষয়ে তার বক্তব্য, এরকম তল্লাশি নাকি সমস্ত বন্দিদের ক্ষেত্রেই করা হয় যাতে তাদের শরীরে এমন কিছু না থাকে যা তার নিজের বা অন্য কোন বন্দিদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। কিন্তু দেবযানীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তো ভিসা-সংক্রান্ত তথ্যের কারচুপি এবং পরিচারিকাকে কম বেতন দেওয়া ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাধ্য করার অভিযোগে। সেক্ষেত্রে এই ভারতীয় মহিলা কূটনীতিককে কেন পুলিশি হেফাজতে এনে সম্পূর্ণ বিবসনা করার প্রয়োজন হলো সে প্রশ্নের জবাব কিন্তু তার কাছ থেকে মেলেনি। ভারারা আবার একথা জানাতেও ভোলেননি যে দেবযানীর শরীর তল্লাশির কাজটি করানো হয়েছিল একজন মহিলা-আধিকারিককে দিয়ে (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২০.১২.২১৩)—যেন পুরুষ আধিকারিকরাও একাজ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

হোয়াইট হাউসের এই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বাঙ্গালোরের খ্যাতনামা সাংবাদিক সুনীল রাজগুরু। দেবযানী প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে

মার্কিন সরকারের একাধিক সচিব এবং আইনজীবীরা মন্তব্য করেছেন যে ভারতকে মেনে নিতে হবে যে দেবযানী বে-আইনি কাজের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন, কাজেই তার বিচার হবেই। সহকারী কনসাল-জেনারেল হিসেবে তাকে সমস্ত রকম সুবিধা দেওয়া হবে এটা হতে পারে না। ভাল কথা, আমাদেরও বক্তব্য দেবযানীর বিরুদ্ধে পরিচারিকা নিগ্রহের অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই তাঁকে শাস্তি পেতে হবে, কিন্তু তার জন্য তাঁর সঙ্গে যে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে তা কি মেনে নেওয়া যায়? তাছাড়া এক্ষেত্রে আরও একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। যে হোয়াইট হাউস আজ ভারতীয় কূটনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, বিদেশে তাদের নাগরিকদের (যারা সব ক্ষেত্রে কূটনৈতিক নন) অভব্য এবং উদ্ধত আচরণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কী হয়। সাম্প্রতিক দু'একটি ঘটনার কথা তা'হলে উল্লেখ করা যাক।

১) যেমন ডেভিস পাকিস্তানের একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। তিনি একজন প্রাক্তন সৈনিক, কূটনীতিবিদ নন। ২০১১ সালের ২৭ এপ্রিল ডেভিস তার পিস্তল দিয়ে দুজন মানুষকে খুন করেন। ঘটনাস্থল লাহোর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে তাকে তখন সমস্ত রকম সহায়তা দেওয়া হয় এবং তাকে পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন তার কাছ থেকে একাধিক পরিচয়পত্র (Identity Card) পাওয়া যায় এবং তার ক্যামেরার ফটোগুলো থেকে সন্দেহ হয় যে তিনি একজন গুপ্তচরও হতে পারেন। এ অবস্থায় মার্কিন সরকার তার জন্য সম্পূর্ণ কূটনৈতিক সুরক্ষা দাবি করে এবং পাকিস্তানে যাতে তার বিচার না হয় তার জন্য সচেষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত পাক সরকার মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং জনমত উপেক্ষা করে ২৪ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

২) এবারের ঘটনাস্থল কেনিয়া। সেখানে এক নিম্নস্তরের মার্কিন কূটনীতিবিদ যোশুয়া ওয়ালদে কয়েকমাস আগে বেপরোয়া ভাবে তার গাড়ী চালিয়ে একটি বাসের গায়ে ধাক্কা মারেন এবং এই ঘটনায় এক ব্যক্তি মারা যান এবং ৮ জন আহত হন। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং তার এই মৃত্যু পরিবারটিকে চরম আর্থিক সংকটের সামনে দাঁড় করায়।

এক্ষেত্রে মার্কিন-প্রভুদের ভূমিকা কী ছিল? তারা ওয়ালদে এবং তার পরিবারকে দেশে নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, কূটনৈতিক সুরক্ষার দোহাই দিয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতেও অস্বীকার করেন।

যে দুটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কেউই দেবযানী খোবরাগাড়ের স্তরের কূটনৈতিক ছিলেন না, কিন্তু তাদের রক্ষা করার জন্য সমস্তরকম চেষ্টা করেছিল হোয়াইট হাউস, অর্থাৎ মার্কিন নাগরিকরা দেশের সীমানার বাইরে গুপ্তচরবৃত্তি, খুন বা যে অপরাধই করুক না কেন তাদের সে কাজের অধিকার আছে কিন্তু অ-মার্কিন নাগরিকদের কোন কিছুরই অধিকার নেই। ভিসার আবেদন পত্রে কারচুপি করার অভিযোগ ভারতীয় মহিলা কূটনীতিবিদকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে গিয়ে তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দেহ তল্লাশি করা এবং ড্রাগ-পাচারকারী এবং যৌন কর্মীদের সঙ্গে একই কুঠুরিতে থাকতে বাধ্য করার মধ্যেও অশিষ্টাচারের কোন নিদর্শন নেই। সুনীল রাজগুরু তাই যথার্থই বলেছেন: মার্কিনদের খুন করার অধিকার আছে, কিন্তু অন্য কারুর পরিচারিকাকে কম বেতন দেবার অধিকার নেই (We can Murder, yŏu can't under-pay : US – Sunil Rajguru, sify.com, Dec 20, 2013)।

অবশ্য মার্কিন-প্রভুদের এ ধরনের আচরণ নতুন কিছু নয়। বিগত বিংশ শতাব্দীর '৬০ এবং '৭০-এর দশকে যখন ইন্দোচীনে মার্কিন তাণ্ডবলীলা চলছিল তখন একদল স্তাবক জোর গলায় বলতেন : মেকং-এর অববাহিকায় মার্কিন সৈন্যরা লড়ছে এশিয়ার মুক্তির জন্য। সেই ব্যক্তিদের উত্তরসূরীরা আজও বর্তমান, তাদের কথা বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই জাতীয় দ্বিচারিতা এবং ভণ্ডামির কথা সকলেরই জানা আছে। কাজেই এই সাম্রাজ্যবাদী দস্যুকুলের আচার-আচরণ নিয়ে নতুন কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই, বরং বলা যেতে পারে তাদের পক্ষে এ জাতীয় আচরণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মার্কিন প্রভুদের এ জাতীয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে সমর্থ হওয়ার পেছনে কি এদেশের শাসক-গোষ্ঠীর কোন ভূমিকা নেই? এই প্রশ্নের উত্তরটির অবশ্যই ইতিবাচক। দশ বছর ধরে দিল্লীতে ক্ষমতাসীন ইউপিএ সরকারের মার্কিন তোষণ নীতিই যে ওয়াশিংটনের এজাতীয় দৌরাত্ম্যে মদত দিয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মার্কিন মুলুকে বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাও নতুন কিছু নয়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালামকে যখন নিউইয়র্কের বিমানবন্দরে জুতা এবং কোট খুলে তল্লাশি করা হয়েছিল তখন তো প্রতীকী দুঃখ প্রকাশ করেই অব্যাহতি পেয়েছিল হোয়াইট হাউস। নয়াদিল্লী এনিয়ে আর কোনরকম উচ্চবাচ্য করে নি। ম্যানহাটনের ভারতীয় কূটনীতিবিদ অভিজিৎ বিশ্বাসের মেয়ে কৃত্তিকাকে তার স্কুল থেকে হাতকড়া পরিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এক শিক্ষিকাকে অশালীন এসএমএস করার অভিযোগে। পরে সেই অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় এবং জানা যায় কাজটি একজন চীনা ছাত্রের। মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ায় পর কৃত্তিকাকে চরম নিগ্রহের সামনে পড়তে হয়েছিল এবং তার নিজের অভিযোগ অনুযায়ী পুলিশি হেপাজতে থাকার সময় তাকে বাথরুমেও যেতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু মজার কথা হলো যে চীনা ছাত্রটিকে পুলিশি হেফাজতে যেতে হয়নি। পুলিশ

অফিসারদের যুক্তিটি ছিল বড়ই চমৎকার! চীনা ছাত্রটি দোষ স্বীকার করে কিন্তু কৃত্তিকা তা করেনি বলেই তাকে হেনস্তা হতে হয়। কিন্তু অপরাধ না করা সত্ত্বেও কেন কৃত্তিকাকে তা স্বীকার করতে হবে তা কিন্তু মার্কিন-পুলিশের পক্ষে বলা সম্ভব হয়নি। আসল কথা, হোয়াইট হাউসের পান্ডাদের চীনা ছাত্রটিকে নিগ্রহ করার পরিণাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল। তারা ভাল করেই বুঝেছিলেন, একাজ করলে বড় ধরনের কূটনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হত। চীন এক্ষেত্রে কিছুতেই ছেড়ে কথা বলত না। পিকিং-এর শাসকদের যত দোষই থাকুক তারা যে নয়া-দিল্লীর শাসককুলের মত মেরুদণ্ডহীন নন সেকথা হোয়াইট-হাউসের বেশ ভাল করেই জানা ছিল।

সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটি ঘটেছিল মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র নিযুক্ত তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মীরা শঙ্করণের ক্ষেত্রে। শ্রীমতী শঙ্করণ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমান বন্দরে তাঁর সমস্ত পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও তাঁকে তল্লাশি করা হয়। এবিষয়ে মার্কিন-কর্তাদের প্রশ্ন করা হলে উত্তর আসে, শ্রীমতী শঙ্করণ শাড়ী পরেছিলেন বলে তাকে তল্লাশি করা হয়। অর্থাৎ হোয়াইট হাউসের সাম্রাজ্যবাদীদের বক্তব্য, শাড়ী পরা মহিলারা (আরও স্পষ্ট করে বললে ভারতীয় উপমহাদেশের মহিলারা) সন্ত্রাসবাদী হতেই পারে কিন্তু যে মহিলারা পশ্চিমি পোষাকে সজ্জিত থাকেন তারা এবিষয়ে সমস্তরকম সন্দেহের উর্ধ্বে। মার্কিন প্রভুদের এই আচরণ প্রমাণ করে যে জাতিগত বিদ্বেষের (Racial hatred) এ ব্যাপারে তারা অ্যাডলফ হিটলারকেও বোধ হয় কয়েক ধাপ পেছনে ফেলে দিয়েছেন। হিটলারের জাতি-ঘৃণার শিকার হয়েছিলেন শুধুমাত্র ইহুদিরা কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে এই ঘৃণার শিকার পৃথিবীর একটি জনবহুল উপমহাদেশের সমস্ত নাগরিক। কিন্তু এই জাতীয় মন্তব্যের পরেও নয়া-দিল্লীর তরফ থেকে কোন জোরালো প্রতিবাদ জানানো হয়নি। ব্রাজিলের সমাজতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রপতি কিছু দিন আগে তাদের নাগরিকদের হেনস্তা করার প্রতিবাদে তার মার্কিন সফর বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইউপিএ সরকারের কাছ থেকে এরকম সাহসী পদক্ষেপ আশা করা নিছকই নির্বুদ্ধিতা।

এবার যে তারা দেবযানী-নিগ্রহের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারও কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। প্রথম কারণটি অবশ্যই আসন্ন ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতির কারণে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউপিএ-র বর্তমান অবস্থা খুবই সঙ্গীন। এই অবস্থায় এই দেবযানী-নিগ্রহ কাণ্ড তাদের হাতে একটি অতি শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিয়েছে। এই ঘটনার সূত্র ধরে কিছুটা মার্কিন-বিরোধী ভূমিকা নিতে পারলে তাদের মলিন ভাবমূর্তি যে খানিকটা উজ্জ্বল হতে পারে সে কথা বুঝতে পেরেই তারা এবার গোড়ার দিকে বেশ কঠোর অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে সলমান খুরশিদ বলেছিলেন যে যতক্ষণ না দেবযানী সুবিচার পাচ্ছেন ততক্ষণ তিনি সংসদে প্রবেশ করবেন না। পরে অবশ্য মার্কিন-প্রভুদের অনমনীয়তার কারণে তিনি সুর বেশ খানিকটা নরম করতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া এ সম্পর্কে আরও একটি কথা জানা গিয়েছে। খবরে প্রকাশ, দেবযানীর বাবা উত্তম খোবরাগাড়ের সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়েছে এবং এবার তিনি কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্যসভায় প্রবেশ করতে পারেন (Six Devyani Conspiracy Theories, Sunil Rajguru, Sify.com, Dec 24, 2013)। এ খবরের সত্যতা নিয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতেই পারেন, কিন্তু ঘটনা হলো ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের আদর্শ-আবাসন কেলেঙ্কারিতে দেবযানীর নামও জড়িয়ে গিয়েছে, এবং সেখানে সরকারি কোটায় তিনি যে ফ্ল্যাট পেয়েছেন সেটি তাঁর প্রাপ্য নয় বলে জানিয়েছে বিচারবিভাগীয় প্যানেল; কারণ সরকারি কোটায় তিনি আগে অন্য একটি ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন (*আজকাল*, ২৩.১২.২০১৩)। অন্যদিকে এ বিষয়ে আর একটি মতামত হলো যে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশোধ নেবার মনোবৃত্তির থেকে এই কাজ করেছে। একজন সমকামী মার্কিন কূটনীতিবিদের সঙ্গীকে ভারত গোড়ায় ভিসা দিতে না চাওয়ায় এবং গত ১২ অক্টোবর মার্কিন কোম্পানি Advan-Fort এর মালিকানাধীন একটি জাহাজকে ভারতের বন্দর সুরক্ষা কর্মীরা ভারতীয় জলসীমায় অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ আটক করায় ক্ষুব্ধ মার্কিন-কর্তৃপক্ষ দেবযানীর বিষয়ে এই মনোভাব নিয়েছে। (সুনীল রাজগুরুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ এবং Devyani Case : Unequal Strategic Partnership with the US – R S N Singh, sify.com, December 25, 2013)। জাহাজটিতে নানা ধরনের অস্ত্র ছিল এবং জাহাজের কর্মচারী এবং যাত্রীরা ছিলেন বিভিন্ন দেশের অধিবাসী। তাদের সবাইকেই (মোট ৩৫ জন) বে-আইনিভাবে অস্ত্র বহন করায় অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

আর একটি তত্ত্ব হল দেবযানীর পরিচারিকা সঙ্গীতা রিচার্ডস নিয়ে। সঙ্গীতা মার্কিন-গোয়েন্দা সংস্থা CIA (Central Intelligence Agency)-র চর বলে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এটা অবশ্য চরম বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার এক অবসরপ্রাপ্ত সদস্য অমরভূষণের মতামত প্রণিধান-যোগ্য। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, একজন সহকারী কনসাল জেনারেলের বাসস্থানে চর পাঠানোর মতো কাজ সিআইএ কখনই করবে না, কারণ সেখান থেকে সেরকম কোন গুপ্ত তথ্য পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। প্রয়োজন হলে কোন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকেই টাকা দিয়ে বশ করে একাজ করবে তারা। (অমরভূষণের সাক্ষাৎকার, Rediffmail.com ডিসেম্বর ২৪, ২০১৩)। তবে যে কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে সঙ্গীতাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা

ব্যবহার করেছে। গত ১০ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ দেবযানীকে গ্রেপ্তারের মাত্র দু'দিন আগে সঙ্গীতার স্বামী ফিলিপ এবং তার দুই সন্তানকে বিশেষ ভিসা (টি-ভিসা) এবং যাতায়াতের সমস্ত খরচ দিয়ে ভারত থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ কাজের সাফাই গাইতে গিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল প্রীত ভারারা বলেছেন সঙ্গীতার পরিবারকে নিরাপত্তা দিতেই তাদের এ কাজ করতে হয়েছে, ভারতে নাকি তারা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন। এ জাতীয় উদ্ধত মন্তব্য করা বা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার তাকে কে দিয়েছে তা একমাত্র মার্কিন কর্তারাই জানেন। দেবযানীর ব্যাপারে তারা এত কড়া অবস্থান নিয়েছেন কিন্তু ১৯৮২ সালে যখন একজন সৌদি রাজপুত্র এক মিশরীয় মহিলাকে জোর করে আটকে রাখার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তখন কিন্তু তাকে কূটনৈতিক সুরক্ষা দিয়েই বাঁচিয়ে দেন মার্কিন কর্তৃপক্ষ (*আজকাল*, ২২.১২.২০১৩)। দেবযানীর ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অন্যরকম কেন? ভারতের শাসক-গোষ্ঠী এখনও সৌদি-আরবের রাজপরিবারের মত তাদের অতটা আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারেন নি বলেই কি তাদের এই অবস্থান?

বস্তুত, হোয়াইট-হাউসের পান্ডাদের সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, তবে নিবন্ধটি শেষ করার আগে সুনীল রাজগুরুর আর একটি মন্তব্যের কথা উল্লেখ করব। ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আসল সত্যটা হলো ভারত আর আমেরিকার তথাকথিত এই বন্ধুত্ব অর্থহীন, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই এই বন্ধুত্বের মর্যাদা দেবে না। তারা তাদের মতোই চলবে এবং তাদের বা তাদের কূটনীতিবিদদের বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়েও ভারত কিছুই লাভ করতে পারবে না। কাজেই আমাদেরও একই কাজ করতে হবে। আমাদের বিদেশ নীতিতে মার্কিন তোয়াজের পথ পরিহার করতে হবে এবং এমন সব দেশকেই বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে যারা এর মর্যাদা দেবেন এবং তার ফলে ভারতেরও লাভ হবে (Bitter Truth: India US ain't friends, Sunil Rajguru, Sify.com, Dec 24 2013), এ সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে পড়ছে কিংবদন্তী দাবাড়ু প্রয়াত ববি ফিশারের এক অবস্মরণীয় মন্তব্য: দুনিয়ার মানুষের জন্য যদি কিছু করতে চাও তাহলে সকলের আগে হোয়াইট হাউসের ভণ্ডদের কবরে পাঠাও।

সংযোজন : এই নিবন্ধটি ডাকে দেবার ঠিক আগে দেবযানী উপাখ্যান সংক্রান্ত একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গিয়েছে, যা এখানে বলা প্রয়োজন। দেবযানীর আইনজীবী ড্যানিয়েল আর্শাক দাবী করেছেন, দেবযানী নিগ্রহের মূলে রয়েছে এক মার্কিন অফিসারের মারাত্মক ভুল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সুরক্ষা দপ্তরের এক এজেন্ট মার্ক স্মিথ ভিসার ডিএস-১৬০ ফর্মে উল্লেখ করা ৪৫০০ ডলারকে সঙ্গীতার প্রত্যাশিত বেতন বলে মনে করেছিলেন কিন্তু সেটা আসলে ছিল দেবযানীরই ন্যূনতম বেতনের পরিমাণ। ওখানে বলা হয়েছিল দেবযানীকে নূন্যতম ৪৫০০ ডলার আয় করতে হবে যাতে তিনি সঙ্গীতাকে প্রতি মাসে ১৫৬০ ডলার দিতে পারেন। কিন্তু স্মিথ ভুল করে সঙ্গীতাকে তার প্রাপ্য বেতন ৪৫০০ ডলার থেকে কম বেতন দেওয়া হচ্ছে— এমন অভিযোগ এনে তা পাঠিয়ে দেন ফেডারেল প্রসিকিউটার প্রীত ভারারার অফিসে। ওই অফিসেও কেউ এই ভুলটা লক্ষ্য করেননি এবং তার ফলেই ভারারা দেবযানীকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন। ভারারা-র অফিস থেকে এখনও আর্শাকের বক্তব্য নিয়ে কোন কিছু বলা হয় নি। অন্যদিকে আর্শাক বলেছেন, ওরা কী বলবে, এটা তো মারাত্মক ভুল (*আজকাল*, ২৬.১২.২০১৩)।

আর্শাকের অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে যে মার্কিন অফিসারদের মারাত্মক ভুলের ফলেই ভারতীয় মহিলা কূটনীতিবিদ দেবযানী খোবরাগাড়েকে গ্রেপ্তারি এবং পুলিশের হেফাজতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় শারীরিক তল্লাশির সম্মুখীন হতে হল। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নবনিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জয়শঙ্করণও দেবযানীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করায় আবেদন জানিয়েছেন। এখন এটাই দেখার যে শেষ পর্যন্ত মার্কিন-কর্তৃপক্ষ নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন কিনা এবং তারা সে কাজ না করলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষই বা কী ব্যবস্থা নেন।

১০.১.২০১৪

একটি দাঙ্গার রাজনীতি বা রাজনীতির জন্য যে দাঙ্গা হয়েছে

তড়িৎ চৌধুরী

উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরের অমানবিক ও নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর চারটি মাস কেটে গেছে কিন্তু দাঙ্গার বীভৎসতা কাটেনি। রাজ্য সরকার দাঙ্গার ক্ষতকে নিরাময়ের জন্য যতটা না সচেষ্ট ততোধিক সচেষ্ট সরকারি ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য উৎসব অনুষ্ঠান সুযোগসুবিধা বিতরণ জাতীয় কার্যকলাপের সাফল্যে! এরাজ্যের মত যেহেতু উত্তরপ্রদেশের রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সার্ধশতবর্ষ পালনের বৎসরব্যাপী মহোৎসবের মধ্যে জনগণের অর্থ শ্রাদ্ধের সুযোগ ছিল না সে কারণে অখিলেশ সরকার তার নিজের দেশগাঁও সাইফাইতে মহোৎসব পালন করল। অবশ্য লাগে টাকা দেবে জনগণ সেন!

তাই না অখিলেশ যাদব মুখ্যমন্ত্রী, বাবা মুলায়ম সিং দুর্নীতির অভিযোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদ দখল না করায়, মাত্র ৪৬ বার সরকারি বিমানে তার দেশগাঁও সাইফাই ভ্রমণ করল মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ২১ মাসে, আর তার কাকা শিবপাল যাদব, পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগীয় মন্ত্রী, গেছেন মাত্র ৫১ বার ঐ দেশগাঁও সাইফাইতে। উচ্চপদস্থ আমলাদের কথা তো বাদই দিলাম। কিন্তু কুজনেরা বলতে শুরু করল যে মুখ্যমন্ত্রী মশাই দাঙ্গাপীড়িতদের শরণার্থী শিবিরগুলি না দেখতে গিয়ে গাঁওয়ের মহোৎসবে যাচ্ছেন দাঙ্গাপীড়িত হাজার হাজার মানুষকে উপেক্ষা করতে বা দায়িত্বহীন মুখ্যমন্ত্রীত্ব প্রমাণ করতে! এই গণতন্ত্রপ্রিয় উচ্চবর্গীয় গোষ্ঠী পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সবই হতে পারে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়েই। ফলত অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী দল ২০১২ বিধানসভার নির্বাচনে মুসলিম জনগণের সমর্থন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে রাজ্যশাসনের লাগাম হাতে পাবার পর সরকারি উচ্চপদ কিছু সংখ্যালঘুদের হাতে দিয়ে তাদেরই একজন হয়ে যাবার ভান করলেও থেকে যায় সুবিধাভোগী হিন্দুদের একনিষ্ঠ সেবক দল! তাই প্রবল ঠান্ডায় কাঁপা উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গাপীড়িতদের রিলিফ ক্যাম্পগুলিতে সংখ্যালঘুদের আতঙ্কময় মুখগুলির দিকে তাকিয়ে সরকারি সাহায্যের ভাণ্ডার নিয়ে যান না কোনো মন্ত্রীমশাই। সরকারি তথ্যমতে, গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্পে মৃত শিশুর সংখ্যা ৩৪। বেসরকারি হিসাবে ৪০। প্রবল শীতে পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র, খাবার, পানীয় জল, ওষুধ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা কিছুই নেই ক্যাম্প বাসিন্দাদের জন্য, আছে ক্যাম্প তুলে নেবার, বন্ধ করে দেবার সরকারি আদেশ-হুমকি। রিলিফ ক্যাম্পের জন্য রেশন ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়েছে দ্বিতীয় মাসেই। একই সঙ্গে পুলিশি নিরাপত্তাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রয়োজন নেই বলে। এদিকে ক্যাম্পবাসী দাঙ্গাপীড়িত মুসলিমরা কেউই আর নিজের গ্রামে ফিরতে চাইছে না দুষ্কৃতীকারীদের বেপরোয়া অত্যাচার আক্রমণ থেকে বাঁচতে!

২০ ডিসেম্বর টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী "মুজাফ্ফর নগরের লই ক্যাম্পে মানুষের জীবন খুব সস্তা! গত এক সপ্তাহে ১১জন শিশু মারা গেছে এই ক্যাম্পের বিভিন্ন তাঁবুতে, ৭৪ জন গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে ২৪ জন আছে প্রসবকালীন অবস্থার মধ্যে, তারা ভুগছে চর্মরোগ, অপুষ্টি, খাদ্যাভাবে। শিশুগুলির বেশিরভাগেরই কোন শীতবস্ত্র নেই, খালিপায়ে ঘুরছে তারা। ৮৫ জন কিশোরীর বিয়ে দিয়েছে তাদের বাবা মা বাধ্য হয়ে। ক্যাম্পে সম্মান রাখা দায়।"

এই অবস্থার পাশাপাশি সরকারি ঘোষণা, ক্যাম্পগুলো বন্ধ করে গ্রামে ফিরে যাও সবাই। কেন না রিলিফ ক্যাম্প থাকলেই সরকারের অসম্মান, সরকারের অপদার্থতা, সরকারের মুখে কালি পড়া। তাই যেভাবেই হোক শিবির বন্ধ করো। তাই সংখ্যালঘুদের নির্বাচিত সরকার দাঙ্গাপীড়িত আতঙ্কিত সংখ্যালঘু শিবির বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বর মাসেই সরকারি জমি দখল করে ত্রাণশিবির বানানোর অভিযোগ তুলে এফআইআর করেছিল। মুজাফ্ফরনগরের লই রিলিফ ক্যাম্পের বাসিন্দাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবার পর সামলী জেলার ক্যাম্পগুলি ফাঁকা করার জন্য পুলিশ চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এমনকি বনদপ্তর থেকে ২৭০টি ক্যাম্পে থাকা পরিবারের কাছে নোটিশ পাঠানো হয় যে তারা বনদপ্তরের জমি দখল করে বনের গাছের ক্ষতি করছে। এরই মাঝে ক্যাম্প বাসিন্দারা শত বঞ্চনার মধ্যে দিন এবং হিমেল রাত কাটালেও ক্যাম্পগুলিকে সতর্ক প্রহরায় রেখেছে যাতে এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে মানুষখেকো দুর্বৃত্তদের হাতে না পড়তে হয়। কেন না ক্যাম্পে আছে দুর্ভাগ্যপীড়িত অত্যাচারিতদের দল, যাদের বেঁচে থাকার বিশ্বাসটুকু ছাড়া হারাবার কিছুই নেই! কংগ্রেস সহ-সভাপতি ক্যাম্পের বাসিন্দাদের দেখলেও যা হবে আবার প্রধানমন্ত্রী দেখলেও কোনও অবস্থার উন্নতি হবে না। কেন না সেই যুব সহ-সভাপতি আবিষ্কার করেছিল ক্যাম্পে নাকি আইএসআই-এর লোকজনের যোগাযোগ আছে আর এই রাজনীতির হাওয়া ধরতে নেমে পড়েন শ্রীনরেন্দ্র মোদী, তিনি আবার ঐ উক্তির সারবত্তা খুঁজতে বলেন যাতে সংখ্যালঘুদের সহানুভূতি দেখানো যায়।

বলাই বাহুল্য, অখিলেশজী পড়েছেন মহা ফাঁপড়ে। কেননা ক্যাম্পে শিশুমৃত্যু নিয়ে লোকসভায় হইচই হবে, আবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এলো "কমিটি বানাও, শিশু মৃত্যুর সঠিক তথ্য দাও।" কমিটি তৈরি করা হল এবং সেই কমিটিরই হিসেব অনুযায়ী ৩৪টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৭ সেপ্টেম্বরের পর থেকে। তবে ক্যাম্পগুলিতে রিলিফব্যবস্থা, ডাক্তারি সুবিধা খুবই ভাল! গণতন্ত্র কাকে বলে! তাই সরকারি দলেরই মন্ত্রী নারদ রাই ১১ জানুয়ারি তার বিজ্ঞ মতামতে জানান যে শিশুমৃত্যু সব জায়গায় হয়, এমনকি রাজপ্রাসাদেও হয়। এই মতামতে সংবাদমাধ্যমে ঝড় উঠলেও কার কী এসে যায়। কেন না হাজার হাজার মানুষ অমানবিক অবস্থায় ক্যাম্পে থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী তো ক্যাম্পের দশা দেখতে আসেননি, এদিকে তাঁর দলের ২০ জন এমএলএ-দের পাঁচটি দেশে সরকারি পয়সায় শিক্ষা-ভ্রমণে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি সাফাই গেয়েছেন। কিন্তু এতসব বৃত্তান্ত লেখার পরও যে প্রশ্নটি থেকে যায় তা হলো কেন সমাজবাদী দলের সরকার রাজ্যের সংখালঘুদের পুরো সমর্থন নিয়ে রাজ্য দখল করলেও হঠাৎই সংখ্যালঘু নিপীড়ক কম্যুনাল-ফাসিস্টদের সহায়ক হয়ে উঠল। কারণ লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে, আর কংগ্রেস এখন সমাজবাদী দল থেকে দূরত্বে গিয়ে সরকারি দলের শত্রু 'চামার কি বেটি' মায়াবতীর হাত ধরেছে, আবার প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বপ্ন দেখা নরেন্দ্র মোদী, যাকে সুপ্রিম কোর্ট

'আধুনিক নীরো'' আখ্যা দিয়েছে, তিনি দাঁড়াচ্ছেন লখনৌ থেকে! একই সাথে মুলায়ম সিং 'লখনৌ' জনসভায় আবেদন জানিয়েছেন, তিনিও তো প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন! ভাবুন দেশের নির্বাচন কাদের নিয়ে, কাদের জন্য!

এই পশ্চাদপটে বোঝা দরকার একটি দলের চরিত্র, যে কিনা গণতান্ত্রিক কাঠামোয় তৈরি এই মহান দেশের একটি রাজ্যে রাজধর্ম পালনের অঙ্গীকার নিয়েছে পাঁচ বছরের জন্য। এর থেকে আমরা ধারণা পাবো সংসদীয় গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থায় কারা থাকে বা কারাই বা জননীতি তৈরি করবে, প্রয়োগ করবে আগামী লোকসভা নির্বাচনের পর।

প্রথমত জানা দরকার যে উত্তরপ্রদেশের ইতিহাস স্বাধীনতার পর থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনায় রক্তমাখা। আলিগড়ে ১৯৭৮ ও ২০০৬, মোরাদাবাদে ১৯৮০, মিরাটে ১৯৮৭, আগ্রায় ১৯৯০ সালে দাঙ্গাগুলি ঘটলেও ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা ও সম্প্রতি মুজাফ্ফরনগরে ঘটে যাওয়া রক্তমাখা দাঙ্গার দিনগুলি বৈশিষ্ট্যময়। এই দাঙ্গাগুলির পিছনে সরাসরি রাজনৈতিক দলের মদত ছিল, যা আগেকার দাঙ্গাগুলির মধ্যে ছিল না। বিশেষত ভারতীয় জনতা পার্টি ১৯৮০ সালের পর থেকেই হিন্দু-ভারতের ছবি রাজনীতির মুখ্য লড়াইয়ের অস্ত্র করে। আগেকার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতির সুর ভুলে গিয়ে তারা 'এক ধর্ম এক দেশ' 'হিন্দুস্থান আর হিন্দু এক' এই শ্লোগান নির্ভর করে ক্ষমতায় আসার রণকৌশল ঠিক করে। তখন বাজপেয়ীর দল কখনো কেন্দ্রে থাকলে তাদের পূর্ণ সমর্থনেই ভারতীয় জনতা পার্টি, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রামসেবক সব সমার্থক হয়ে ওঠে। ফলে বাজপেয়ীর উন্নতি ও সংস্কারের ডাক থাকলেও উত্তরপ্রদেশের মুসলমান নাগরিকরা পিস্ পার্টি ও রাষ্ট্রীয় উলেমা কাউন্সিল নামে দুটি ছোট দলের ছত্রছায়ায় আসে। কংগ্রেস ও ভাজপা-র শক্তিহীনতার সাথে সাথেই ঐ রাজ্যে ২০০০ সালে দুটি পার্টি, সমাজবাদী দল ও বহুজন সমাজ দলের লড়াই হয় এবং নিম্নবর্গীয় ও মুসলমানদের সমর্থনে তৈরি হয় মায়াবতী সরকার।

অতি দ্রুত সম্পদশালী হয়ে ওঠার অংক মায়াবতী এই সরকারে থাকাকালীন করেছিল এবং একই সাথে উত্তরপ্রদেশে বহুজনের (নিম্নবর্গীয় দলিত, চামার, ভাঙ্গি) সুযোগ সুবিধা দেবার পথ খুলেছিল। অবশেষে ভাজপা মায়াবতীর উপর সমর্থন তুলে নেবার পর মুলায়ম সিং ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ২০১২ সালে রাজ্যে বিপুলভাবে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শুরু হয় মেরুকরণের রাজনীতি। অখিলেশের মুখ্যমন্ত্রীত্বের ১০ মাসের মধ্যেই ১০৪টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে যায় যদিও অখিলেশের মন্ত্রীসভায় মুসলমান প্রতিনিধি আছেন, আছেন স্বাস্থ্য দপ্তরে, আছেন সংখ্যালঘু ও উন্নয়ন দপ্তরেও। এমনকি রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি ও ডিজিপি মুসলিম হলেও দাঙ্গা ঘটতে থাকে। যদিও ভাজপা-র সমর্থনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 'চৌরাসী-কোসী যাত্রা' করার উদ্যোগ নিলে পুরো উদ্যোগটি আটকে দেয় রাজ্য সরকার। এই যাত্রাটি ৬টি জেলার মুসলিম বাসিন্দাদের ৬০০টি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবে, এই ছিল লক্ষ্য, যাতে হিন্দুধর্মীয় চেতনাকে আবারো দাঙ্গামুখী করা যায়। কেননা সামনে ২০১৪-র মহাযজ্ঞ! এভাবেই মুসলিম সমর্থন সমাজবাদী পার্টির পকেটে থাকলেও শেষটায় মুজফ্ফরনগরের ছোট্ট ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক দাবানল তৈরির সুযোগ পেয়ে যায় ভাজপা। জাঠ সম্প্রদায়ের দুজন যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনার ব্যাপক প্রচার করে তারা। ভিডিও ক্লিপিং প্রচারের দায়ে ভাজপা-র এমএলএ-কে গ্রেপ্তার করা হলেও দাঙ্গার পরিণতি হয় ভয়াবহ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মারা যায় বেসরকারি হিসাবে ৬০ জন, এবং নিজের গ্রাম ছেড়ে আসতে হয় ৭০,০০০ জনকে, যাদের মধ্যে মুসলিমই বেশি। এরা মূলত নিরাপত্তার আশায় সরকারি শিবিরে আশ্রয় নেয়। কেননা ইতিমধ্যে ৫৬৬টি খুন, দাঙ্গা ও ধর্ষণের কেসে ৬০০০ জনের নাম নথিভুক্ত হলেও ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র ২৯৪ জন। একজন বহুজন পার্টির এমপি-কে ঘৃণা ও হিংসা বিষয়ক বক্তৃতা দেবার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মূলত পুলিশি প্রশাসনেরই নিষ্ক্রিয়তার জন্য যেমন দাঙ্গা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে তেমনই কয়েকজন ভাজপা এমএলএ-দের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল চার্জ থাকলেও জামিন দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক দুর্বলতায়। একদিকে দাঙ্গাপীড়িতদের জন্য সুব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকার যেমন ঔদাসীন্য দেখিয়েছে তেমনই প্রতিপদক্ষেপে তাদের উপর অমানবিক আচরণ করেছে সমাজবাদী পার্টির সরকার। বর্ণহিন্দু ও জাঠ ভোটব্যাংক হারানোর আশঙ্কায় অখিলেশ সরকার সংখ্যালঘু ক্যাম্পবাসীদের নিয়ে ঘেটো বনিয়ে দেখাতে চেয়েছে যে তাঁরাও 'হিন্দু দেবতা' প্রচারক নরেন্দ্র মোদীর মতই আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভোটের খেলায় যেভাবেই হোক হিন্দু সমর্থন পেতে চায়। তার আগে বিনি পয়সায় ল্যাপটপ বিলি, বিনি পয়সায় মোবাইল বিলি এবং এমএলএ-দের নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ, তার আগে নিজের গ্রাম সাইফাই-এর জন্য ৩৩৪ কোটি টাকার বিভিন্ন পরিকল্পনা মঞ্জুর ইত্যাদি তো আছেই।

এতদ্‌সত্ত্বেও লাভবান হচ্ছে বহুজন পার্টি, কেননা তারা লোকসভা নির্বাচনের জন্য বেশির ভাগ পদপ্রার্থী করছে মুসলিমদের। এদিকে জাঠ-ভোট পাচ্ছেই মোদীর 'হিন্দুদেবতা'র আহ্বান। যে মোদীর মুখ উজ্জ্বল করেছে রাজ্যসরকার নিয়োজিত 'নানাবতী কমিশন'। যে কমিশন তৈরি হয়েছিল ২০০২ সালে গুজরাটে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন ধরানোর ৫৯ জন করসেবকের মৃত্যুর পর। যে কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের জন্য ১৮ বার নির্দিষ্ট সময় বাড়িয়েছিল। গত ডিসেম্বরে আরেকবার সময়

বাড়াতে পেরেছে এই কমিশন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশের আগেই মোদীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ হিসাবে ঘোষণা করেছেন প্রাক্তন বিচারপতি নানাবতী। অবশ্য এর আগেই মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করেছে ভাজপা।

সুতরাং স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৬৫ বছর পরও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নোংরা খেলা সংসদীয় দলগুলি চালাচ্ছে নিরন্তর। তাতে হাসেম আলি বা রামা কৈবর্তের লাভ কিছু হোক না হোক গদিতে বসাটাই যখন মূল লক্ষ্য। দেশবাসীর রক্তঘামের বিনিময়ে তৈরি ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত এভাবেই মহান হয়ে থাকুক বিশ্বমাঝে, এটাই গণতন্ত্রের সেবকদের মূল স্বপ্ন।

এভাবে স্বাধীনতার আগে থেকেই ব্রিটিশ-সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিভাজন ধীরে ধীরে দাঙ্গায় পরিণত হয়েছে রাজনীতির মদতে আর ক্ষমতার গদিতে বসার তাগিদেই সংসদীয় দলগুলি দাঙ্গা বাধানোয় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। সারা ভারতবর্ষের সব রাজ্যে এই খেলা চলছে। ভারতবাসী কি এই খেলাতেই সামিল হবে, নাকি কোনো বিকল্প ভাববে!

লুমটেক্স জুটমিলে শ্রমিক সংগ্রামের উজ্জ্বল মশাল যে পথ দেখায়

গৌতম চৌধুরি

উত্তর চব্বিশ পরগনার টিটাগড়ের লুমটেক্স জুটমিল বা মাটকলের শ্রমিকেরা সাম্প্রতিককালে সংগ্রামের এক অসাধারণ নজির গড়েছেন। ২০০৭ সাল থেকে শুরু হয়ে এই অসম লড়াই আজও লাগাতারভাবে চলেছে প্রচারমাধ্যমের আলোর বৃত্তের বাইরে। এটা আজ দেশের শ্রমিক সংগ্রামের সামনে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে হাজির হয়েছে— পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন করে, কখনো এগিয়ে কখনো পেছিয়ে, প্রয়োজনমত আত্মরক্ষা আর ঘুরে দাঁড়ানোর কৌশল ব্যবহার করে। সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকদের সংগ্রামী শক্তির ওপর নির্ভর করে শ্রমিকের নিজস্ব গণতান্ত্রিক উপায়ে চালিয়ে যাওয়া এই লড়াই একই সঙ্গে লড়াইয়ে শ্রেণীর নিজস্ব সচেতন নেতৃত্বও গড়ে তুলেছে। শ্রমিকের বিভক্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মালিকেরা যে জুলুম চালায় তার বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে, ঐক্যবদ্ধ করে দালালদের কোণঠাসা করা গেছে। প্রায় সবাইকে এক ছাতার তলায় হাজির করে বা শ্রমিকদের চাপে হাজির হতে বাধ্য করে শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করা আর ভ্রাতৃপ্রতিম বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে লড়াইয়ে একজোট করা হয়েছে। অন্যান্য মিত্র শ্রেণীর ও পেশার মানুষ আর স্থানীয় মানুষদেরও এই লড়াইয়ের পাশে টেনে আনা হয়েছে। কিভাবে প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থা থেকে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, রক্ষা করতে হয়, তার এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন লুমটেক্স জুটমিলের সংগ্রামী শ্রমিকদের নেতৃত্ব। আর তা করতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী, প্রশাসন, পুলিশ, আইন আর রাষ্ট্রের ভূমিকা স্পষ্ট করে তুলে শ্রেণীর বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য শ্রমিকদের প্রস্তুত করার কাজেও এগিয়েছেন তারা।

ধারাবাহিক ঘটনাবহুল সেই সংগ্রামের বয়ানই তার সাক্ষ্য দেয়।

লড়াই শুরু হয় ২০০৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে। সরকারের নাকের ডগায় বসে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, পেনসন আর ইএসআই-এর কোটি কোটি টাকা মেরে দেওয়া এ রাজ্যে কোনো ব্যতিক্রমী ব্যাপার নয়। মালিকদের এই বেআইনি কাজের প্রতিবাদে শ্রমিকেরা লড়াইয়ে নামলে তাকে পুলিশ আর দালাল ইউনিয়ন দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়াও নতুন কিছু নয়। লুমটেক্স মিলেও প্রায় ১৫ বছর ধরে জমে ছিল যে টাকা, শ্রমিকরা প্রথমত তাদের পিএফ-এর হিসেব চান। এর জবাবে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের করে দিলে ঘটে যায় স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট। ১৭ দিন পরে লেবার কমিশনারের মধ্যস্থতায় শ্রমিকেরা কাজে ফেরেন বটে, কিন্তু ৩ জন শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে না নেবার ফলে তাদের ক্ষোভ রয়ে যায়।

এরপর, শ্রমিকদের সন্ত্রস্ত করতে ঐ স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের বহিষ্কৃত নেতা শ্যামসুন্দর সাউ (লালী)-এর ওপর ঘটে যায় গুন্ডা বাহিনীর হামলা আর মিথ্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার। এই গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ৭ দিন পর লালী নিঃশর্ত মুক্তি পান এবং সংগ্রামী ইউনিয়ন গঠনের কাজ শুরু হয়। ২০০৮-এর জানুয়ারি মাসে লুমটেক্স সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়। ইউনিয়নের নেতৃত্বে পিএফ-এর হিসেব পেশের দাবিতে ২০০৮-এর ১২ মে মিল কর্তৃপক্ষ ঘেরাও হয় এবং পিএফ-এর হিসেব নিয়ে শ্রমিক নেতাদের সাথে ৭ দিনের মধ্যে আলোচনায় বসবে বলে লিখিতভাবে জানায়।

এর তিনদিন বাদে, ১৫ মে মিলগেটে সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের সভায় অতর্কিতে কর্তৃপক্ষ ও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মদতপুষ্ট গুন্ডাবাহিনী সশস্ত্র হামলা চালায়, অনেক শ্রমিক আহত হন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা থানা ঘেরাও করেন। এদিকে মিলের মধ্যে একজন পার্সোনেল ম্যানেজার অজ্ঞাত কারণে নিহত হন। সেই অজুহাতে থানাতেই পুলিশ শ্রমিকদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং ১৭জন শ্রমিক ও ২জন অশ্রমিক নেতাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। এদের সকলের নামই কর্তৃপক্ষের করা এফআইআর-এর মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ-মালিকের নির্লজ্জ আঁতাতের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। আটক শ্রমিক ও শ্রমিক-নেতাদের মুক্তির দাবিতে অন্য শ্রমিকেরা মিল বন্ধ করে দেন। এরপর এফআইআর-এ থাকা

আরো দুজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭০ বছরের বৃদ্ধ ও ১৪ বছরের কিশোর সহ মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১। সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের যে ক'জন জেলের বাইরে ছিলেন তাদের নেতৃত্বে মে থেকে আগস্ট মাস জুড়ে বন্দিদের মুক্তির দাবিতে তুমুল আন্দোলন চলে। সহযোগিতায় এগিয়ে আসে একাধিক ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন। শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে ওঠে অভূতপূর্ব ঐক্য। ২০০৮-এর আগস্ট মাসে একজন (অলিক চক্রবর্তী) বাদে বাকিরা হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পান। হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ২৪ জন শ্রমিককে বাইরে রেখে ২০০৮-এর ১২ সেপ্টেম্বর মিল চালু হলে শুরু হয়ে যায় সমস্ত শ্রমিককে নিঃশর্তভাবে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার লড়াই।

১ এপ্রিল, ২০০৯ থেকে শুরু হল বহিষ্কৃত শ্রমিকদের নিঃশর্তভাবে কাজে ফিরিয়ে নেবার দাবিতে মিল গেটের পাশে অনির্দিষ্টকালীন ধর্না। ১লা মে থেকে ধর্নামঞ্চে শুরু হয় অনির্দিষ্টকালীন অনশন।

১২ মে লোকসভা নির্বাচনের জন্য অনশন প্রত্যাহার করা হয় আরো ব্যাপক লড়াইয়ের প্রস্তুতির অঙ্গীকার ক'রে। জুন মাসে সমস্ত শ্রমিকদের নিঃশর্তভাবে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হলো। প্রথম ধাপে শ্রমিক আন্দোলন জয় পেল। কিন্তু মালিকপক্ষ সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিল না।

মালিকদের মধ্যে শরিকি বিবাদে প্রায় ১৫ কোটি টাকার উৎপাদিত সামগ্রী ২ মাস ধরে মিলের মধ্যে আটকে পড়লে ২০০৯-এর সেপ্টেম্বরে এসডিও অফিসে মালিকপক্ষ ও অন্যান্য সমস্ত ইউনিয়নের মধ্যে সমঝোতা হয় মাল বের করার। কিন্তু লড়াকু শ্রমিকেরা দাবি করেন, পিএফ ও গ্রাচুইটি মেটানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না হলে মাল মিলের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

১০ নভেম্বর মাল বের করার জন্য বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী মিলের মধ্যে ঢোকে। সংগ্রামী ইউনিয়নের ডাকে শ্রমিকদের প্রতিরোধের মুখে পুলিশ বাহিনী পিছু হঠে— মাল বের করার প্রশাসনিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর ১৩ই নভেম্বর এসডিও অফিসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে এই প্রথমবার সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়ন ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় ডাকা হয়— মালিকপক্ষ সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। স্থির হয় পিএফ ও গ্রাচুইটি নিয়ে কোনো সমঝোতা হলে তবেই মাল বের করা যাবে। মালিকপক্ষ এই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হয়।

১৭ নভেম্বর নব মহাকরণের শ্রমদপ্তরে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী মাসে ৮০ জনের গ্রাচুইটি দেবার আর মিলের উৎপাদন স্বাভাবিক হলে ১ মাসের মধ্যে পিএফ-এর হিসেব মেটানোর সিদ্ধান্ত হয়।

চুক্তি মেনে চলতে শুরু থেকেই মালিকের সদিচ্ছার অভাবে মিলে স্বাভাবিক উৎপাদনে চালু হতে তিন মাস লেগে যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে (২০১০) সমগ্র জুট শিল্প ধর্মঘট শুরু হয়। সংগ্রামী ইউনিয়ন এই ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হন। মিলে শ্রমিকদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ হাইকোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে এসে সমস্ত মাল বের করে নিয়ে যায়। মার্চ মাসে থেকে মিলে স্বাভাবিক উৎপাদন চালু হয়। চুক্তি মেনে চলার জন্য ২০১০-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মালিকের ওপর সংগ্রামী ইউনিয়ন বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। প্রথম কয়েকমাস মালিকপক্ষ চুক্তি মেনে চলার ফলে প্রায় ২৫০ জন শ্রমিক গ্রাচুইটি পায় ও পিএফ-এর চলতি টাকা মালিক জমা করে। কিন্তু তারপরেই মালিকপক্ষ বুঝিয়ে দেয় তারা আর চুক্তি মেনে চলবে না। ডিসেম্বর মাস থেকে শ্রমিকদের 'গো স্লো' আন্দোলন শুরু হয়।

আন্দোলন ভাঙতে মালিকপক্ষ সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের ওপর ২০১১-র ১৩ জানুয়ারি আবার আক্রমণ নামায়। ম্যানেজারদের খুনের চেষ্টার অভিযোগে ইউনিয়নের ৭ জন নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ও তাদের আবারও বিনা নোটিশে কাজ থেকে বের করে দেয়। এর প্রতিবাদে পর দিন শ্রমিকেরা কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করেন। মিলের মধ্যে পুলিশ বাহিনীর ব্যাপক লাঠিচার্জে শ্রমিকদের পশ্চাপসরণ ঘটে। আন্দোলনের অগ্রণী নেতা উমাশঙ্কর ও আরো একজনকে গ্রেপ্তার করে প্রহার চলে, পরে মুক্তি দেওয়া হয়। উমাশঙ্করকে মিল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এরপরে শ্রমিকদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে ইউনিয়নের ৬ জনকে মালিকপক্ষ কাজে ফিরিয়ে নিলেও দুজন (লালী ও রাজকুমার)-কে কোনো মূল্যেই ফিরিয়ে নেবে না বলে জানায়। পরের একবছর জুড়ে সংগ্রামী ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে ধর্না, অন্যান্য ইউনিয়নের নেতাদের ওপর চাপ তৈরি করা ও আরো নানা ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচি চলে।

ঐ দুজনকে কাজে ফিরিয়ে নেবার দাবিতে সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের ডাকে শ্রমিকেরা ২০১২-র ২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট শুরু করেন. অন্যান্য সমস্ত ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এই ধর্মঘট ১০০ শতাংশ সফলভাবে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত শ্রমমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। কিন্তু শ্রমমন্ত্রী সরাসরি মালিকদের পক্ষ নিয়ে জানিয়ে দেন, এই দুজন শ্রমিকনেতাদের কাজ হবে না। লড়াইটা সরকারের সাথে সরাসরি বেধে যায়। ধর্মঘট চালিয়ে সরকারকে ঐ মুহূর্তে বাধ্য করা সম্ভব ছিল না, তাই ১২ ফেব্রুয়ারি শ্রমমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পরে আন্দোলন কিছুটা পিছু হটে— ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়. শুরু হয় বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতি।

এরপর ২০১৩-র ১৮ জানুয়ারি অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা তাদের পিএফ আর গ্রাচুইটি মিটিয়ে দেবার দাবি জানান, অন্যথায় ২৮০ টাকা প্রতিদিন মজুরির দাবিতে কাজ বন্ধ করে দেন। এর ফলে ২৩ জানুয়ারি মিলে ৭০ শতাংশ কাজ বন্ধ হয়ে

যায়। একে মোকাবিলা করতে মালিকপক্ষ মিলে নিজেদের পেটোয়া লোক ঢুকিয়ে অফিসে সামান্য কিছু ভাঙচুর করিয়ে মিলে 'সাসপেনসন অফ ওয়ার্ক' জারি করে। শ্রমিকরা এই আক্রমণে দমে না গিয়ে লড়াইয়ে দৃঢ় থাকেন। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের মনোবল ভাঙার জন্য লেবার কমিশনের অফিসে ত্রিপক্ষীয় মিটিং-এ অনুপস্থিত থাকা, সংগ্রামী ইউনিয়নের নামে মিথ্যে মামলা সাজিয়ে মিলের আশপাশে আসার ব্যাপারে কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ আনা ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে লাভ হয় না। অবশেষে সিটু ও আইএনটিটিইউসির একটি অংশ-সহ ৫টি পেটোয়া ইউনিয়নকে নিয়ে ২০১৩-র ৬ মে একঘণ্টার নোটিশে লেবার দপ্তরে একটি মিটিং ডাকা হয়. পিএফ-গ্রাচুইটি সহ শ্রমিকদের মূল দাবিগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা ছাড়াই মিল চালু করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। শ্রম দপ্তর স্পষ্টভাবে মালিকের পক্ষে ভূমিকা পালন করে।

বাকি ১১টি ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার ক'রে পরদিন লেবার দপ্তরকে নতুনভাবে মিটিং ডাকার দাবি জানায়। ঐদিন থেকে মিল চালু হলেও প্রায় পনেরো দিন ৯০ শতাংশ শ্রমিকই কাজে যাননি। এই সময় ১১টি ইউনিয়নের আন্দোলনের জোট তৈরি হয়। জোটের পক্ষ থেকে লেবার দপ্তরে বারবার ডেপুটেশন দেওয়া থেকে শুরু করে ঘেরাও— সব কিছু সত্ত্বেও কোনো মিটিং ডাকা হলো না। মিটিং-এর জন্যে অপেক্ষা শেষ পর্যন্ত ১ জুন, ২০১৩ অর্ধেক শ্রমিক কাজে যোগ দেন। ১১ ইউনিয়নের জোট অবশেষে এই দিন থেকে লাগাতার ধর্না শুরু করে। ১ মাস পার হয়ে গেলেও লেবার দপ্তর কোনো মিটিং ডাকে না। তাই ধর্না চালু রেখেই ১১ ইউনিয়নের ডাকে ১২ জুলাই বি. টি রোড অবরোধ করা হয়। ৪ ঘণ্টা অবরোধ চলার পরে ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের মধ্যস্থতায় অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

জুলাই থেকে অক্টোবর মাস জুড়ে সমস্যা মেটানোর নামে সরকারের তরফে নানা অভিনয় চলে। জেলাশাসক শ্রমদপ্তর, পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে শ্রমদপ্তরে ত্রিপাক্ষিক মিটিং ডাকেন এবং সেই মিটিংগুলিতে মালিককে রক্ষা করাই ওদের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পুজোর মুখে বেতন দেবার সময় হেসিয়ান ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকদের বেতন কেটে নেওয়া হয়, আর সেই কম বেতন নেবার শর্তে বোনাস দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। এতে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ৭ অক্টোবর প্রোডাকশন ম্যানেজার মার খান। পুলিশ আসে এবং বিক্ষোভের মুখে হঠে যায়। পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ শ্রমিককে পুরো বেতন দিতে অস্বীকার করে। শ্রমিকরাও ঐ কাটৌতি বেতন নিতে নারাজ। তখনকার মত কেবল বোনাসটাই দিতে বলে। কিন্তু ঐ বেতন না নিলে তাদের বোনাস দিতেও কর্তৃপক্ষ রাজি নয়। ১১টি ইউনিয়নের মিলিত আবেদনেও শ্রমদপ্তর এবং প্রশাসন নির্বিকার থাকে। এবার ১১ অক্টোবর ১১টি ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকরা বিটি রোড অবরোধ করেন। ৪ ঘণ্টা পরে এসডিও ঘটনাস্থলে আসেন মধ্যস্থতা করতে। কর্তৃপক্ষ বোনাস দিতে বাধ্য হয় এবং অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। শ্রমিকরা আবারও একটি ছোটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জয় অর্জন করেন।

২৬ অক্টোবর জেলাশাসক আবার মিটিং ডাকেন। সেখানেও প্রশাসন ও সরকারের তরফে মালিকদের আড়াল করার প্রকট চেষ্টা চলে। সরকারের লোক হিসেবে এই মিটিংগুলোতে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটির এমএলএ ও উত্তর ২৪ পরগণার আইএনটিইউসি-র সভাপতি। সমস্ত সমস্যার জন্য তিনি সংগ্রামী ইউনিয়নকে দায়ী করে তাকে সরকারের কাছে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ১১টি ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ দাবির মুখে মালিকপক্ষ হেসিয়ান ডিপার্টমেন্টের সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক ২৮ অক্টোবর থেকে তুলে নেওয়ার ও শ্রমিকদের পুরো বেতন দিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হয়। জেলাশাসক ধর্না তুলে নিতে বললে ১১ ইউনিয়ন জানিয়ে দেয় পিএফ ও গ্রাচুইটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হলে তা সম্ভব নয়।

এর পরদিন (২৭ অক্টোবর) থেকেই ধর্না মঞ্চটিকে তুলে দেবার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। তারা ১১ ইউনিয়নের নেতাদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ইতিমধ্যে ২৫ আগস্ট মিল গেটের সামনে উপরোক্ত সরকারি ব্যক্তির নেতৃত্বে মালিকের পেটোয়া ইউনিয়নগুলি যে ধর্না মঞ্চ গড়ে সেখানে বসার জন্য একজন

লোকও মেলেনি, ফলে সেটি তারা তুলে নেয়। পুলিশ এটা দেখিয়ে ১১ ইউনিয়নের মঞ্চও তুলে নিতে বলে। কিন্তু শ্রমিকরা সমস্ত চাপকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকে।

জেলাশাসকের ২৬ অক্টোবর ডাকা পূর্বোক্ত মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৮ অক্টোবর বন্ধ থাকা একটি ডিপার্টমেন্ট খোলার কথা, অথচ সেদিন সকালে মালিকপক্ষ 'নকশাল ইউনিয়নের' জন্য মিল চালানো সম্ভব হচ্ছে না জানিয়ে ওয়ার্ক সাসপেনশনের নোটিশ ঝুলিয়ে পুরো মিল বন্ধ করে দেয়। সরকারের তরফে মালিকের বিরুদ্ধে যথারীতি কোনো ব্যবস্থা বা মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হলো না।

মিল মালিক, সরকার, দালাল আর গুন্ডাদের সমবেত আক্রমণের বিরুদ্ধে এলাকার গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থনকে সংগঠিত করতে গত ১১ নভেম্বর স্থানীয় টাউন হলে এক সভার আয়োজন করে ১১ ইউনিয়নের জোট। তাতে এলাকার ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা, পৌরসভার কাউন্সিলররা, বিভিন্ন ক্লাব আর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের এই লড়াইয়ের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং তাদের পক্ষে সম্ভাব্য সমস্ত রকমের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

ওয়ার্ক সাসপেনশনের ৪৫দিন কেটে গেলে, শ্রমিকদের দাবি মেনে সুষ্ঠুভাবে মিল চালানোর দাবিতে ১০ ডিসেম্বর থেকে ধর্নামঞ্চে ৭ দিনের রিলে অনশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। অনশন সত্ত্বেও প্রশাসন নির্বিকার থাকে। ১৬ ডিসেম্বর ১১টি ইউনিয়ন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ২৭ ডিসেম্বর টিটাগড় বনধ ঘোষণা করে। বন্‌ধে মানুষের সাড়া পাওয়া যায়। প্রায় সম্পূর্ণ সফল হয় বন্‌ধ। সেদিন বিটি রোড অবরোধ করে মিল মালিক ও শ্রমমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ান শ্রমিকরা।

এতেও শ্রমদপ্তরের কোনো ভ্রূক্ষেপ দেখা গেলনা। এরপর গত ৩রা জানুযারি ব্যারাকপুরে ডেপুটি লেবার কমিশনের অফিসে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ দেখাতে যান। গিয়ে দেখা যায় অফিস ফাঁকা— সমস্ত অফিসার অফিস ছেড়ে চলে গেছেন। উত্তেজিত শ্রমিকেরা লেবার অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। ৪ ঘণ্টা পরে অ্যাসিস্টান্ট পুলিশ কমিশনার এসে এসডিও অফিসে ৫-ই জানুয়ারি লেবার কমিশনার সহ ১১টি ইউনিয়নের মিটিং-য়ের প্রতিশ্রুতি দিলে অফিসের তালা খুলে দেওয়া হয়। ২৭শে জানুয়ারি টিটাগড়ে রেল অবরোধের কর্মসূচি।

সংযোজন : ২৭ জানুয়ারি দিনভর টিটাগড়ে রেল অবরোধের পর রাজ্য শ্রমদপ্তরে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক স্থির হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। যদিও দলনেত্রী তথা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান শ্রমমন্ত্রীও 'মাওবাদী' যোগাযোগের অভিযোগ এনেছেন লুমটেক্স চটকলের আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে।

অভী দত্ত মজুমদার **স্মরণ**

১৯৬৮-র ১৪ই ডিসেম্বর যে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছিলো, সেই কর্মময় জীবনের আপাত ছেদ ঘটলো ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৩। অভী দত্ত মজুমদার গত দশকের জন আন্দোলনের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এক তিমির-বিনাশী আলোকবর্তিকা।

ভারতের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানী, দেশ-প্রেমিক বিজ্ঞানী বিরল নন। একজন বিজ্ঞানী তার পেশাগত যোগ্যতা বজায় রেখে, তাঁর পেশাতে সৎ থেকে নানান সামাজিক কর্মব্যস্ত সক্রিয় থেকেছেন, স্বপ্নদর্শী হিসেবে দূরায়ত ভবিষ্যতের বাস্তব পরিকল্পনায় বিভোর থেকেছেন, কলকাতার আকর্ষণকে অনায়াসে উপেক্ষা করে ছুটে গেছেন অখ্যাত, অবজ্ঞাত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে— কখনও খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্নতা নিয়ে প্রচারাভিযানে, কখনও বিজ্ঞানের জীবনমুখী প্রয়োগের স্বতঃপ্রণোদিত তাড়নায় এমন একজন মানুষ ছিলেন আমাদের অভী। অবশ্য বিজ্ঞানী অভী, সংগঠক অভী, বক্তা অভী, প্রাবন্ধিক অভী এবং স্নেহছায়া প্রদানকারী স্নিগ্ধ বনানীর মতো অভীর কাছে হয়ত এটাই প্রত্যাশিত ছিল। মৌলকণা বিদ্যার সর্বাধুনিক গবেষণায় রত অভী আর পাঁচজনের মতো বিদেশে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ গ্রহণ করেননি— তার স্মৃতিপটে জাগরূক পাণ্ডুয়ার স্মৃতি তাকে ঘরমুখী করেছে।

দু-দুটি সামাজিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক, রাজনৈতিক দিক থেকে ঋজু সংগঠনের প্রাণপুরুষ অভী অনতি অতীতের একজন দক্ষ সংগঠক, একজন দরদি সমাজকর্মী এবং সব কিছুকে ছাপিয়ে একজন সুনাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। জীবনানন্দ বলেছিলেন, মানুষের মৃত্যু হলেও মানব থেকে যায়। আমরা জানি, শমীবৃক্ষের শীর্ষে অভী যে শরপূর্ণ তূর্ণ রেখে গেছেন, তার প্রতিটি শর এই সমাজের আবর্জনা দূর করার কাজে তেজী হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

সংকল্প

সৃজন সেন

অনেকবার তো বলেছিলাম— হে ভগবান, তোমার কাছে,
হয়েছি বুড়ো, আমায় মারো, ভাইটি আমার উঠুক বেঁচে।
শোনোনি তুমি আমার কথা, ভাইকে আমার নিলেই কেড়ে,
বুড়ো আমি বেঁচে রইলেম জীর্ণ দেহ, শীর্ণ হাড়ে।

আমার ভাইয়ের জন্য মানুষ ভাসলো যখন চোখের জলে
লুটেরারা পরায় মালা, ঠাকুর, তখন তোমার গলে।
দেশটা যারা খাচ্ছে লুটে, তুমি ঠাকুর পক্ষে তাদের,
চিনছে মানুষ ক্রমে ক্রমে ভগবানরা বাঁচায় কাদের।

তোমার মূর্তি তাই ভগবান ভাসাবো এবার ডোবার জলে,
হলেও বুড়ো, লড়বো আমি, থাকবো ভাইয়্যা অভীর দলে।

অভীর স্বল্পদীর্ঘ জীবনের সমস্ত ইতিবাচক সংগ্রামী
ঐশ্বর্য আমাদের সংগ্রামে প্রাণিত করুক।

গল্প

এভাবেই শুরু হয়

দীপঙ্কর দাস

উত্তর কলকাতার শহরতলি এলাকার এই বহু প্রাচীন মফস্‌সল শহরটিকে আজ অনেকদিন থেকে কেউ আর পৃথক কোনো মফস্‌সল শহর হিসেবে দেখে না। কলকাতা শহরের সঙ্গে এই মফস্‌সল শহরের সড়ক এবং রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা এতটাই উন্নত যে এই শহরকে কলকাতা শহরের বর্ধিত অংশ হিসেবেই দেখে। ফলে যে কোনো মহানগরের উন্নয়নের ব্যাধির সকল উপসর্গ এই শহরেও দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ শহরের একাংশ গত বিশ-পঁচিশ বছর আগে থেকেই তুমুল উন্নয়নের ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে ঝাঁ চকচকে প্রশস্ত সড়ক, সড়কের দুপাশে একটার পর একটা দৃষ্টিনন্দন আকাশ ছোঁয়া উঁচু বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ি মাথা তুলেছে। তেমনি শপিংমল, মার্কেট কমপ্লেক্স, ফুডপার্ক, বিউটি পার্লার, জিমনাসিয়াম, মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল এমনকি অসংখ্য বার কাম রেস্টুরেন্টও গড়ে উঠেছে। আর বলা বাহুল্য যে এসবই ঘটেছে এই অংশের দীর্ঘদিনের হতদরিদ্র বাসিন্দাদের জবর দখল বস্তি, জীবিকা নির্বাহনের আদ্যিকালের মুদি দোকান, টেলারিং শপ, রিক্সা সাইকেল সারাই-এর দোকান ঘরগুলি উচ্ছেদ করেই। আবার এটাও ঠিক যে শহরের অল্প পরিসরের বাইরে যে বিশাল প্রান্তিক এলাকাগুলি আছে, সেইসব এলাকা কেবল অনাদৃতই হয়ে থাকেনি। তাদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। অথচ সবকিছুকেই প্রান্তিক এলাকাবাসীরা নিঃশব্দে মেনেও নিয়েছে।

সময় এখন ফাল্গুনের শেষাশেষি। গাঙ্গেয় বাংলায় শীত তেমন তীব্র হয় না কোনবার। আর যদিও বা সামান্য কিছু শীত নামে কোনো কোনো বছর, তাহলেও তার মেয়াদও খুব স্বল্প সময়ের। ফলে মাঘের শেষাশেষি শীত তার তল্পিতল্পা নিয়ে বিদায় নেয়। আর ফাল্গুনের শেষভাগ থেকেই গরম পড়তে শুরু করে। আর এই সময়টায় এদিকে এমন ক্ষ্যাপাটে বাতাস ছাড়ে যে সেই বাতাস গায়ে লাগলে এখনও জবার মনে হয় তার হালকা পাতলা শরীরটাই বুঝি মাটির ভেতর থেকে শেকড়-বাকর তুলে নিয়ে ভেসে যাবে এখুনি।

রাত এখন প্রায় এগারোটার ঘর ছুঁই ছুঁই। এর মধ্যেই মফস্‌সল শহরের এই প্রান্তিক এলাকা যেন নিঝুম ঘুমে তলিয়ে গেছে। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে কিছুক্ষণ হল। তারপর মার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করে রান্নাঘর গুছিয়ে জবা বাবার রাতের শেষ ওষুধ খাইয়ে নিজেদের ঘরে এসে খাটের ওপর বসল আরাম করে। চিরশ্রী তার খাটের মাথার দিকে রাখা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শুতে যাওয়ার আগে রোজের মতো ত্বক পরিচর্যা করছিল। জবা পেছন থেকে দেখছিল চিরশ্রীকে। চিরশ্রীর এখন বয়স কত হবে? জবার যদি তিরিশ হয়, তাহলে চিরশ্রীর এখন তেইশ ছাড়িয়ে চব্বিশ। জবা তো চিরশ্রীকে চোখের সামনে জন্মাতে দেখেছে। জবার পরিষ্কার মনে আছে, জবা যে বছর স্কুলে ক্লাস টু-র অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিল, তখন তো জবা সাত পূর্ণ করে ফেলেছে। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর তখন স্কুলও বন্ধ। সময়টা এরকমই মার্চের মাঝামাঝি। একদিন রাতে পাশের ঘরে, যেটি বাবা ও মার শোওয়ার ঘর— বাবা এবং পাড়ার দু-চারজন জবার দাদা-স্থানীয় ছেলেদের কথাবার্তা শুনে জবার ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম জড়ানো চোখ কচলাতে কচলাতে ঘর থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল বাড়ির সামনের সরু রাস্তার ওপর একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। আর দাদারা মাকে স্ট্রেচারে তুলে খুব সাবধানে স্ট্রেচার নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর ঢুকে পড়ল। সঙ্গে বাবা। তারপর অ্যাম্বুলেন্স হুটার বাজাতে বাজাতে ছুটে গেল কোথায় যেন। আর তখনই পাড়ার বিন্দুমাসি— মার পাড়াতুতো সই, জবাকে ডেকে নিয়ে পুনরায় ঢুকে পড়ল জবার শোওয়ার ঘরে। জবা জিজ্ঞেস করেছিল বিন্দুমাসিকে— মাসি, বাবা, অতীশদা, দীপকদা ঐ সাদা গাড়িতে করে মাকে কোথায় নিয়ে গেল? বিন্দুমাসি জবাকে বলেছিল—হাসপাতালে মা, হাসপাতালে।

হাসপাতাল? হঠাৎ করে হাসপাতাল কেন? মার কি হয়েছে?

হঠাৎ করে তোমার মার পেটে ব্যথা উঠেছিল যে। জবাব দিয়ে বিন্দুমাসি আর কথা না বাড়িয়ে জবাকে বলেছিল, এবার তুমি শুয়ে পড়। আমি ততক্ষণে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে আসছি। কেমন?

পরদিন সকাল ন'টার সময় বাবা বাড়ি ফিরেছিল। হাসি হাসি মুখ করে। বিন্দুমাসিকে বলেছিল— তোমার সই-এর মেয়ে হয়েছে গো। রাত তিনটে বেজে পনেরো মিনিটে। নর্মাল ডেলিভারিই হয়েছে। মা মেয়ে দুজনেই ভালো আছে। মনে হয় দিন পাঁচেকের মধ্যে ছেড়ে দেবে তোমার সই আর বেবিকে। বাবার মুখ থেকে 'মেয়ে হয়েছে গো' কথাটা শুনে বিন্দুমাসির মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলেছিল বিন্দুমাসি— আবার মেয়ে!

ব্যস্। সামান্য একটা বাক্যাংশ মাত্র। সেটুকুই যেন প্রবল শক্তিশালী কোন বিস্ফোরকের মতো নিস্তব্ধ বাড়ির মধ্যে বিস্ফারিত হয়েছিল। কিন্তু বাবা যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো বলেছিল— এই মেয়ে কিন্তু আমার রূপ পায়নি গো। ঠিক তোমার সই-এর বাপের বাড়ির রং পেয়েছে। ডেলিভারির পর বেবিকে পরিষ্কার করে হাসপাতালের নার্স যখন আমাকে দেখাল, তখন নার্স বলল— দেখুন দাদা। মেয়েকে দেখুন। ঠিক যেন

মেমদের কোন বাচ্চা। যেমন ফুটফুটে রং, তেমনি মুখ চোখ। খুব ঘন আর লম্বা চুল হবে আপনার মেয়ের। বিয়ে দিতে আপনাকে একটুও ভুগতে হবে না।

জবা দেখেছিল বাবার মুখ দিয়ে এমন আশ্বাসবাক্য শুনেও বিন্দুমাসির মুখের শুকনো ভাবনা কাটেনি। তবু সান্ত্বনার স্বরে বলেছিল— যাই হোক। মেয়ে তো বটেই। জানি না ঠাকুর দিদির কপালে আর কত দুঃখ লিখে রেখেছে।

বাবা এবং বিন্দুমাসির মধ্যেকার এমন রহস্যময় বাক্যালাপের প্রকৃত অর্থটা সাত বছর পূর্ণ করে ফেলা জবা পরিষ্কার করে বুঝতে না পারলেও, অন্তত এটুকু বুঝেছিল যে তার একটা বোন হয়েছে। সেই মেমসাহেবের মতো ফর্সা ফুটফুটে বোনকে নিয়ে আর দিন পাঁচেকের মধ্যেই বাড়ি ফিরবে মা। জবাও একটা মেম বোনকে তার সঙ্গী হিসেবে পাবে। সে বোনকে ভীষণ ভালোবাসবে। ভীষণ ভালোবাসবে।

চিরশ্রী জন্মানোর অব্যবহিত পরেই বাবাকে হাসপাতালের লেবার রুমের দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে যে নার্সটি বাবাকে বলেছিল— একেবারে মেম সাহেবের মতো ফর্সা হবে আপনার মেয়ে, সেই নার্সটি যে ভবিষ্যৎ গণনায় সামান্য ভুলচুক করেনি তার প্রমাণ তো এখন এই মুহূর্তে জবার সামনে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তেইশ পূর্ণ করা চিরশ্রী কেবল মেম সাহেবের রং পায়নি, সেই সঙ্গে পেয়েছে অপরূপ দেহ সৌষ্ঠবও। জবা যেখানে মাথায় পাঁচের বেশি বাড়তে পারেনি, চিরশ্রী সেখানে তরতরিয়ে বেড়ে সাড়ে পাঁচের সীমানাও পার করে ফেলেছে। যেমন চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক, পিঠ, তেমনি সরু কোমরও। এমনকি পেছনের অংশেও সামান্য অতিরিক্ত মেদ জমেনি। আর মুখশ্রী? নিজের আদরের এবং অবশ্যই স্নেহের সহোদরা বলেই নয়। নিতান্ত পক্ষপাতহীনভাবেই জবা বলতে পারে এমন মুখশ্রী কোটিতে গুটিক পাওয়া যাবে না। মা যতই গর্ব করে বলুক না কেন, যে তার দুই কন্যার মধ্যে চিরশ্রী ওর মামা বাড়ির রূপ পেয়েছে আর জবা হয়েছে ঠিক ওর বাবার মতো। জবা জানে মার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা সঠিক হলেও প্রথম দাবিটা অর্ধেকও সত্যি নয়। জবার মামা মাসিদের অনেক অল্প বয়স থেকে দেখে এসেছে বলে বাজি ফেলে বলতে পারে চিরশ্রীর রূপের কাছে কোন মামা-মাসির রূপ দাঁড়াতেই পারে না।

দুই

জবা হাতে একটু অবসর পেয়ে রাত এগারোটায় তার একটা বুকের জামার কাঁধের কাছটায় ফাটা অংশটা জুড়ে নেওয়ার জন্য সুঁচ সুতো নিয়ে বসেছিল। সেলাই সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সুঁচের সঙ্গে লাগানো বাড়তি সুতোটা দাঁত দিয়ে কেটে জবা পুনরায় চিরশ্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, কিরে চিরা? কিছু বলছিস না যে!... কিন্তু এবারও জবার প্রশ্নটা চিরশ্রীর কানে গেল কি গেল না, বুঝতে পারল না জবা। কারণ ঠিক তখনই চিরশ্রী বলে উঠল— অ্যাই দিদি, আমার পিঠে ময়শ্চরাইজারটা একটু লাগিয়ে দে না। গরম পড়তে না পড়তেই পিঠটা চিড়বিড় করে উঠছে।

জবা তার খাট থেকে উঠে এসে ময়শ্চারাইজারটা হাতের তালুতে নিয়ে বোনের মসৃণ পিঠে ঘষতে শুরু করল। শেষ করে জবা বলল— প্রতি গরমেই তো শুনছি তোর পিঠটা সারাদিন এমন চিরবিড় করে। একবার কোন স্কিন স্পেশালিস্টকে দেখিয়েও তো নিতে পারিস। ঐ বাদামতলার স্কিন ট্রিটমেন্ট স্পা-তে আরজিকর হাসপাতালের একজন স্কিন স্পেশালিস্ট-এর চেম্বার আছে। তুই বললে আমি গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে পারি।

ওসব পরে হবে। তুই আর একটু আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেনা দিদি! কতদিন হয়ে গেল, তুই আর আমাকে আগের মতো আদর করিস না বলতো।

শোন মেয়ের কথা! জবা হেসেই ফেলল। দিদির হাসিমাখা মুখটা এপাশের আয়নায় পরিষ্কার ধরা পড়ল চিরশ্রীর চোখে। দিদির হাসিটা এই বয়সেও কী যে সুন্দর লাগে চিরশ্রীর। সেই সঙ্গে বুকটা মুহূর্তের জন্য মুচড়ে উঠল চিরশ্রীর। কোন পাত্রপক্ষ দিদির এই হাসিটা একবারের জন্যও দেখল না কেন? কেবল বাইরের রঙটাই দেখল। তারপর পাত্রপক্ষ মণ্ডা-মিঠাই গিলে নাক সিঁটকে বলে গেল— না দিদি। মেয়ে যে একেবারে শ্মশান কালীর মতো কালো। এই মেয়ে আমাদের পছন্দ নয়।

নিজেকে দ্রুত সামনে নিয়ে চিরশ্রী জবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমি জানি দিদি কেন তুই আজকাল আর আমাকে আদর করিস না।

কী জানিস?

তুই আমাকে আর আগের মতো ভালোবাসিস না। পর করে দিতে চাস।

গলা ছাড় চিরু। আমার যে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কে শোনে কার কথা!

জবার শারীরিক উচ্চতা পাঁচ ফুটের সীমা ছাড়াতে পারে নি। সেখানে চিরশ্রী এখন পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি ছুঁয়ে ফেলেছে। জবার গায়ের রঙ রীতিমতো কালো। ঠিক বাবার গায়ের রং পেয়েছে জবা। কেবল গায়ের রং-ই নয়। বাবার মুখাকৃতিওপেয়েছে জবা। বাবার নাকটা একটু বেশি ভোঁতা। ঠোঁট দুটোও যথেষ্ট মোটা। চিবুকের কাছটা যেন কিছুটা সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ফলে বাবার ওপরের পাটির দাঁতের সামনের দিকের তিন চারটে দাঁত মুখ বন্ধ করলেও সব সময় বেরিয়ে থাকে সামনের দিকে। জবার মুখের ছাঁদও ঠিক বাবার মতো। হয়তো জবা যদি বাবার মতো রাজ্য সরকারের ইউডি ক্লার্ক-এর ঘরে না জন্মে কোন বড়লোকের ঘরে জন্মাত, তাহলে জবার চিবুক থেকে দাঁতের উপযুক্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসা করিয়ে মুখের এই ত্রুটিগুলিকে সারিয়ে নিতে পারত অনেক অল্প বয়সেই। একটু আদরযত্নে আর নিয়মিত বিউটি পার্লারে গিয়ে মুখের ফেসিয়াল করিয়ে মুখের রঙটাও যথেষ্ট উজ্জ্বল করে তুলতে পারত। তখন

হয়তো পাত্রপক্ষ জবাকে দেখতে এসে এমন বিশ্রী ভাবে— 'এ যে দেখছি একেবারে শ্মশানকালীর মতো কালো' বলে নাক সিঁটকে জবাকে বাতিল করে দিতে পারত না। —এবার ছাড় চিরা। রাত কিন্তু কম হল না। কাল সকাল আটটাতেই তোকে যে অফিসে হাজিরা দিতে ছুটতে হবে, সেটা খেয়াল আছে। জবা চিরশ্রীর এমন পাগলামো থামিয়ে নিজেকে চিরশ্রীর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চিরশ্রী তার খাটের ওপর শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে বলল— মশারিটা টানিয়ে দে না দিদি। সত্যি আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে। —ঘুমের আর দোষ কি বল! জবা বোনের খাটের মশারি টাঙিয়ে দিতে দিতে বলল। — সারা সপ্তাহ অফিসের ধকল সয়ে একটা রবিবার বিশ্রাম না পেলে ঘুম তো পাবেই। সত্যি সারাটা দিন আজ তোকে তো কম ধকল সইতে হয়নি। এবার ঘুমো। আমি ফ্যানটার স্পিড বাড়িয়ে দিচ্ছি। ভালো লাগবে। চিরশ্রীর খাটের মশারি টাঙিয়ে দিয়ে মশারির চারধার খাটের গদির নিচে গুঁজে দিয়ে নিজের খাটের মশারি টাঙানো শুরু করল। রাত তখন সাড়ে এগারো। গোটা পাড়া এখন নিঝুম ঘুমে তলিয়ে গেছে। এদিকের এই প্রান্তিক এলাকার সব পরিবারগুলির পুরুষেরা মূলতই ''দিন আনি দিন খাই'' গোত্রীয় মানুষ। সকলেই বহু শ্রম সাধ্য দিন মজুরির ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত। সকাল থেকে সন্ধ্যা ব্যস্ত থাকতে হয় কাজে। তবু এর মধ্যেই দু-চারজন জবার বাবা প্রিয়নাথের মতো সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাঁধা মাইনের কেরানি টেরানির পদের কর্মী নেই এমনও নয়। আছে। মিলিয়ে মিশিয়ে সব পেশার কর্মীরা দীর্ঘদিন বসবাস করছে এখানে। তিরিশ বছর বয়স হলো জবার। এই সময়ের মধ্যে কম তো দেখল না জবা। মূল মফস্সল শহরটারই তো কত দ্রুত রূপান্তর ঘটে যেতে দেখল। মূল শহরের বাদামতলা, প্রতাপগড়, তেঁতুলতলা, মন্দিরতলার মতো বহু পুরানো সব জায়গায় কুড়ি বছর আগেও যেখানে অধিকাংশ ঘরবাড়ি ছিল একতলা, বড় জোর দোতলা, এখন সেই সব এলাকায় গড়ে উঠেছে কত যে আকাশ ছোঁয়া বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। পাড়ার নামগুলি পর্যন্ত বদলে গেছে। বাদামতলা হয়ে গেছে 'ভ্যালি পার্ক'। তেঁতুলতলার নাম হয়েছে 'হরাইজন এনক্লেভ'। প্রতাপগড়ের নাম হয়েছে 'নন্দার্ন পার্ক'। এটাই তো স্বাভাবিক। উন্নয়ন মানেই তো বৈষম্য বৃদ্ধি। কিছু মানুষের উন্নতি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অবনতি। এর জন্য জবার মনে কোন ক্ষোভ নেই। কেন মিছিমিছি ক্ষুব্ধ হবে জবা! এমন বৈষম্য কি কেবল বাইরের জগতেই ঘটে? একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও এই অসম পরিবর্তন ঘটে। এই যে জবা আর চিরশ্রী। একই পিতার ঔরসে একই জননীর গর্ভে মেয়ে হয়ে জন্মানো দুই বোনের মধ্যেও কি ঈশ্বর যোজন যোজন বৈষম্য সৃষ্টি করে দেন নি? কেবল রূপের দিক দিয়েই নাকি? মুখশ্রী, উচ্চতা, গায়ের রং-এর ব্যবধানের কথা না হয় বাদই দিল জবা, মাথার দিক দিয়েও দুই বোনের মধ্যে এতটাই ব্যবধান করে দিলেন জবার ঈশ্বর, তারও তো কোন ব্যাখ্যা নেই। স্কুল জীবনে প্রায় প্রতিটি ক্লাসে একবার করে ঠোক্কর খেতে খেতে জবা যখন ক্লাস টেন-এ পৌঁছলো, তখনই তার বয়স উনিশ ছাড়িয়ে কুড়িতে পা দিয়েছে। আর মাধ্যমিকটাও যখন প্রথম সুযোগে পার হতে পারল না তখন জবার মা হেমলতা বাবা প্রিয়নাথকে বলল, অনেক হয়েছে। আর পাসটাস দিতে হবে না। এখন থেকে ওর পাত্র খোঁজার চেষ্টা কর। এর মধ্যে জবা না হয় একটু সেলাই ফোঁড়াই-এর কাজ, কনে সাজানোর কাজটাজ শিখে নিক। মেয়ের যা রূপ, বয়স পেরিয়ে গেলে আর কোন পাত্র জুটবে না। তখনই তো চিরশ্রী তেরো পেরিয়ে গেছে। আর জবার মতো ক্ষিরিশতলার হরিমতি গার্লস-এর মতো নিম্নমানের স্কুল নয়। দমদম-এর সারদা পীঠের মতো নামী স্কুলের প্রতি ক্লাসে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হতে হতে ততদিনে ক্লাস নাইনে উঠে এসেছে। স্কুলের আন্টিদের নয়নের মণি। সকলেই আশা করেছিল অনেক বছর পরে তাদের স্কুলের নামকেও দশ জনের কাছে উজ্জ্বল করে দেবে। চিরশ্রী কাউকে নিরাশ করেনি। মাধ্যমিকে থার্ড। তারপর বিজ্ঞান নিয়ে বারো ক্লাসের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অর্জন করে জয়েন্ট সাফল্যের সঙ্গে পার করে একেবারে যাদবপুরের মতো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়া শুরু করে দিল। আর এদিকে ততদিনে মামা মাসিদের উদ্যোগে জবার তিন তিন বার পাত্রপক্ষ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মতো সাফল্যও অর্জন করা হয়ে গেছে। সে যে কী লজ্জা, কেবল জবাই জানে। আর সম্ভবত, সম্ভবত কেন, অবশ্যই জানত প্রিয়নাথও। তার প্রথম সন্তান কন্যা। আর সেই কন্যাও কিনা তার মতোই রঙ এবং মুখ পেয়েছে। প্রিয়নাথও যে ছাত্র জীবনে খুব বেশি মেধার পরিচয় দিতে পেরেছে, এমন নয়। তবে ভাগ্য ভালো যে প্রিয়নাথকে তার সাত আট বছর বয়স থেকেই স্কুল ছাড়া বাকি সময়টুকু নবজাত বোনের দেখাশোনা করে কাটাতে হয়নি। ফলে কেবলমাত্র পরিশ্রম করে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকে কমার্সের পাসকোর্সে গ্র্যাজুয়েটটুকু হতে পেরেছিল। তারপর অমানুষিক শ্রম দিয়ে রাজ্য সরকারের পরীক্ষায় বসে রাজ্য সরকারের থার্ড গ্রেড ক্লার্কের চাকরিটা জুটিয়ে নিতে পেরেছিল। জবাও যদি রোজ পুরো সময়টা পাঠ্যপুস্তকের পেছনে কাটিয়ে দিতে পারত, তাহলে প্রিয়নাথও নিশ্চিত জানেন যে জবাও ঠিক তাঁর মতই সামান্য সাফল্য অর্জন করতে পারত। কোন রকমে সরকারি কোন দপ্তরে একটা ফোর্থ গ্রেড ক্লার্ক-এর চাকরি যদি জবা জুটিয়ে নিতে পারত, তাহলে পাত্রপক্ষের চোখে জবার এমন কালো রংটাও যে ফর্সা বলে ঠেকত, এটা প্রিয়নাথ ভালো করেই আন্দাজ করতে পারতেন। আর জবাকে তার মামা মাসিদের জুটিয়ে আনা মুদিখানার মালিক, দর্জি দোকানের ফুরোনে কাজের মধ্যবয়সি বিপত্নীক কর্মী কিংবা চাকদহের সুতোর বাজারের নেশাভাঙ করা দালাল— এমন সুযোগ্য পাত্রের বাড়ির একদঙ্গল আত্মীয় পরিজনের সামনে মুখে প্রসাধনের নামে রং-চং মেখে গাজন

পরবের সং সেজে গিয়ে যেমন বসতে হতো না, তেমন মেয়ে দেখার নাম করে এক দঙ্গল আত্মীয়-পরিজনরা প্রিয়নাথের কষ্টার্জিত অর্থে কেনা একগাদা মণ্ডামিঠাই ধ্বংস করে "মেয়ে যে দেখি একেবারে শ্মশান কালী। না দিদি, এমন কুৎসিৎ মেয়েকে বউ করে আমরা ঘরে আনতে পারব না," এমন অমানবিক মন্তব্য করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারত না।

প্রতিবার পাত্রপক্ষের দ্বারা এমন ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য সহ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে জবা একছুটে প্রিয়নাথের বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলত। জবার এমন ব্যর্থতা যে তারই ব্যর্থতা। জবার এমন অপমানের প্রকৃত দায় যে তারই দায়— এটা প্রিয়নাথ অনেক দিন থেকেই জানেন। সেই কোন কৈশোর কাল থেকে কিশোরী জবা তারই জননীর মুখে, মাসি পিসিদের মুখে, এমনকি পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে অতি উৎসাহী মেয়ে বউদের মুখে এই একই কথা শুনে শুনে বড় হয়েছে— মেয়ে তো নয়, যেন শ্মশান কালী। তার ওপর যদি মুখেও কিছু শ্রীছাঁদ থাকত। এমন মেয়েকে নিয়ে যে তুমি কী করবে, ভাবলে আমাদেরও কেমন অস্থির অস্থির লাগে। জবার আড়ালে নয়, জবার উপস্থিতিতেই এই সব দায়িত্বশীল মহিলারা তাদের দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করতেন। আর জবা তখন থেকেই শিখে ফেলেছিল কেমন করে লজ্জা আর অপমান সহ্য করতে হয়। কেমন করে চোখের জল বুকের ভেতরেই ঝরাতে হয়।

সাত সাত বার পাত্রপক্ষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে জবাই একদিন ছোটমাসির মুখের ওপর বলে দিল— তোমরা আর আমার জন্য পাত্র জুটিয়ে এনো না মাসি। আমি বারবার এভাবে অপমানিত হতে পারব না। ততদিনে জবা কুড়ি থেকে প্রায় আঠাশে পৌঁছিয়ে গেছে। প্রিয়নাথের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আর চিরশ্রীও তখন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্নাতক পর্যায়ের পড়া প্রায় শেষ করে এনেছে। ফলে চিরশ্রী সেদিন জবার এমন রুখে দাঁড়ানো দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, তোর কেউ না থাকুক, আমি আছিরে দিদি। চিরকাল তোর পাশেই থাকব।

সামান্য কিছু বড় হওয়ার পরেই চিরশ্রী টের পেয়ে গেছিল যে কেবল জবার চেয়ে সাত আট বছরের ছোট হওয়ার কারণেই নয়। এমন কি নিজের স্নেহ আদরের বোন হিসেবেই নয়, তার দিদি যে তার জন্ম কাল থেকেই তাকে মায়ের চেয়ে বেশি দায়িত্ব নিয়ে আগলে রেখেছে, তার পেছনে রয়ে গেছে তাকে অবলম্বন করেই তার দিদি সব অপমান, সব পরিহাসের যোগ্য জবাব দিতে চায়। এই কারণেই তো যেদিন চিরশ্রী তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল জেনে হাতে মার্কশীট নিয়ে স্কুল থেকে ফিরে তার সাফল্যের সংবাদটা জবাকেই দিয়েছিল সকলের আগে, জবার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল চিরশ্রী— দিদি, আমি পেরেছি রে। তোর সব অপমানের একটা যোগ্য জবাব দিতে পেরেছি। সেদিন জবা আনন্দে উত্তেজনায় কেঁদেই ফেলেছিল। সহোদরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেবলই বলছিল— আমি জানতাম রে চিরু। আমি জানতাম। অবসর নেওয়ার পর প্রিয়নাথ খুব বেশিদিন সচল থাকেননি। চাকরি থেকে অবসরের সময় যাবতীয় পাওনাগণ্ডা পেয়ে যাওয়ার পরে বছর ঘোরার আগেই একদিন সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে আর জি কর হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের বেডে দেড় মাস কাটিয়ে যখন প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন, তখন প্রিয়নাথের ডান দিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। পা থেকে মুখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গের ডান অংশটা একেবারে অসাড়। মুখটাও এমনভাবে বেঁকে গেছে যে কোন কথা বলতে চাইলে মুখ দিয়ে কেবল এক ধরনের গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে আসে। সেই ভাষা জবা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। ততদিনে চিরশ্রী উজ্জ্বল স্নাতক হয়ে পড়া শেষ করেই কলকাতার একটি নামি বহুজাতিক সংস্থায় যথেষ্ট লোভনীয় মাইনের চাকরি পেয়ে গেছে। চিরশ্রী বলেছিল, দিদি, বাবার দেখাশোনা করার জন্য ডে নাইট, দু শিফ্ট-এর জন্য দুজন আয়া রেখে দিচ্ছি। তুই আর কত বোঝা বইবি বল! মা-ও তো আজকাল আর কর্মঠ নয়। বাতের ব্যথায় প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। বাবার প্রতিও তো আমার একটা দায়িত্ব আছে।

শুনে জবা বলেছিল, অনেক হয়েছে। দু শিফ্ট-এর জন্য দুজন আয়া— তাও আবার ট্রেইন্ড আয়া। কম খরচ নাকি। টাকাটা তুই ব্যাঙ্কে জমা। ভবিষ্যতে কাজে দেবে। চিরশ্রী আর পীড়াপীড়ি করেনি। কারণ সে জানতো যে জবা কিছুতেই বাবার সেবাযত্নের ভার আর কারোর কাঁধে ছাড়তে রাজি নয়। বাবার এই পরিণতির পেছনে জবা নিজেকেই দায়ভাগী হিসেবে মনে করে। বাবার মতোই দেখতে হওয়ার জন্য জবা নিজেকেই দায়ী করে এসেছে। বাবা কী করে জানবেন যে জবা যখন সামান্য ভ্রূণ হয়ে ফুটে মায়ের গর্ভে বাড়ছিল তখন বাবার তো জানার কোন উপায় ছিল না তার স্ত্রীর গর্ভে কন্যাসন্তান এসেছে। আর এই কন্যা যে হুবহু তারই মতো খর্বকায়, কালো এবং কুৎসিত মুখশ্রী নিয়ে জন্মাবে! ফলে অপরাধটা তো জবার একার। বাবার যদি কোন দোষ থাকত তাহলে বিলম্বে হলেও চিরশ্রীর মতো অপরূপ সুন্দরী, মেধাবী কন্যা আবার জন্মাবে কেন? না না। বাবার কোন দোষ নেই। সব দোষ জবার। আর এই জবার জন্য দুশ্চিন্তায় ভুগে ভুগেই তো বাবা এভাবে মাথার শিরা ফাটিয়ে মস্তিষ্কের ভেতর রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে আজ এই অবস্থায় পৌঁছিয়েছে। সুতরাং সকালের বেডপ্যান, ইউরিন পট লাগিয়ে বাবার প্রাতঃকৃত্য সম্পূর্ণ করানো থেকে শুরু করে রাইল্স টিউবের সাহায্যে বাবার পথ্য, ওষুধ-বিষুধ খাওয়ানো, সেই সঙ্গে রান্নাঘরে চিরশ্রীর অফিসের ভাত তৈরি করা, সব সব কাজ জবা একার হাতে কেমন করে যেন সেরে ফেলে। রান্না সেরে আবার বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে জবা, দুপুরে শরীর স্পঞ্জ করিয়ে বেডশোর নিরোধক পাউডার মাখিয়ে লাঞ্চ খাইয়ে ওষুধ দিয়ে জবা মাকে তাড়া দিয়ে স্নানে পাঠিয়ে নিজে দুপুরের বাকি

রান্নাটুকু সেরে স্নান সেরে দুপুরের খাবার খায়। বাবা ততক্ষণে ওষুধের প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার বিকেল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত জবার চরকির মতো পাক খাওয়া শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষের প্রবেশের অধিকার নেই।

আজ রবিবার বিকেলের দিকে পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল চিরশ্রীকে। উদ্যোগটা মা'রই বেশি ছিল। ছোট মামাকে ঘনঘন তাড়া দিচ্ছিল হেমলতা। "তোর জামাইবাবুর অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস। আজ আছে কাল নেই। আমারও শরীর অচল হতে বসেছে। তবু মানুষটা অন্তত যাওয়ার আগে এটুকু দেখে যাক, চিরুটাকে সৎপাত্রে দেওয়া গেছে। চিরশ্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করা তো অতি সহজ কথা। মামা সব ব্যবস্থা করে দিলেন। পাত্রও ইঞ্জিনিয়ার। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে এক নামী সফ্টওয়ার কোম্পানির মোটা মাইনের চাকুরে। সল্টলেকের সিই ব্লকে নিজেদের দোতলা বাড়ি আছে। বাবা মার একমাত্র সন্তান। বাবা মা দুজনেই বেঁচে আছেন। বাবা কাস্টম্স'-এর খুব বড় চাকুরে ছিলেন। বছর দুয়েক হলো রিটায়ার করেছেন। চিরশ্রী একেবারে রাজরানি হয়ে যাবে।

জবা ভেবেছিল পাত্রপক্ষ কন্যা দেখতে এলে চিরশ্রী না আবার বলে বসে— আমি কিন্তু মুখে রঙ মেখে গাজনের সং সেজে গিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে বসতে পারবো না। ঘরে যেভাবে যে শাড়িতে আছি, ঠিক সেভাবেই গিয়ে বসবো।... কিন্তু জবা অবাক হয়ে শুনল পাত্রপক্ষ বাড়ি পৌঁছানোর আধঘণ্টা আগেই চিরশ্রী বাথরুমে গিয়ে ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধুয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুল নিয়ে বসে বলল— আমি কি একা একা সাজব? তুই সাজিয়ে দিবি না দিদি?

জবা সাজিয়ে দিয়েছিল। চিরশ্রীর আলমারি খুলে গত পুজোয় কেনা একটি স্বর্ণচাপা রঙের ওপর কাতানের কাজ করা একটা শাড়ি পরিয়ে যখন চিরশ্রীর রূপের দিকে তাকিয়ে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল জবা যে মুখ ফুটে কথাই বেরোয়নি। পাত্রপক্ষের সামনে বোনকে পাঠিয়ে জবা ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল নিজেরই বিজয়। চিরশ্রী যেন নিছকই জবার প্রিয় সহোদরা নয়। জবার দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা এমন এক ক্ষেপণাস্ত্র যা আজ পাত্রপক্ষের উদ্দেশে নিক্ষেপ করে আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে নিজের চূড়ান্ত বিজয়। পছন্দ। পাত্রের পছন্দ। পাত্রের সঙ্গে আসা পাত্রের মা, মাসি আর জামাইবাবু সকলের পছন্দ। জবার অভিজ্ঞ চোখ মনের কথাটা পড়ে ফেলল দ্রুত। তবু পাত্রপক্ষ তো। নিছকই দর বাড়ানোর জন্য বাড়ি ছাড়ার আগে চিরশ্রীর সেল ফোনের নম্বরটা লিখে নিয়ে পাত্রর মা বলে গেল— দেখি, পাত্রর বাবার সঙ্গে কথা বলে সামনের রবিবার ফোনে মতামত জানাবো। আজ চলি দিদি।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হলো। জবা বাবার জন্য ওষুধ-বিষুধের ব্যবস্থা করে রাতের রান্নার পালা চুকিয়ে যথারীতি রাত সাড়ে দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে রান্নাঘর ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করে নিজের ঘরে এল। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় চিরশ্রী কোন কথাই বলল না। নিঃশব্দে খাওয়া সেরে ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে গেল। মা উদ্বেগ চেপে না রাখতে পেরে জবারই শরণাপন্ন হয়ে বলল, আজ রাতের মধ্যে তুই চিরশ্রীর মতটা জেনে নিস তো জবা। ওর পাত্র পছন্দ হয়েছে, না হয়নি।

সেই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে জবা নিজের খাটে বসে পুনরায় তার বোনকে জিজ্ঞেস করল— তুই কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা দিলি না এখনও পর্যন্ত। বললি না পাত্র তোর পছন্দ হয়েছে কি হয়নি?

চিরশ্রী দিদির দিকে পাশ ফিরে শুয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল, এত তাড়াহুড়োর কি আছে। ওরা তো আমার মোবাইল নম্বর নিয়ে গেছে। কাল থেকে এই সেল ফোনটা তোর কাছেই থাকবে। আমার অফিসে আর একটা ফোন আছে। ওটাই ক'দিন ব্যবহার করবো। ফলে এই ফোনেই তো ফোন আসবে পাত্রপক্ষ থেকে। তুই নিজেই রিসিভ করবি। তখন বললেই তো হবে।

সে তো আর এক রবিবার। তার আগে তো তোর মতামতটা জানা দরকার।

নারে। রোববার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। দুরাত্রি কাটার পরেই ফোন আসবে ও পক্ষ থেকে। দেখে নিস।

তা যদি আসে তখন আমরা কী বলব ওদের।

আমরা নয়। তুই, হ্যাঁ দিদি তুই, নিজের হাতে সবুজ বোতামটা টিপে ফোন কলটা রিসিভ করবি। তারপর এতটুকু দ্বিধা না করে দৃঢ় আর পরিষ্কার গলায় বলবি— কিন্তু ছেলে যে ভীষণ কালো। মেয়ের আবার কালো ছেলে পছন্দ নয়!

জবা স্তম্ভিত। জবা এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়ল চিরশ্রীর কথা শুনে যে কোন কথাই উচ্চারণ করতে পারল না। বলতে পারল না, অমন দুধে আলতায় মেশানো রঙ যে ছেলের, তাকে তুই কালো দেখলি কেমন করে?

খুব অবাক হলি, তাই না দিদি? ভাবছিস তোর বোনটার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে তাই না। ঠোঁটের কোণে শ্লেষের হাসি হাসল চিরশ্রী। তারপরে হঠাৎ করে বলল— তোকে কতজন পাত্রপক্ষ দেখতে এসে নাক সিঁটকে চলে গেছিল রে দিদি! আমার মনে আছে, সাতবার। মোট সাত সাতবার পাত্রপক্ষ দ্বারা তোকে, বাবাকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। তার পরিণতিতে বাবার আজ এই অবস্থা। তাই বলছি সাতবারের মধ্যে মাত্র তো একবার হলো। আরও ছ'বার যে তোকেই পাত্রপক্ষকে ফোনে জবাব দিতে হবে— আপনাদের ছেলে যে ভীষণ কালো। আমাদের মেয়ের পছন্দ নয়। এতদূর বলে চিরশ্রী পুনরায় পাশ ফিরে শুয়ে জবাকে উদ্দেশ্য করে স্বাভাবিক গলায় বলল— নে, এবার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নে। তোকে তো আবার সকাল পাঁচটাতেই উঠে সংসার ঠেলা শুরু করতে হবে।

গল্প

মধু দেয়াসির বৌ

কানন ঘোষ

মাটির রঙে জায়াগার নাম গিরিডাঙ্গা। কাঁকরগুলো যেন মন্ত্রবলে একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে বিরাট চাঙর তৈরি করেছে। বর্ষার জল খল্ খল্ করে হাসতে হাসতে একদম নীচে ছুটে যায় কাঁদরে মেশে। শিরিষ বাবলা বটের সারিবদ্ধ গাছগুলোতে বাতাস আওয়াজ তোলে— শোঁ শোঁ। শক্ত টনকামাটি ফুঁড়ে নানান্ গাছ— সোনাঝুরি, ইউক্যালিপটাস্ এসবই বেশি।

এসব গাছ পরে লাগানো হয়েছে... লাগিয়েছে গিরিডাঙ্গা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আদিতে এখানে ছিল কলেজ হোস্টেল। আদিতে মানে ভারত স্বাধীন হবার বেশ আগে ইংরেজ আমলে... প্রায় ত্রিশের দশকে। রাজ এস্টেটের পয়সায় তৈরি ভারী ভারী দেওয়াল শক্ত চুনসুড়কির গাঁথনি। কী বড় বড় সব জানলা।

কাঠামোটা সেইটাই। শুধুমাত্র ওপর ওপর কিছু পরিবর্তনের রঙ রিফু চোখে পড়ে। এখন এখানে টি বি স্যানাটোরিয়াম গড়ে উঠেছে যার হেড অফিস কোলকাতা। যার পোষাকি নাম নিরাময়।

যাক্ সে সব। ইদানিং মধুর বৌ লক্ষ্মীরাণীকে এখানে ভর্তি করিয়েছে বিজন রায়। তাঁর অশেষ দয়া। ধুঁকছিল লক্ষ্মী— গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামান্য ওষুধ চিকিৎসাতে কিছু উন্নতি হচ্ছিল না। যেখান থেকে ওকে তুলে আনা হয় সেখানে লোকজন মন্তব্য করছিল—

আরে বাবু খারাপ রুগ্‌টে ধারনছে তহবেনা। যাখে বলে রাজরুগ্— মানে যক্ষা। তা বাবু রায়বাবুদের ছোটজনার কিপা। দ্যাখ্ ঠাকুরের কিপায় বাঁচে ত ভাল!

এখানে দিনগুলো ক্রমশম্লান ধূসর হয়ে উঠছিল... লক্ষ্মীরানী দূরে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে থাকে। লোকালয় অনেক দূর মিশে গেছে দিগন্তরেখায়। গ্রামগুলোর নাম ও নার্স আয়াদের মুখে শোনে... যশপুর, পছিয়ারা...।

লক্ষ্মীর এবার ওর জন্মভূমির কথা মনে পড়ে। রানীশ্বর-সাঁওতাল পরগণা সিউড়ী দুমকা রোডে...। বাবাকে ও দেখেনি... জ্ঞান হতে অব্দি মাকে দেখেছে... তারপর হঠাৎ মাও একদিন চলে যায় লোকান্তরে—। মামারা নিয়ে এল তখন শুকজোড়া গ্রামে। সম্পর্কের কাকারা খোঁজ নেয়নি...। ছোটবেলায় কী ফুটফুটে চেহারা ছিল শুনেছে মামাদের মুখে। মামাদের একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ ও। মামার গ্রামের প্রাইমারিতে কয়েকটা ক্লাস পড়েছিল। তারপর যা হয় মামাদের বাড়ির কাজ, বাসনমাজা গোয়াল পরিষ্কার গোবর ঘুটে দিয়ে দিনগুলো পার হয়ে গেছিল।

তারপর একদিন হঠাৎই ওর বিয়ে হয়ে গেল। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ও আগড়ে চলে এল দেবাংশী পরিবারের বৌ হয়ে।

তখন সবার মুখে একটা কথাই শুনতো— মধু ঠাকুরের বউ কী সুন্দরী রূপসী... চোখ ফেরানো যায় না!

লক্ষ্মীরানীর সব আনন্দ স্বপ্ন ভেস্তে গেল। ফুলশয্যায় ওর মোহভঙ্গ হল। এক মাতাল নেশাখোর দেয়াসির ঘরনী হয়েছে ও। শুধুমাত্র ফুলশয্যার রাতটা নয় অন্য কোন রাতে মধু ঠাকুর ওর সঙ্গে থাকল না।

মদ গাঁজা ওকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে তখন। সুস্থজীবনে ফেরা প্রায় অসম্ভব। আর রাতে যখন ও ঘরে ফেরে তখন সহবাসের শক্তি থাকে না।

ছোট্ট একটা ঘোড়ায় চড়ে হাটেবাজারে ঘোরে। মনসার দেবাংশীকে অনেক গ্রামে ঘুরতে হয় সঙ্গে ঢাকবাদ্যি থাকে। মা মনসার গ্রাম ঘোরা অনুষ্ঠানে ভাল আয় হয়। এ ছাড়া নানাজনের মানত জড়িবুটি ওষুধ এসবেরও বেশ চাহিদা— সেখান থেকে আয়ও কম নয়।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে— তুমি পাব্বতীর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলে?

নেশায় বুঁদ মধু বলে— হঁ... কেন্যে... কেন্যে?

—শুনলম তাই বলছি... ও গম্ভীর মেজাজে বলে চলে।

—সতীশবেনের মেয়ে পাব্বতীকে শ্বশুর ঘর থেকে আনতে গেইছিলম তা-তাতে তুর কী অ্যাঁ?

—আমার আর কী! ভাবি তুমার সঙেই বা কুন লাড়ের টান—? কুথা বামুন ঠাকুর কুথা বেনের মেয়ে,—

— কিছু লয় কিছু লয়... সি সব না বুঝেই তুর জেবনযৈবন পার করে দে— বেশি বুঝলে খারাপ হবে।

আসলে সম্বন্ধটা তেমন কিছু ছিল না। পার্বতীর জামাইবাবু মধু ঠাকুরের বন্ধু। সেই সুবাদে বেনেরা খাতির করে... আবার দেয়াসি ঠাকুর তো বটে মা মনসার তাই বেশি ঘাঁটায় না।

লোকমুখে স্বামীর কীর্তিকাহিনী বিস্তারিত শোনে— শুনেছিস্ ঠাকুরের কাণ্ড শুন লো সব... সরামপুর ইস্টিশনে নেমেছে উরা। দেখি কী পাব্বতীর বাক্সটা ঠাকুরের মাথায়। লাজ লজ্জ্যের মাথা খেঁয়েছে—। জঙ্গলের রাস্তায় হাঁটছে মেয়ে মরদের পারা গপ্প জুড়েছে... পাব্বতী হেসে ঢলে পড়ছে ঠাকুরের গায়ে।

লক্ষ্মী কতবার ভাবে পার্বতী কী দেখতে খুব সুন্দর? ওর থেকেও? হয়ত ওর যৈবনটা আকর্ষণ করে বেশি করে। নাহ্ তেমন কিছু নাহ্ ...

এর কিছু পরই সেই বীভৎস ব্যাপারটা... দামোদর পুকুরের পাড় সংলগ্ন বরোজ জঙ্গলের সেই নোংরা কথাগুলো লতিয়ে লতিয়ে চৌকাঠ টপকে ঘরে এসে যায়।

দূরে জঙ্গলের বাইরে মধু ঠাকুরের ঘোড়া দিব্যি চড়ে বেড়াচ্ছে। পার্বতী জঙ্গল থেকে বের হয় হিহি করতে করতে। ওর কোমরে গামছা বাঁধা।

—খ্যামতা নাই ঠাকুরের ... ঠিক আমাদের বুড়টর পারা গ।

একেবারে জলে ঝাপিয়ে পড়ে...। পার্বতীদের অবস্থা পড়ে গেছিল। ওর বিয়েও হয়েছিল দোজবরে। আসল পার্বতীর মতই — গড়িয়ে সোনার পুত্তলি বুড়া বরে বিহা দিলি!

লক্ষ্মীর কাজের শেষ নেই। মনসার মন্দির দালান ধোয়া, বাসনপত্র ধোয়া রান্নাবান্না সব কিছু।

অনেক সময় লক্ষ্মীর মনে হয়েছে পার্বতী চায় না ওকে তবু ছোটে মধুঠাকুর। খোসামোদ করে কত কী উপহার দেয়... আংটি দিয়েছে সোনার। মধুর মাসী— পাঁড়ে ঠাকরুন সব দেখে জানে। লক্ষ্মীর খাটনিটাও দেখে বৈকি! আর মধুর গতিবিধি সেও ওর জানা। রাতে ঘরে ফেরে না— শোয় না। তবু বলতে ছাড়ে না— বউ তোর ছেলে হয় না কেন্যে... উঃ হ কী বাঁজা মেয়ে আনলো মধু!

মনসামন্দিরের আশেপাশের বাগদিপাড়ার খবর ওর নখদর্পণে। বিয়ের বছর ঘুরতেই পতিলালের পুত্রবধূ মা হতে চলেছে। সে পাড়ার বৌ বেটি সব মধুর মাসির কাছে সন্তান হবার ওষুধ নেয়— শনি মঙ্গল কী ভীড় জমে।

সেই দৈব ওষুধ জোর করে লক্ষ্মীরানীকেও গেলানো হয়েছে। দিব্যি পাকাকলার সঙ্গে। লক্ষ্মীরানীর পাড়া বেড়ানি অভ্যেস নেই সময়ও নেই— তবু ও খোঁজ পায়। পতিলালের পুত্রবধূ মানে রবিমাস্টারের বাগদি বউ। রবিমাস্টার জয়পুর প্রাইমারির মাস্টার। বিয়েতে পতিলালের পুত্রবধূ বরের কাছ থেকে কী পেয়েছিল কে জানে! তবে বৌভাতে রবিমাস্টার আংটি দিয়েছিল সোনার।

লক্ষ্মীর কানে আসে পতিলালের ছোটছেলের গান— মন চল যাই ভ্রমণে কৃষ্ণ অনুরাগিনীর বাগানে। গুপিযন্ত্র নিয়ে বাউলশিক্ষা করছে ও।

সেদিন লক্ষ্মী পুকুরঘাটে স্নান সেরে ফিরে চুল আঁচড়াতে বসে। চুলে তেল দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দিতে থমকে যায়।

মাসী গর্জে ওঠে— উ কী গ! তুমি চুল বাধছ? তেল দিচ্ছ? ক্যানে আমার কথাটা কানে যায় নাই?

—ক্যানে মাসী?

—সিদিন রানীবহালের চিঠিট এল... কানে শুনলে সব। কালা নাকি গ?

—কুন চিঠি!

— মধুর খুড়ো মরেছে... ঘাট কামান ছাদ্দ পর্যন্ত পালতে হয়। তুমি মধুর বৌ যাকে বলে ধম্মপত্নী!

লক্ষ্মীরানী সিঁদুর মোছে... জানতাম না মাসী... আবার উত বাইরে খেঁয়ে এল কাল।

—বাইপে খাক্ সিত নিরিমিষি... পুরুষের অত দোষে না।

লক্ষ্মী রানীর চমক ভাঙে। কাল দূর থেকে মধু ঠাকুরের মুখে দেশী মদের গন্ধ... সঙ্গে চাট ছিল নিশ্চয়ই। মানে পিঁয়াজ রসুন চাই কী মাংসের ছাট্... সেসব পুরুষকে দোষে না বোধহয়।

এখন কিছুদিন পার্বতী শ্বশুর ঘরে। সাধুদের দোকানে এখন যায় না মধু। শুধু কলকেতে দম্ দেওয়ার মাত্রাটা বেড়েছে।

(২)

রোজ সন্ধ্যায় জ্বর আসে লক্ষ্মীরানীর। স্পুটামে রক্ত ইদানীং আসছে না ঠিকই তবে পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না। নার্স এসে দুটো ইনজেক্শান দিয়ে গেছে।

মধুঠাকুর ক্ষেপে যেত পঞ্চমীতে। বগা পঞ্চমীতে বিশেষ করে ওর মাথা ঠিক থাকতো না। কত বলিদান প্রায় শ'খানেক। তারপর টাকাপয়সা ফলমিষ্টি বাতাসা। বলির আগে মেজাজটা ঠিক রাখতো— ত্রিশটা বলি ও নিজে দিত বাকি বলি দিত কালুডোম। চারদিকে ভক্তরা করুণভাবে মাকে ডাক্তো— মা, মাগো করুণাময়ী দেখো মা... ড্যাং, ড্যাং... ড্যাংমো...

লক্ষ্মী সেদিনটা মধুর চোখে তাকাতে পারতো না। ওর চোখে লোভের সর্পিল ছায়াগুলো কেমন কিলবিল্ করতো!

ভুল করে মানে অনেকটা আবেগ বসে ওকে বুকে টানতো। তারপর এক সময় ওর হাত দুটো শিথিল হয়ে আসতো!

কারণ ওর ওসব কদর্য বিকৃত কামনা ধারণ করার ক্ষমতা লক্ষ্মীর নেই। তাছাড়া মধু লক্ষ্মীকে চায় না এটা নেহাৎ উত্তেজনা। না হলে ল'পুকুরের পাড়ে ওসব ঘটে...

ঐ যে যেখানে চালুনি পাথরগুলো পড়ে আছে। সেখানেই মেতে উঠেছিল মধুঠাকুর। আর তখন কি সূয্যি ডুবেছিল না লজ্জায় মুখ ঢেকেছিল। ধূসর বেশে আসছিল সন্ধ্যা। আর তখনই আঁকুড়েদের বউ ভাদুকে জাপ্টে ধরে—

মধুর গতিবিধি ওর চালচালন সব মুখস্ত লক্ষ্মীর। গত পনের বছর দেখে আসছে। ওর রুচিতে প্রেম ভালবাসা মানে ঝোপের ধারের সেই শরীরী কসরত। একটু ঠোটের কোণে হাসি দেখলে হয়।

তুই হাসলি কেন বল্— হাসলি যদি মন মজ্লি, তবে ঝোপের ধারে চল্ ...। এই যেন বাঁধাগত্ ...।

লক্ষ্মীর কাছে এসে যেন মধুর প্রত্যাশাগুলো ঘা খেয়েছে। বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলায় শুকজোড়া গেছিল। গ্রাম সম্পর্কে দিদিমা পুকুর ঘাটে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করে— হ্যাঁ লো তুর বর ফুলসজ্জের রেতে কী দিল? লক্ষ্মী লজ্জাবতী হয়ে ভড়ং করে।

—নিশ্চয়ই আংটি দিয়েছে সোনার? ...মৃদু ঘাড় নেড়েছিল ও।

—তার বদলে তুই কী দিলি!

দিদিমা যে প্রসঙ্গ শুনলে খুশি হত সে প্রসঙ্গ ধামাচাপা পড়ে যায়। মাতাল নেশাগ্রস্ত লোকটা কিছু দেয়নি ওই রাতে... নেয়নিও কিছু। সামাল সামাল করে যেটুকু মৃগমদ ও যুগিয়ে রেখেছিল সেটুকু দস্যুর মত লুটে নিতে তৎপর হয়নি।

কেউ বুঝুক না বুঝুক সেই ওর অভিনয় শুরু। আর সেই থেকে মধুর বৌ-এর পার্টটা করার জন্য ও চুক্তিবদ্ধ বোধহয় ওপরবালার সঙ্গে... সেই শেষ দিন পর্যন্ত...

যাক্ মধু ঠাকুর শেষ পর্যন্ত বেশিদিন বাঁচেনি। অত অত্যাচার মদ গাঁজা... মেয়েছেলের নেশা। শেষে কঠিন খারাপ রোগ—

মানুষ মরে যেতে অনেক পালন বিধি নিষেধ— মুখাগ্নি অশৌচ কত কী। মধু সন্তানহীন... তাই সব দায়িত্ব মধুর বৌ-এর।

আবার মধুর অকাল মরণও তো বৌ-এরই দায়।

—আরে বাবু বউটই অকালে খেলে মরদটাকে—

অবশ্য কেউ কেউ সান্ত্বনা দিতে আসে ওকে।... সি কী... শরীলে অত্যাচার অনাচার করলে কী নুকে বাঁচে গ— বাঁচে না।

—আরে বাবু সেও তো বউ এর লেগে। যত হতচ্ছেদ্দা সোয়ামীকে... এতটুকু টান ছেল না। সে টান থাকলে ঠাকুর হেথা হোথা ছুটে বেড়ায়। এতদিন যে গেল... তবু নুকটকে মাগ্‌বশা হতে দেখলাম না— ই কী গ— আশ্চিয্যি।

স্যানিটরিয়ামের বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসব ভেবে ওর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি খেলে। আরে এসব তো অভিনয় শেষের পুরস্কার হাততালি।

হ্যাঁ, শেষে পাঁড়ে ঠাকরুণ ওকে রাখতে চাইলে না। এবার নতুন পুজোরী আসবে। লক্ষ্মীর এক মাসতুতো দিদির ননদের বাড়ি জয়পুরে— সেই সন্ধ্যারানী পেটভাতায় রাখবে বলে নিয়ে গেল। মুচকি হেসে লক্ষ্মীকে বলে তুমাকে যাতে পোকায় না কাটে— তা দেখবো...

—সেটা কী?

—তা জান না... এইত ভাতার খোয়ালে কদিন যাক্... এমন সবুজ খেত কত পঙ্গপাল টেনে আনবে... বলেই ওর থুত্‌নি নাড়া দেয়।

লায়েক বাড়িতে প্রথম এসে কদিন স্বস্তিতে ছিল ও। তারপর সব কাজের বোঝা— বাসনমাজা, ঘরধোয়া, রান্না করা কাপড় কাচা সব কাজ এসে চাপল। খাওয়া বলতে দুপুরে দুটো ভাত তরকারি সেও যৎসামান্য। রাতে গুড় মুড়ি। বামুনের বিধবা বলে কথা! রাতে ভাত নৈব চ নৈব চ। তারপর আছে একাদশী ইত্যাদি পালন। আর এত খাটুনি!

এরি মাঝে দৈব দুর্ঘটনা। বাড়ির কর্তা লায়েক বাবু কলকাতা থাকেন। উকিল মানুষ কাজে ব্যস্ত। প্রতিমাসে একবার এ বাড়ি আসেন।

লক্ষ্মী কাজের চাপে পোড়া শরীরের দিকে নজর দিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য একদিন ওরই ওপর নজর পড়লো...

সারা সপ্তাহ কোর্ট কাছারি মামলা মোকদ্দমার একঘেয়েমি থেকে মাঝে মাঝে মুখ পাল্টালে ক্ষতি কী। তাতে সন্ধ্যারানীর জায়গায় লক্ষ্মীরানী এসে গেলে দোষ কী?

রাত্রিবেলায় লোমশ শরীরের আদর সোহাগে আঁতকে ওঠে ও। সে এক কেলেঙ্কারি... খুব ভোরের গাড়ি ধরে নিতাই লায়েক কলকাতা চলে যায়।

সন্ধ্যারানী গজ গজ করে।

—পুরুষের কী দোষ? মেয়েদের সাবধানতা দরকার... কামাচার কী সময় মেনে চলে...!

লক্ষ্মীরানী কেঁচো হয়ে গেছিল। এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। ভেবেছিল ও পালাবে, কিন্তু কোথায়? লক্ষ্মীর পড়াশুনা সামান্য। তবু কার যেন গানে ও শুনেছে— জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা!

ওমনি এক বহ্নিশিখা লায়েক বাবুর মেয়ে মালবিকা। ও গর্জে ওঠে— রক্ষকই যদি ভক্ষক হল তবে আনা হলো কেন? সন্ধ্যারানী ওর কলেজে সংগঠন করা মেয়ের উপর কথা বলতে সাহস করে না।

কিন্তু প্রদীপের সলতের শিখা যেন ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছিল। লক্ষ্মীরানীর মনও ভেঙ্গে গেছিল।

এরপরই রোগের আভাস... লক্ষ্মীরানীর আবাস পাল্টে গেল। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে কিছু ওষুধ ইনজেক্‌শান দিল— রক্তক্ষরণ কিছু কমলো। শেষে গোয়ালপাশে ছিটেবেড়ার ঘরে ঠাঁই হল লক্ষ্মীর।

দুঃখকষ্ট কাকে জানায়। কবিরাজ বলেছে বোকাপাঁঠার গায়ের গন্ধ ক্ষয়রোগের উপকারক। তাই গোয়ালঘরই নিরাপদ।

(৩)

রীতিমতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল লক্ষ্মীর চেহারাটা। নিরাময় স্যানাটোরিয়ামে এসে ওষুধ খাবার পেয়ে একটু সতেজ দেখাচ্ছিল ওকে সাময়িকভাবে।

দূরের শালমহুয়ার গাছপালায় ওর দৃষ্টিটা ছড়ানো। এক কাপ হরলিক্স আর কটা বিস্কুট চিবুতে চিবুতে বারবার ওর মা'র কথা মনে পড়ছিল লক্ষ্মীরানীর। আর চোখদুটো বেয়ে জল গড়াচ্ছিল...

এই তো সেদিন.,. সপ্তাহ তিনেক আগে ওকে ধরাধরি করে অ্যাম্বুলেন্স চড়াচ্ছিল। বেশ ভিড় জমে গেছিল। লোকজনের মুখে যে কথা শোনা যাচ্ছিল।

—উ যে মধুঠাকুরের বৌ গ— উ'র মরদ ত মনসার দেবাংশী ছিল। তা, মা মনসার দয়াতে যদি বেঁচে যায় ই যাত্রা... না হলে হত ক্ষয় রুগ বাবু— ভাল খাবার ভাল চিকিচ্ছে... ঝি চাকরানির জেবনের আর কী দাম!

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত কী ভাবনা এসে যায়। মধুঠাকুরকে তো স্বপ্নেও দেখে না ও। হাতছানিও দেয়নি... আবার লক্ষ্মীর ছায়াও মাড়াতো না সে। তবু লক্ষ্মীর পরিচয়ে ও আসবেই... জড়িয়ে আছে।

অথচ লক্ষ্মী কোথাকার কে?

একটা বিষণ্ণ হাসির মধ্যে বিবর্ণ স্মৃতি খেলা করে। স্বামীর সঙ্গে শুলো না... ওর সন্তানও এল না... কোন টানও ছিল না। তবু... তবু বিয়েটা তো হয়েছিল নাকি! হ্যাঁ... হয়েছিল...। ওর মনটা বেফাঁস কথা বলে বসে— তবে মধুর সঙ্গে নয়, মন্তরের সঙ্গে! হ্যাঁ... গুচ্চের মন্ত্রের সঙ্গেই ওর বিয়ে! যার জন্য ও মধুর জন্মজমান্তরের বৌ!

যে পালায় ও অভিনয় করছে তার শেষ দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

হয়ত ক'দিন পরই জয়পুর থেকে লোকজন এসে যাবে খবর পেয়ে। বাইরে তো নিয়ে যেতে পারবে না। হাসপাতালের একটা বদ্ধ এলাকার বদ্ধঘরে দাহকার্য সমাধা হবে।

যাত্রীরা গ্রামে ফিরে গিয়ে বলবে— হঁ গ দেখলাম যে মধু দেবাংশীর বৌকে দাহ করলে সবশেষে... পুড়ে ছাই।

হয়ত অবশিষ্ট ছাই-এর একটা নামকরণ হবে— মধুর বৌ এর চিতার ছাই ...।

অধিকার চেতনা

মানবাধিকারের রাজনীতি

দীপংকর চক্রবর্তী

এক

সম্প্রতিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রাঙ্গণে মানবাধিকার প্রসঙ্গে নানা তত্ত্ব, বিতর্ক ও কর্মকাণ্ড বেশ খানিকটা সাড়া জাগিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা মূলত একটা ইতিবাচক প্রবণতা। কারণ যতো বেশি সংখ্যক মানুষ মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে এবং তা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে, ততোই শ্রেণীসমাজে লাঞ্ছিত ও পদদলিত মানবসত্তা পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবে, মানবাধিকার রক্ষার বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রচিত হবে। কিন্তু শ্রেণীসমাজে কোনো কিছুই যেহেতু শ্রেণী-উর্ধ্ব নয়, সব কিছুরই যেহেতু রয়েছে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীগত ভিত্তি, তাই মানবাধিকারকেও একটি শ্রেণী উর্ধ্ব বিষয় হিসেবে বিবেচনা করাটা হবে মৌলিক ভ্রান্তি, কেননা বিষয়টিকে কে বা কারা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে, তা নির্ভর করবে তার বা তাদের মৌলিক শ্রেণীগত অবস্থান ও স্বার্থের ওপর। একথা মনে না রাখলে মানবাধিকার বিষয়টিকে গণস্বার্থবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলরা সহজেই গুলিয়ে দেবে, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে। তাই মনে রাখতে হবে, প্রদীপের নিচেই যেমন অন্ধকার থাকে, ঠিক তেমনি মানবাধিকার প্রসঙ্গে চেতনাবৃদ্ধির পেছনেও থেকে যেতে পারে বিভ্রান্তি। সামাজিক ও জাতীয় বৈষম্য সৃষ্টি ও বজায় রাখতে যারা তৎপর, সচেতন বা অচেতনভাবে তাদের সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সম্পন্ন চক্রান্তের শিকার হয়ে যাওয়াটাও সেক্ষেত্রে বিচিত্র হবে না। সেকারণেই মানাবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর ইতিবাচক প্রবণতাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, প্রকৃত সমাজ চেতনার ওপর।

দুই

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া দরকার যে, মানবাধিকার বিষয়টি কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, কোনো দেশের সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিকাশের স্তরের ওপরেই মূলত তা নির্ভরশীল। সমাজ নিরপেক্ষ এবং সর্বকালে ও সর্বদেশে প্রযোজ্য অপরিবর্তনীয় 'বিশুদ্ধ' মানবাধিকার বলে কিছু থাকতে পারে না। মানবসমাজের বিকাশের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যে, উৎপাদিকা শক্তির ধারাবাহিক বিকাশের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি অন্যান্য বিষয়ের মতো মানবাধিকার সম্পর্কেও মানুষের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। মানবাধিকার সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা অতীতেও ছিল, কিন্তু বাস্তব সামাজিক ভিত্তির অনুপস্থিতিতে তা বাস্তবায়িত বা বিকশিত হতে পারে নি। ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের পটভূমিকায় শিল্পবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল, তার প্রেক্ষিতেই কেবল সম্ভব হয়েছিল সনাতন সামন্ততান্ত্রিক রাজকীয় ও ধর্মীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানো, জন্ম নিয়েছিল মানুষের সহজাত অধিকার ও মানুষে মানুষে সাম্য সম্পর্কে ধারণা। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছিল মানবাধিকারের ধারণা। তার পরবর্তীকালে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এই ধারণা ক্রমশ বিকশিত হয়েছে নানা দেয় ও কালের প্রেক্ষিতে, এবং প্রমাণিত হয়েছে মানবাধিকারের ধারণা সমাজ-নিরপেক্ষ বা বিমূর্ত ও শাশ্বত নয়, বরং ক্রমবিকাশমান ও সতত পরিবর্তনশীল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে মহাযুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষত নৃশংস ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের দুঃসহ স্মৃতি সারা পৃথিবীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল মানবাধিকার প্রসঙ্গে একটি সর্বসম্মত ন্যূনতম কর্মসূচি গড়ে তোলার জন্য। মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ। এই সময়কালেই সারা পৃথিবীতে একশোটিরও বেশি দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার পথে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ফলত সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছিল মানবাধিকারের বাস্তবায়নের পথে। এই সনদের ভিত্তিতে পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে স্থাপিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে যখন মানবাধিকার সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র প্রণয়নের জন্য আলাপ-আলোচনা চলছিল, তখনই ধরা পড়েছিল যে, পাশ্চাত্যের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ও সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে এ বিষয়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যদিও 'সম্পত্তির অধিকারের' প্রশ্ন মতানৈক্য থাকার কারণে মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষর করেনি, তবু এই সনদকে অন্য সব প্রশ্নে তারা সমর্থন করেছিল। সেই সনদেই মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে কাজের অধিকার, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। চুক্তিপত্র প্রণয়ণের সময় সমাজতান্ত্রিক ও সদ্যস্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই চুক্তিপত্রে মানবাধিকারের তালিকায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই ধারাবাহিকতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পাশ্চাত্যের দেশগুলি তার বিরোধিতা

করেছিল। ফলে পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে কৃত্রিমভাবে আলাদা ক'রে রেখে দুটি স্বতন্ত্র চুক্তিপত্র প্রণীত হয়েছিল। সেগুলি ১৯৬৬-এ গৃহীত ও ১৯৭৮-এ কার্যকরী হয়েছিল। এরপর ষাটের দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তাদের বিকাশের অধিকারকেও মানবাধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে, পাশ্চাত্য দেশগুলি তারও বিরোধিতা করেছিল এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ১৯৮৬-তে বিকাশের অধিকারকেও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করেছিল।

এরপরই পাশ্চাত্যের দেশগুলি এক নতুন চাল দেবার চেষ্টা করেছিল। বিকাশের অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যেকার সম্পর্ককে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে তারা ঘোষণা করেছিল, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বাধীনতাই হচ্ছে বিকাশের পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক অধিকারকে তারা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে একই আসনে বসাতে অস্বীকার করেছিল। যদিও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে "ভয় ও দারিদ্র থেকে" প্রতিটি মানুষের মুক্তিকে লক্ষ্য হিসেবে স্থাপিত করা হয়েছিল, তবু তারা কার্যত সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিটি দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় বিকাশের অধিকারকেই কার্যত অস্বীকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের বক্তব্যকে মেনে না নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই বক্তব্যই তুলে ধরেছিল যে, বিকাশের অধিকারের প্রকৃতই যদি কোনো পূর্বশর্ত থাকে, তবে তা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নয়, বরং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। কেননা প্রত্যেক মানুষকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে হলে প্রথমেই চাই প্রত্যেক দেশের ভাগ্য সেই দেশের মানুষেরই হাতে তুলে নেবার অধিকার, এজন্য যে সব দেশ পরাধীন, প্রথমেই তাদের চাই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও সম্পদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। আর যেসব দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে, তাদের চাই তাদের স্বাধীনতাকে সংহত ও জোরদার করার অধিকার, এবং সেজন্যই তাদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার অবশ্যই সেইসব দেশে প্রয়োজনীয়। ব্যাপক গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার সে সব দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথে অবশ্যই ভাবগত উপাদান হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, খাদ্য বস্ত্রের সংস্থান না থাকলে সেইসব নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবে কার্যকর করা যায় না, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত কোনো দেশে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন করা যায় না। দারিদ্র্য ও সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরণই তাই কার্যত হয়ে দাঁড়ায় মানবাধিকার বিকাশের পূর্বশর্ত। এই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৮৬তে রাষ্ট্রসংঘের তেহরান ঘোষণায়। "অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জন না ক'রে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা যায় না।" এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই আরো বিকশিত ক'রে ১৯৭৭-এ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত এক সিদ্ধান্তে (নং ৩২/১৩০) বলা হয়েছিল : মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে জাতিবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশবাদ, বিদেশী আগ্রাসন-দখলদারি ও আধিপত্য এবং একই সঙ্গে নিজ দেশের সম্পদ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের ওপর সেই দেশের সার্বভৌম অধিকারের অস্বীকৃতি প্রভৃতি কারণে ব্যাপক মানুষের মানবাধিকার সমষ্টিগতভাবে যেভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে, সেগুলির সমাধানের ওপরেই রাষ্ট্রসংঘ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে। ওই সিদ্ধান্তে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের ও বজায় রাখার ওপর সমান গুরুত্ব দেবার কথা বলে, এবং প্রথমগুলি অর্জন না করে দ্বিতীয়গুলিকে যে বাস্তবায়িত করা যায় না, সেই দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করা হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, মানবাধিকারের ধারণাটি সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশপর্বে যখন মানবাধিকারের দাবি প্রথম বাস্তবায়িত হতে থাকে, তারপর দুশো-আড়াইশো বছর কেটে গেছে, মানবাধিকারের ধারণা আজ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মানবাধিকার রক্ষা বলতে আজ আর শুধু মানুষের ব্যক্তিগত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষাই বোঝায় না, একই সঙ্গে বোঝায় কোনো দেশ বা জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বিকাশেরও অধিকার। মানবাধিকারের ধারণার মধ্যে আজ যেমন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানবাধিকার। মানবাধিকারের ধারণাটি এভাবে বিকাশের মধ্যে না দেখে যারা সেই পুরানো সংকীর্ণ ধারণার মধ্যে সীমিত রেখে মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলে, তারা আসলে প্রকৃত মানবাধিকারের বিকাশের ও বাস্তবায়নের বিরোধিতা ক'রে। তথাকথিত এক 'বিশুদ্ধ' মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় এবং কার্যত পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ও তাদের কোটি কোটি মানুষকে চিরস্থায়ী পশ্চাৎপদতার নিগড়ে আবদ্ধ রাখার সুগভীর চক্রান্তেরই সচেতন বা অচেতন হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

তিন

আমরা আগেই দেখেছি, পাশ্চাত্যের দেশগুলি দু'দিক থেকে মানবাধিকারের ধারণাটিকে একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত ক'রে রাখতে চায়। একদিকে তারা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকেই মূলত মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে কার্যত অস্বীকার করতে চায়। অন্যদিকে তারা মানবাধিকারের সমষ্টিগত সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিভিত্তিক অধিকারের ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রথমটির মূল উদ্দেশ্য সারা দুনিয়া জুড়ে এই দেশগুলি যে অর্থনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, তাকেই টিকিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করা। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসবো। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য দেশগুলির অতীত বাস্তব পরিস্থিতি জাত মানসিকতাকে সেই বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে বাস্তবত সাদৃশ্যহীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া। এ বিষয়টিও বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্মীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে রেনেসাঁর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিমানসের যে বিদ্রোহের মানসিকতা রূপ পেয়েছিল, তা থেকে জন্ম নিয়েছিল ব্যক্তিগত অধিকার ও ব্যক্তিগত যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনার ধারণা। রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরাটাই তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইউরোপীয় আধুনিক-মনস্ক মধ্যবিত্ত সমাজের মূল কর্মসূচি। বিকাশমান মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের আকাACþy এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ক্রমশ সংহত রূপ নেয়। ইউরোপের তৎকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে ব্যক্তিসত্তার মুক্তির এই আকাACþy একটি প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগীয় ইউরোপের সেই সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির যেহেতু মূলত কোনো মিল নেই, তাই তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবাধিকারের ধারণাটিকে একপেশে ও কৃত্রিমভাবে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ারও কোনো যুক্তি নেই। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ব্যাপক মানুষের সামনে যেখানে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড় থেকে ব্যক্তির মুক্তির চেয়েও অনেক বড়ো সমস্যা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের হাত থেকে সমগ্র দেশের বা জাতির মুক্তি। কাজেই পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতাজাত সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবাধিকারের ধারণাকে কৃত্রিম ও যান্ত্রিকভাবে মূলত পৃথক চরিত্রের সমাজ, সামাজিক বিকাশের স্তর ও মূল সমস্যা বিশিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে চাপিয়ে দেবার কোনো যুক্তিই আদৌ নেই। অথচ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলি তো বটেই, এমনকি ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির এধরনের সংগঠনগুলি পর্যন্ত ঠিক সেই কাজটাই মূলত করে চলেছে। মানবাধিকার সম্পর্কিত উপনিবেশিকতাবাদী মানসিকতাকে বর্জন করে দেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃজনশীল ও সমালোচনামূলক মানসিকতা অর্জন করতে না পারলে তাই এসব দেশের মানবাধিকার আন্দোলন শৈশবাবস্থা ঘুচবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

১৯৬৬-তে গৃহীত ও ১৯৬৭ থেকে কার্যকরী ওপরে উল্লিখিত চুক্তিপত্র দুটির প্রস্তাবনায় কিন্তু সঠিকভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে: ''আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ঘোষণা মতো মুক্ত মানুষেরা তখনই ভয় ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে, যখন প্রত্যেকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং একই সঙ্গে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুরি ভোগ করার মতো পরিবেশ তৈরি করা যাবে।'' ''ভয় ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি''র এই এই পরিবেশ তৈরির কাজটি সম্ভব করার জন্যই প্রাথমিকভাবে দরকার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের নিগড় থেকে মুক্তি। তৃতীয় বিশ্বের মানবাধিকার আন্দোলনকে অতি অবশ্যই এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, একে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

চার

যদি প্রশ্ন করা হয়, মানুষের সবচেয়ে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার কোনটি, তবে অবশ্যই তার উত্তর হবে : জীবনের অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার। দু'শো বছর আগে মানবাধিকার সম্পর্কিত চেতনা ও দাবি যখন সবেমাত্র সংহত রূপ নিতে শুরু করেছে, তখন সেই ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তাই সমস্ত মানুষকে সমান বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ''জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের অন্বেষণ''-কে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৮-এ গৃহীত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদেও প্রত্যেকের ''জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার'' অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। জীবনের এই অধিকার নিশ্চয়ই শুধুমাত্র খাওয়া-পরার অধিকার নয়, কিন্তু খাওয়া-পরার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার বাস্তবায়িত না করতে পারলে, ''ভয় ও দারিদ্র্য'' থেকে মানুষকে মুক্ত করার মতো পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে প্রকৃত অর্থে কার্যকরী করা যায় না, বাস্তবায়িত করা যায় না। আর সেজন্যই মানুষের বাঁচার সেই প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ''ভয় ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির'' উপযোগী পরিবেশ তৈরির অধিকার, প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সার্বভৌমত্ব, এবং দেশের সমস্ত সম্পদ ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার। মানবাধিকার সম্পর্কিত আধুনিক ধারণা এই বিতর্কাতীত সত্যকেই যে স্বীকার

করে নিয়েছে, রাষ্ট্রসংঘ ১৯৪৮ পরবর্তীকালে মানবাধিকার প্রসঙ্গে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও চুক্তিপত্রগুলি তারই প্রমাণ বহন করছে। তাই আজকের দিনে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ১৯৪৮-এর সনদে বিধৃত সেই ধারণার মধ্যে সীমিত করে রাখলে চলবে না, বিকাশের মধ্যে দেখে তার সর্বাধুনিক বিকশিত বর্তমান রূপকেই স্বীকৃতি দিতে হবে, এবং তার ভিত্তিতেই মানবাধিকার আন্দোলনের নীতি ও কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

কেননা, আগেই বলেছি, মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে বাস্তবায়িত ও রক্ষা করাটাই আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণায়ক মানবাধিকারে পরিণত হয়েছে। আজও পৃথিবীতে রঙবেরঙের উপনিবেশবাদ ও জাতিগত বৈষম্য, বিদেশি আগ্রাসন, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ চলছে। এইসব দেশ এখনও বিভিন্ন পদ্ধতিতে শোষিত হচ্ছে। তাদের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, সম্পদ, উৎপন্ন দ্রব্য ও আয়ের সিংহভাগ দখল করে নিচ্ছে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এবং এইসব দেশের মানুষদের থাকতে হচ্ছে অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যুর হার কমছে না। ফলত এইসব দেশের মানুষের বাঁচার অধিকারই আক্রান্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পরিসংখ্যান থেকে ধরা পড়ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে পৃথিবীতে যে প্রায় দেড়শোটি প্রধান প্রধান আঞ্চলিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই হয়েছে এইসব দেশগুলিতে, যাতে কামানের খোরাক হয়ে মারা গেছে অন্তত দু'কোটি লোক। আর এগুলির মূলেও প্রধানত ছিল বিদেশি আগ্রাসন, হস্তক্ষেপ বা উস্কানি।

অর্থনৈতিকভাবেও এইসব দেশের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, উত্তর গোলার্ধের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে দক্ষিণ গোলার্ধের পিছিয়ে থাকা দেশগুলির ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। এ দেশগুলির বিদেশি ঋণের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে চার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে, যা তাদের মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি। রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান অনুসারে, এইসব দেশের অন্তত একশো কোটি লোক চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে, ৫৫ কোটি লোক অনাহারে ধুঁকছে আর প্রায় দেড় কোটি লোক প্রতিবছর অনাহারে মারা যাচ্ছে। আর এসবেরই মূলে রয়েছে পাশ্চাত্যের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণ ও লুণ্ঠন। অতীতে এইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশ উপনিবেশ স্থাপন করতো জলদস্যুর কায়দায়, কামান ও বন্দুকের সাহায্যে। আজ যখন প্রত্যক্ষ উপনিবেশন স্থাপন করাটা বাস্তবে সম্ভব হচ্ছে না, বা সম্ভব হলেও তা তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে, তখন তারা ধূর্ততার সঙ্গে অনুসরণ করছে পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক-সামরিক-সাংস্কৃতিক ও পরিণতিতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পন্থা, নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মপন্থা। এভাবেই তারা যখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত এবং অতি অবশ্যই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে, তখন পিছিয়ে থাকা দেশগুলির পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ থাকতে পারে না। আর এভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ব্যাপক মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাই যখন ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তখন এই অধিকারগুলি অর্জন ও রক্ষা করার স্বার্থেই অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে মানবাধিকারের দাবি ও আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে স্থাপিত করা। পারস্পরিক বা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও চুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে বাধ্য করা হচ্ছে নীতি ও কর্মপন্থাকে পরিবর্তিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে, এবং ফলত বিপন্ন হয়ে পড়ছে এসব দেশের গরীব মানুষেরা, ''ভয় ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি''র লক্ষ্য হয়ে পড়ছে দূরায়ত। আর নয়া উপনিবেশবাদী বন্ধনে আবদ্ধ এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার ও তাকে কার্যকরী করার সাহস ও ক্ষমতাও হারাচ্ছে। সে কারণেই যে দেশগুলি পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আগ্রাসন ও নিয়ন্ত্রণের দুনিয়াজোড়া রাজনীতি ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে বহু ক্ষেত্রে সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল, তারাই আজ পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছে না, বরং নতজানু হয়ে পড়ছে। ফলত রাষ্ট্রসংঘ কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ছড়ি ঘোরানোর মঞ্চে পরিণত হয়েছে। অতি সম্প্রতি ইরাকে রাষ্ট্রসংঘের উর্দি পরে মার্কিন সেনাবাহিনীর হানাদারি ও নৃশংস কার্যকলাপ, বসনিয়া-সোমালিয়া-লিবিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে মার্কিন স্বার্থে রাষ্ট্রসংঘের ন্যক্কারজনক ভূমিকা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতামত প্রকাশের কোনো অধিকার কার্যত নেই। আর ট্রাজেডি এটাই যে, এসব দেশের মানবাধিকার কর্মীরা, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, দেশে দেশে ব্যক্তির মতামত প্রকাশের অধিকার প্রভৃতির বিরুদ্ধে সঠিকভাবেই প্রতিবাদ জানালেও, সারা বিশ্ব জুড়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ যেসব দেশে বাস করে, তাদের এই রাজনৈতিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে তারা মূলত নীরব ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছেন। এভাবেই কি তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে বর্ণিত ''ভয় ও দারিদ্র্য'' থেকে মানুষের মুক্তির উপযোগী পরিবেশ তৈরির লড়াই চালাতে পারবেন?

পাঁচ

বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের ব্যাপক মানুষকে স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে অজস্র পন্থায়। প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, পৃথিবীতে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রায় নব্বই শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করছে উত্তর গোলার্ধের চারটি সংবাদ সংস্থা। এই সংবাদমাধ্যমগুলি এবং তৎসহ শত শত সংবাদপত্র ও পত্রিকা, ডজন ডজন বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র সারা পৃথিবী জুড়ে যে বিশাল জাল বিস্তার করেছে, তৃতীয় বিশ্বের ব্যাপক মানুষের ভাবনা-চিন্তা-মতামত তার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ভূমিকা ও পিছিয়ে-পড়া দেশগুলির কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষের অভিমতকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করে একই ছাঁচে আবদ্ধ করা হচ্ছে। উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে তিয়েনআনমেনের ঘটনা পর্যন্ত সবক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করছে ছাঁচে-ঢালা এই অভিমত। সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করে কীভাবে বিশ্ব-জনমতকে প্রভাবিত করা যায়, ইরাক যুদ্ধের সময় তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কুয়েতে ইরাকি দখলদার বাহিনী কর্তৃক শত শত শিশু হত্যার যে কাহিনী ছড়িয়ে বিশ্ব জনমতকে ইরাকের বিরুদ্ধে প্রবাহিত করা হয়েছিল, এমনকি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল পর্যন্ত যে কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, সে কাহিনীটি পুরোপুরিই ছিল মনগড়া, গভীর পরিকল্পনা প্রসূত চক্রান্তের ফসল। ১৯৮৯-এ চীনের তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে 'গণতন্ত্রকামী' শক্তির ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ঘটনার বিশ্বব্যাপী প্রচারের ফলেই তার বিরুদ্ধে, সঠিকভাবেই, প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ন্যক্কারজনক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর নেমে এসেছিল ১৯৮০-তে দক্ষিণ কোরিয়ার কুয়াংজোতে। ধনতান্ত্রিক সংবাদমাধ্যম কিন্তু সেই ঘটনার ভয়াবহতা চেপে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়েছিল, ফলে বিশ্ব জনমত তার বিরুদ্ধে তেমনভাবে ধ্বনিত হয়নি। আরও আগে, ষাটের দশকে ভিয়েতনামে মার্কিনি আগ্রাসনে নিহত শত শত ভিয়েতনামী মানুষের নদীতে ভেসে যাওয়া আলোকচিত্রকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলাকালীন নৃশংস হত্যাকাণ্ড হিসেবে প্রচার করাও এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে।

সমস্ত ধরনের সংবাদমাধ্যমের ওপর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির এই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের ফলে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে ব্যাপক মানুষের প্রকৃত সংবাদ ও তথ্য জানার অধিকার অর্থাৎ সত্যকে জানার অধিকারকেই হরণ করা হচ্ছে, সত্য ও ন্যায়বিচারের পক্ষে মানুষের দাঁড়াবার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তথ্য গোপন ও বিকৃত করে এবং মতামতকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াবার অধিকারের ওপর ন্যক্কারজনক এই আক্রমণের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে মানবাধিকার কর্মীরা কি সত্যি সত্যিই মানবাধিকার অর্জনের পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন? বিশেষত আন্তর্জাতিক সনদে প্রকৃত তথ্য জানার অধিকারকে যখন স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে?

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মানুষের অধিকারের ওপর ধনতন্ত্রের আক্রমণের ধারাবাহিকতা শুধুমাত্র সংবাদ বা তথ্যের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকেনি, তা প্রসারিত হয়েছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। গণমাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে পাশ্চাত্যের রুচি ও পছন্দমতো খাবার, ফ্যাশন ও গান, এবং সর্বোপরি, পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র সারা পৃথিবীর মানুষের ঘরে ঘরে পর্যন্ত এমনভাবে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যে, দেশীয় সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে পিছু হটতে ও জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। শুরু হয়েছে পাশ্চাত্য থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এক 'রুচি-বদলে'র প্রক্রিয়া, ব্যাপকতা ও প্রতিক্রিয়ার বিচারে মানব-ইতিহাসে যা এককথায় নজিরবিহীন। দক্ষিণ গোলার্ধের অভিজাত ও আলোকপ্রাপ্তরা এবং শিক্ষিত-মধ্যবিত্তদেরও একটা বড়ো অংশ এই 'নতুন' রুচিকে লুফে নিচ্ছে এবং নিচুতলার ব্যাপক মানুষের মধ্যেও তা ছড়িয়ে দেবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। এক দেশের সভ্যতা থেকে অন্য দেশের সভ্যতায় সংস্কৃতির নতুন নতুন রূপ ও পদ্ধতি পরিবাহন স্বাভাবিক ঘটনা হলেও এই প্রক্রিয়ার পরিণতিতে প্রাচ্য সভ্যতার প্রেক্ষিতে যুগের পর যুগ ধরে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির রূপ ও মূল্যবোধকে উৎপাটিত করে দিয়ে তার জায়গায় যদি পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে স্থাপিত করা হয়, তবে সেটা সেই দেশের পক্ষে মারাত্মক সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি করে, এবং মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকারের ওপর ভয়াবহ আগ্রাসন হিসেবে কাজ করে। সাংস্কৃতিক উপনিবেশিকতার এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাই দেশীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার এবং তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করার অধিকার অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। না হলে 'দুনিয়াজোড়া এক সংস্কৃতি'র স্লোগান ও কর্মপন্থা আসলে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার ধ্বংস ডেকে আনতে বাধ্য। তাই সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই বিভিন্ন দেশের ও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে তীব্রতর ও ব্যাপকতর করে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং আজকের দিনে মানবাধিকারের বিকশিত ধারণার প্রেক্ষিতে এই সাংস্কৃতিক অধিকারকে তাই মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ছয়

এই নিবন্ধের শুরুতেই সাম্প্রতিককালে মানবাধিকার নিয়ে নানা বিতর্কের কথা বলেছিলাম। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে,

এই সব বিতর্কের অধিকাংশেরই উৎস আজকের ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্যকারী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বস্তুত, 'মানবাধিকার'-কে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরেই তারা অন্যান্য দেশ, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে আসছে। তাদের নিজেদের খেয়ালখুশিমতো মানবাধিকার-এর ব্যাখ্যা হাজির করে তারা ঐ সব দেশে আর্থিক বা সামরিক 'সাহায্য' দেবার শর্ত হিসাবে তাকে ব্যবহার করছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি মূলত তাদের নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলিকেও আর্থিক সাহায্য বা ঋণ দেবার ক্ষেত্রে এই শর্ত জুড়ে দিতে বাধ্য করছে। এক কথায়, মানবাধিকারকে তারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। যারাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করতে চাইছে, তাদের ক্ষেত্রেই এই হাতিয়ার প্রযুক্ত হচ্ছে। একে আমরা অভিহিত করতে পারি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে 'মানবাধিকারের রাজনীতি' হিসেবে। একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই ধরা পড়বে, মার্কিন-সহ উত্তর গোলার্ধের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অনুসৃত এই মানবাধিকারের রাজনীতির মধ্যে আর যা-ই থাক না কেন, প্রকৃত মানবাধিকারের ছিঁটেফোঁটাও এর মধ্যে নেই।

প্রথমত, আমরা আগেই দেখেছি, এরা মানবাধিকারের ধারণাকে শুধুমাত্র নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এবং তা-ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক অধিকারের মধ্যে সীমিত করে রাখতে চায়। একদিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ছাড়া নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে যে শেষ বিচারে অর্জন করা যায় না, এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারকে কার্যকর করতে গেলে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বাধীনতার পূর্বশর্তের বাস্তবায়ন ছাড়া যে তা করা সম্ভব নয়—গত কয়েকশো বছরের মানবসমাজের অভিজ্ঞতাজাত এই বক্তব্যকে তারা কোনোক্রমেই স্বীকার করতে রাজি নয়। অর্থাৎ, মানবাধিকার সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত ও খর্বিত, মানবাধিকারকে বিকাশের প্রেক্ষিতে তারা দেখে না।

দ্বিতীয়ত, তাদের অপছন্দসই দেশে (যেমন, বর্তমানে কিউবা, ইরাক ও আংশিকভাবে চীন) ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা সামান্যতম খর্বিত হলেই তারা ছড়ি ঘোরাতে শুরু করে, কিন্তু তাদের বশংবদ ও তাঁবেদার দেশগুলিতে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হলেও তারা উচ্চবাচ্য করে না। বস্তুত গত কয়েক দশকে পৃথিবীর যেসব দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার সবচেয়ে চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, যেমন অতীতের দক্ষিণ ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, শাহ আমলের ইরান ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সাম্প্রতিককালে চিলি বা নিকারাগুয়া, কুয়েত বা রাশিয়া, সেগুলি সবাই কিন্তু তাদের কাছে 'গুডবয়' সার্টিফিকেট পেয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে মানবাধিকারের প্রশ্নে তারা সোজাসুজি দুমুখো নীতি নিয়েছে এবং সেটা তারা নিয়েছে তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার স্বার্থেই।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক বা বৌদ্ধিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে চরম বৈষম্য বিরাজ করছে, সে সম্পর্কে তারা কোনোরকম উদ্বেগের কারণ পর্যন্ত দেখে না। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মোট আয়ের ৮৫ ভাগই ভোগ করে মাত্র ২৩ শতাংশ মানুষ, এবং এই অবস্থার পরিবর্তন করার সামান্যতম চিন্তা তাদের মানবাধিকারের অভিধানে স্থান পায় না। বস্তুত বিশ্ব রাজনীতিতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অপসারণের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সযত্নে ও সুপরিকল্পিতভাবে যে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে ও তুলছে, তার মধ্যে কোনোরকম গণতান্ত্রিক বা বৈষম্য বিরোধী উপাদানের উপস্থিতি তাদের শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের স্বার্থবিরোধী বলেই তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকারের ও মানুষের সমানাধিকারের ধারণার প্রয়োগের বিরুদ্ধে।

চতুর্থত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজের দেশেই গণতান্ত্রিক অধিকারের অবস্থা সে দেশের শাসকগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রেমের প্রকৃত স্বরূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। ১৯৯০-এ মার্কিন বিচার বিভাগ কর্তৃক পরিবেশিত তথ্য অনুসারেই, সে দেশের প্রতি এক লক্ষ মানুষের মধ্যে ৮ জন খুন, ৩০০জন আহত ও ৭০ জন নারী ধর্ষিতা হয়েছে, ২০০ জন ডাকাতির ও ৫৬০০ জন চুরির শিকার হয়েছে। বহু শহরে একা রাতে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি বিপজ্জনক। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম এই দেশে উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে ৩ থেকে ৪ লক্ষ লোক শীতে এবং ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ লোক গরমের দিনে রাস্তায় রাত কাটাতে বাধ্য হয়। প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে ৪১৩ জন জেল খাটে। এখন সে দেশের অন্তত ৫ থেকে ৬ শতাংশ মানুষ বেকার। ষাটের দশক পর্যন্ত সে দেশে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের আলাদা স্কুলে পড়তে হতো। এখনও বর্ণবৈষম্যের ও জাতিবৈষম্যের অভিশাপে নির্যাতিত ও বঞ্চিত হতে হয় লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গকে এবং মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ থেকে আগত মানুষকে। কাজেই অন্যান্য দেশে মানবাধিকার হরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার কোনো নৈতিক অধিকারই শেষ বিচারে মার্কিনী শাসকগোষ্ঠির থাকে না।

পঞ্চমত, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীতে মানবাধিকার রক্ষার স্ব-ঘোষিত অভিভাবক হিসেবে কোনো দেশকে বা সেই দেশের শাসকবর্গকে পছন্দ না হলেই মানবাধিকারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তাদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে, তারা নিজেরা কি মানবাধিকার প্রসঙ্গে গত চার দশক ধরে রাষ্ট্রসংঘে যে বিভিন্ন চুক্তিপত্র বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সেগুলিকে সরকারিভাবে সমর্থন করেছে বা তাতে স্বাক্ষর করেছে? ১৯৬৬-

তে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিপত্র গ্রহণ পর্বের আলোচনার সময় তারা তার বিরোধিতা করে এবং তাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। এমনকি মানবাধিকারের ধারণাকে যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে সীমিত করে রাখার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছে, ১৯৬৬-তে গৃহীত সেই আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিপত্রে পর্যন্ত তারা স্বাক্ষর করেনি। রাষ্ট্রসংঘে মানবাধিকার প্রসঙ্গে গৃহীত আরও যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তারা স্বাক্ষর করেনি, তার মধ্যে রয়েছে : গণহত্যার অপরাধের প্রতিনিবৃত্ত ও শাস্তির জন্য কনভেনশন (১৯৫১), গণিকাবৃত্তিজীবীদের শোষণ বন্ধের জন্য কনভেনশন (১৯৫১), উদ্বাস্তুদের অবস্থা সম্পর্কিত কনভেনশন (১৮৫৪), বাধ্যতামূলক শ্রম উৎখাত করার জন্য কনভেনশন (১৯৫৯), শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৬২), সমস্ত ধরনের জাতিবৈষম্য (১৯৬৯) ও বর্ণবৈষম্যের অবসানের জন্য কনভেনশেন (১৯৭৬), নারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৮১), সমস্ত ধরনের অত্যাচার এবং নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবহার ও শাস্তির বিরুদ্ধে রাজনীতি। কে বা কারা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান থেকে একে বিচার করছে, তার ওপরেই নির্ভর করছে এর ব্যাখ্যা। মানবাধিকারের রাজনীতিকে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে (এক) মানবাধিকার বলতে মূলত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকেই বোঝানো হয় এবং সেটাও করা হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাবে, মানবাধিকারের সংজ্ঞার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; (দুই) আজকের পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত বৈষম্য রয়েছে, তার অবসানকে মানবাধিকার রক্ষা ও অর্জনের কর্মসূচিতে স্থান দেওয়া যায় না; এবং (তিন) সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্বাধীন ও স্বার্থবাহী যে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে ও হচ্ছে, তাকে সযত্নে রক্ষা করাটাই মানবাধিকার রক্ষার মূল কর্মসূচী হয়ে দাঁড়াল।

আর এর বিপরীতে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি মানবাধিকারকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে (এক) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকেও, বিকাশের অধিকারকেও, মানবাধিকারের ধারণার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়; (দুই) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসানের, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে বিধৃত "ভয় ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি"-র উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে, মানবাধিকারের ধারণাকে স্থাপিত করতে হয়; এবং (তিন) বৈষম্যভিত্তিক নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করাটাকেও মানবাধিকার রক্ষার কর্মসূচীতে স্থান দিতে হয়।

ভারত-সহ তৃতীয় বিশ্বের মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীরা এই দুই রাজনীতির মধ্যে কোন্‌টিকে গ্রহণ করবেন ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হবেন, তার ওপরেই নির্ভর করবে এইসব দেশে মানবাধিকার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ। দেশের ভিতরে মানুষর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জন ও রক্ষার জন্য তারা এতোদিন যে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এসেছেন, বিশেষত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলার জন্য তারা যে ভূমিকা নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ব্যাপক মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই, জীবনের ন্যূনতম অধিকার বাস্তবায়িত করার জন্যই, প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবিকা প্রভৃতির অধিকারকে বাস্তবায়িত করা। ব্যক্তিগত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কী কাজে লাগবে, যদি না ক্ষুধা, আশ্রয়হীনতা, অজ্ঞতা ও অসুখের হাত থেকে তাদের মুক্ত করা যায়? কীভাবে তারা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে, যদি এই সব দেশের ওপর উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের হাত থেকে তাদের মুক্ত করা না যায়? মত প্রকাশের স্বাধীনতা জাতীয় মানবাধিকারগুলি তাদের কোন্ কাজে লাগবে, যদি সংবাদ ও তথ্য, অর্থাৎ প্রকৃত তথ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করে ওইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থে পরিবেশিক মিথ্যে, অর্ধসত্য ও বিকৃত 'খবরগুলি' ক্রমাগতভাবে তাদের গিলিয়ে যাওয় হয়? কীভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ সম্ভব হবে, যদি পাশ্চাত্যের রুচি ও পছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগুলিকে চোখ ধাঁধানো ও মন-মাতানা সংস্কৃতির মাধ্যমে চাপিয়ে দিয়ে তাদের নিজস্ব দেশীয় ও লোকজ শিল্প-সাহিত্য, নাচ, গান, নাটক ইত্যাদিকে কোণঠাসা করে ফেলা হয়?

এইসব প্রশ্নের উত্তর মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীদেরই খুঁজে বের করতে হবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মানবাধিকারের কোন্ রাজনীতি তারা গ্রহণ ও অনুসরণ করবেন—পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদী-নিয়ন্ত্রণবাদী-বৈষম্যবাদী শক্তিগুলির শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী মানবাধিকারের রাজনীতি, না তৃতীয় বিশ্বের প্রকৃত অর্থে সমস্ত ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত কোটি কোটি শোষিত মানুষের স্বার্থবাহী মানবাধিকারের রাজনীতি?

এই সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভর করবে ভারত-সব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে মানবাধিকার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ।

***অনীক*, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৬ থেকে পুনর্মুদ্রিত**

অধিকার চেতনা

শাসিতের অধিকার । শাসকের অধিকার। বিরোধ সন্ধান

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

এই লেখাটি, শচীন্দ্র কুমার সেন স্মারক বক্তৃতায় যা বলেছিলাম, সেই বলার কাছাকাছি, একটা লিখিত চেহারা।

যেভাবে লেখার শিরোনাম সাজিয়েছি, লেখাতে সেভাবেই বলতে চাওয়া। আগে যা ছিল শাসিতের অধিকার, এখন তা শাসকের অধিকার। শাসিতের অধিকারকে নীচে নামিয়ে দিয়ে শাসকের অধিকার উপরে উঠে এসেছে।

আমাদের দেশে 'অধিকার' স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পাওয়া। 'অধিকার' বলতে সাধারণত বোঝানো হয় 'নাগরিক অধিকার'। যে অধিকার লেখা আছে, রাষ্ট্র মেনে নিয়েছে, প্রশাসন প্রয়োগ করে, আদালত আলোচনা করে।

এই যে অধিকার 'নাগরিক অধিকার', এর জন্ম রাষ্ট্র আর 'নাগরিক'-এর সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে, সম্বন্ধকে মেনে নিয়ে। নাগরিক যদি রাষ্ট্রকে মেনে নেয়, তাহলেই রাষ্ট্রের থাকা, রাষ্ট্র হয়ে থাকা সহজ হয়। অন্য দিক থেকে রাষ্ট্র যদি নাগরিক-এর 'থাকা', ঠিকঠাক থাকার দায়িত্ব নেয়, তবেই নাগরিক-এর 'নাগরিক' হয়ে 'থাকা' সহজ হয়। এক ধরনের বোঝাপড়া। সমঝোতা।

এই যে সম্বন্ধ ভাবা হলো, মানা হলো, বানানো হলো, এর ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলনের বড়ো ইতিহাসের অংশ, তার মধ্যেই ছিল। 'নাগরিক অধিকার' কথাটির আগে 'নাগরিক দাবি' কথাটি বসালে বুঝতে সুবিধা হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতবাসী বিদেশি শাসকদের কাছে যে রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দাবি, দাবিসব করেছিলেন, তাই স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের শাসকদের কাছেও দাবি ছিল। শাসকরা সেই সব নিয়ে, জড়ো করে, গুছিয়ে, মিলিয়ে, মিশিয়ে, বাড়িয়ে, 'অধিকার', দেশবাসীর, যাদের নতুন করে নাম দেওয়া হলো, রাষ্ট্র দিল, 'নাগরিক', সেই নাগরিকদের অধিকার, 'নাগরিক অধিকার' বানিয়ে দিল। লিখে দিল। বোঝাপড়া, সমঝোতা বানানো হলো।

এরপর আস্তে আস্তে, সময় ধরে ধরে, রাষ্ট্র আর নাগরিক-এর এই বানানো সম্বন্ধ পাল্টাতে থাকলো, রাষ্ট্রের কাছে 'নাগরিক অধিকার'-এর ধারণা, নীতি, প্রয়োগ বদলাতে থাকলো। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতেও। এই লেখাতে সময় ধরে ধরে, বিষয় ধরে ধরে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই সব কথা বলা নেই। বলা থাকছে, মোটাদাগে, সংক্ষেপে, মূল ধারাটি ধরে। এই লেখাটার এটা একটা খুঁত।

এটা মেনে নিয়েই এগোই।

উদাহরণ ॥ রাজনীতির বেলায়

এখন, রাষ্ট্র-র আর নাগরিক-এর কাছ থেকে মান্যতার দায় নেই, স্বীকৃতির দরকার নেই। রাষ্ট্র এখন একটি নাগরিক-মান্যতা-নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপনা, একটি কাঠামো। রাষ্ট্র এখন একটি প্রতিষ্ঠিত কাঠামো। নাগরিকরা রাষ্ট্রের উপকরণ লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা, পঞ্চায়েত, বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন, আমলা, সশস্ত্রবাহিনী, এসব মান্য করেন। শুধু দেশবাসীর একটি অংশ করেন না। যারা বিভিন্ন রাজ্যে, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কারণে, রাষ্ট্রের বিরোধিতা করছেন, গণআন্দোলনে, সশস্ত্র গণ আন্দোলনে। বাকিদের কাছে রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা, কাঠামো। এবং তাদের কাছে 'রাষ্ট্র' এবং 'সরকার' সমার্থক হয়ে উঠছে, হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভে তারা সরকার পরিবর্তন করেন। 'সরকার' পরিবর্তিত হয় না, বদলায় সরকারে থাকা দল, দলেদের জোট। রাষ্ট্র সমালোচিত হয় না, সরকার সমলোচিত হয়। সরকার সমালোচিত হয় না, সরকারে থাকা দল, দলেরা সমালোচিত হয়। এর ফলে 'রাষ্ট্র-নাগরিক সম্বন্ধ' পালটে হল 'সরকার-নাগরিক সম্পর্ক'। আর তার জন্য নাগরিক-রাষ্ট্র সম্বন্ধের যে পারস্পরিকতা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের মান্যতার সঙ্গে জড়িয়ে নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এমনটা আর থাকছে না। 'নাগরিক অধিকার' ধারণা আর প্রয়োগেও এলো পরিবর্তন।

উদাহরণ ॥ অর্থনীতির বেলায়

রাষ্ট্র-নাগরিক সম্পর্ককে মাথায় রেখে, নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা খেয়াল করে রাষ্ট্র ভারতের অর্থনীতিকে সাজিয়েছিল শুরুতে। নানা নাম ছিল তার। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, রাষ্ট্র চালিত অর্থনীতি, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, মিশ্র অর্থনীতি, অ-পুঁজিবাদী অর্থনীতি, জনকল্যাণমুখী অর্থনীতি, তৃতীয়পথের অর্থনীতি, এমন সব নাম। ছোটো করে বললে নাগরিকের জীবনযাপনের জন্য যা যা লাগবেই তা রাষ্ট্র নাগরিককে যোগান দেবে বিনা দামে এবং/কিংবা অল্প দামে। দিনে দিনে নাগরিকের 'জীবনের অধিকার' ধারণার পরিসরে চলে এসেছে, নিয়ে আসা হয়েছে 'জীবন যাপনের' অধিকার। জীবন যাপনের অধিকার বলতে বুঝিয়েছে শিক্ষার, স্বাস্থ্যের, খাদ্যের, বাসস্থানের, পানীয় জলের, এমন সব বিষয়ে অধিকার। নাগরিকদের পাওয়ার অধিকার। রাষ্ট্রের যোগান দেবার দায়িত্ব। বিনা দামে, কম দামে। এমন অধিকার-দায়বদ্ধতার সম্পর্ক সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকলো, বদলালো।

ভারতের অর্থনীতি রাষ্ট্রনির্ভর অর্থনীতি থেকে বেসরকারি পুঁজিনির্ভর অর্থনীতি, সংস্থাপুঁজি (কর্পোরেট ক্যাপিটালের বাংলা) নির্ভর অর্থনীতিতে পালটে যেতে থাকলো। 'রাষ্ট্র-নাগরিক' সম্পর্ক থেকে 'পুঁজি-নাগরিক' সম্পর্কে পরিবর্তন।

রাষ্ট্রের দায় ছিল নাগরিকের অধিকার মেটানো। পুঁজির সেই দায় নেই। পুঁজির কাছে নাগরিক 'নাগরিক' নয়, 'আর্থনীতিক মানুষ', ফলে নাগরিক অধিকার ধারণায়, আর্থনীতিক অধিকার ধারণায় বদল এলো। বদলে দেওয়া হলো।

একটি সম্পর্কিত বিষয়

লেখাটির এই পর্যায়ে এসে আর একটা বিষয়, একটি সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করে নেবো। আলোচনাটা 'নাগরিক অধিকার'-এর চরিত্র নিয়ে, বৈশিষ্ট্য নিয়ে। কিংবা, এমনভাবে বললে আমার সুবিধা হয়, নাগরিক অধিকারের জটিলতা নিয়ে। এই লেখাতে অল্প কথায় বলবো। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার।

নাগরিক অধিকার কোনও স্থায়ী বিষয় নয়, যা 'হয়ে গেছে' 'হয়ে আছে' শুধুই 'তা' নয়। নাগরিক অধিকার চলমান বিষয়, প্রতি মুহূর্তে তা নির্মিত হয়, নির্মাণ করতে হয়। কারণ অধিকারের দাবি এবং অতএব অধিকারের আন্দোলন চলমান। জনগণের অধিকার ভাঙলে, রাষ্ট্র ভেঙে দিলে, নাগরিকদের দাবি, এবং দাবি=অধিকার ধারণা জন্ম নেয়। আর দাবি=অধিকার=অধিকার আন্দোলন এই সম্পর্কে, এই যোগযোগে 'অধিকার' জন্মায়, অধিকার বানানো হয়, অধিকারের স্বীকৃতির দাবি ওঠে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতির দাবি ওঠে। তোলা হয়। তাহলে সার হলো এই রকম, নাগরিকরা অধিকার-এর দাবিদার, রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার স্বীকৃতির দাবিদার। আর রাষ্ট্র অধিকার-এর স্বীকৃতিকারী, প্রয়োগকারী, রক্ষাকারী। শুধু স্বীকৃতি দেওয়া নয়, প্রয়োগ করতে হবে, রক্ষা করতে হবে। প্রয়োগ এবং রক্ষা না হলে শুধু স্বীকৃতির কোন মানে হয় না। কারণ নাগরিক অধিকারের ব্যবস্থাপনাটা এমন রকম যে, রাষ্ট্র নাগরিক অধিকার প্রয়োগ না করলে, রক্ষা না করলে, নাগরিককে রাষ্ট্রেরই কাছে যেতে হয়, অধিকারের দাবি নিয়ে নয়, প্রয়োগের দাবি নিয়ে, রক্ষার দাবি নিয়ে।

উদাহরণ ॥ শচীন্দ্রকুমার সেনের জীবন

যাকে স্মরণ করে বক্তৃতা, যে বক্তৃতার বয়ান নিয়ে এই লেখা, সেই শচীন্দ্রকুমার সেনের জীবন থেকে উদাহরণ নেওয়া। শচীন্দ্রকুমার সেন সাতের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের সরাসরি অংশগ্রহণকারী ছিলেন না। তার পরিবারের বেশির ভাগ মানুষ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তার কাছে আশ্রয় পেয়েছেন আন্দোলনের কর্মী নেতা। তিনি নকশালবাড়ি আন্দোলনের পাশে ছিলেন।

শচীন্দ্রকুমার সেনের এই বিষয়টিকে নাগরিক অধিকারের ধারণায় নিয়ে গিয়ে এইভাবে বলতে হবে। শচীন্দ্রকুমার সেনের রাজনীতি নিয়ে ভাবনা করার, রাজনীতিকে সমর্থন করার নাগরিক অধিকার আছে। এই অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করে নিয়েছে।

এবার নাগরিক অধিকার-রাষ্ট্র সম্পর্কের যে জটিলতার কথা বলেছিলাম তাতে ঢুকছি। রাষ্ট্র নাগরিক অধিকার স্বীকার করে, স্বীকার করার কথা, রাষ্ট্রকে নাগরিক অধিকার মান্য করতে হয়, মান্য করার দায়বদ্ধতা। সেই রাষ্ট্রই আবার নাগরিক অধিকার অমান্য করে। শচীন্দ্রকুমার সেনের রাজনীতিকে মদত দেবার অধিকার আছে, রাষ্ট্র স্বীকৃত নাগরিক অধিকার আছে। সেই রাষ্ট্রই শচীন্দ্রকুমার সেনের নাগরিক অধিকার অমান্য করলো। তাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা হলো, আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো না, থানা লকআপে রেখে দেওয়া হল, অত্যাচার করা হলো, তাঁর মৃত্যু হলো, তাঁকে মেরে ফেলা হলো। অধিকারের পরিসরে নিয়ে এসে বলা, একজন নাগরিকের রাষ্ট্র 'স্বীকৃত' অধিকার রাষ্ট্রই 'অমান্য' করলো। আরেক ভাবে বলা যাক। নাগরিকের 'ন্যায্য' অধিকার অমান্য করায় রাষ্ট্রের 'অন্যায়' অধিকার নির্মিত হলো, প্রয়োগ হলো। আমি আর এক ধাপ এগোবো। রাষ্ট্র অধিকার ভাঙে, অধিকার আন্দোলন কর্মীরা রাষ্ট্রের কাছে অর্থাৎ প্রশাসনের কাছে, বিচারালয়ের কাছে অভিযোগ করে। তারা মানে এবং মানে না। মানলেও আবার ভাঙে। 'স্বীকার' করা এবং 'অমান্য' করা একই সাথে চলতে থাকে। আর এখানেই আমি আমার আলোচনার মূল বিষয়টা রাখতে চাইবো। আমি বলতে চাইবো অধিকার-এর জায়গা বদল হলো। নাগরিকের 'শাসিত'-এর ন্যায্য অধিকার অমান্য করা 'শাসক'-এর অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। 'নাগরিক অধিকার' বিষয়টির স্থান বদলে গেল, পরিসর পালটে গেল, পালটে দেওয়া হলো। অধিকার নাগরিক পরিসর থেকে রাষ্ট্রের পরিসরে চলে গেল, তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। অধিকারের স্থানান্তর হলো।

স্থানান্তরের উদাহরণ ॥ রাজনীতির বেলায়

প্রসঙ্গ ঃ শচীন্দ্রকুমার সেন

পর্যায় ১।। পুলিশ, গ্রেপ্তার, থানা, আদালত, জেলখানা বিষয়ক নিয়ম সরকারের বানানো এবং লিখিত। অর্থাৎ নাগরিক অধিকার লিখিত ও স্বীকৃত।

পর্যায় ২ ।। অধিকার অমান্য করে সরকার, পুলিশ। সুতরাং নাগরিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, অথচ অমান্য করা হল। স্বীকৃত এবং অমান্য।

পর্যায় ৩ ।। অধিকার অস্বীকার করা। অধিকারকে অস্বীকার করে সরকার, প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী, বিচারালয়, রাজনীতিক দল। উদাহরণ: আইন, ইউএপিএ, পোটা, আফসপা ইত্যাদি। উদাহরণ: ব্যবস্থাপনা, অর্পারেশন গ্রিন হান্ট, এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট, নতুন নতুন নামের, ধরনের, কাজের সশস্ত্র বাহিনী প্রভৃতি।

আরেকবার বলি, অন্যভাবে সাজিয়ে বলি।

১. নাগরিকের জীবনের অধিকার = শাসিতের অধিকার।

২. নাগরিকের জীবনের অধিকার না মানা = (তখনও) শাসিতের অধিকার।

৩. নাগরিকের জীবনের অধিকার 'না মানার অধিকার' = সাময়িক বাহিনীর অধিকার = শাসকের অধিকার।

অধিকারের স্থানান্তর অর্থাৎ অধিকারের জায়গা বদলে যাওয়া, জায়গা বদলে দেওয়া।

স্থানান্তরের উদাহরণ ॥ অর্থনীতির বেলায়

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বানানো অর্থনীতির ধরন ছিল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি। রাষ্ট্র পরিচালিত, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। এই আর্থনীতিক কাঠামো আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছিল, বদলে ফেলা হচ্ছিল। তারপর ১৯৯০-এর দশকে খুব অল্প সময়ের বড়ো করে পালটে ফেলা হলো, অর্থনীতির চরিত্রে, চেহারায়, ধারণায়, ধরনে, ভাবনায় প্রয়োগে।

এইখানে পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে। এই বদলের উৎস, কারণ ব্যাখ্যায় যাব না। গেলে এই লেখাটা বেজায় বড়ো হয়ে যাবে, তাছাড়া আমার এই লেখায় বলার বিষয়টা পথ হারিয়ে ফেলবে। আপাতত আমার কথাটা মেনে নিয়ে পাঠককে আমার সাথে এগোবার আবেদন করছি। যে কথাটা এই লেখাটার জন্য জরুরি তা হলো অর্থনীতির কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র সরতে শুরু করলো, সরতে থাকছে। আর সেই জায়গায় বেসরকারি পুঁজি, সংস্থাপুঁজিকে আসতে দেওয়া শুরু হলো, আসতে দেওয়া চলছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আর একটা কথা। সংস্থাপুঁজির ওপর আগে রাষ্ট্রের যেসব নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা সরিয়ে ফেলা হলো, হতে থাকছে। এইটুকু বলে এর সাথে অধিকারের, 'নাগরিক অধিকার'-এর সম্পর্কের কথায় চলে আসি।

'নাগরিক অধিকার'-এর মধ্যে রাজনীতিক অধিকার থাকে, আর্থনীতিক অধিকার থাকে। আলাদা আলাদা করে নয়, একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে। মিলে মিশে।

নাগরিকের 'জীবনের অধিকার' একটি রাজনৈতিক অধিকার। নাগরিকের দাবিতে, আন্দোলনে, রাষ্ট্রের স্বীকৃতিতে, জীবনের অধিকারকে বাড়িয়ে দেওয়া হলো জীবন যাপনের অধিকারে। নাগরিকের ভালোভাবে বেঁচে থাকতে গেলে যা যা দরকার, তা দেবার দায়িত্ব নিতে হলো রাষ্ট্রকে। এইভাবে অধিকারের পরিসরে চলে এলো স্বাস্থ্যের অধিকার, খাদ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, পরিষেবার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, এমন সব অধিকার ধারণা, নীতি, প্রকল্প এবং প্রয়োগ। এমন সব অধিকার মান্যতার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের আর্থনীতিক দায়। রাষ্ট্র যদি অর্থনীতি থেকে সরে আসে, তাহলে তার আর অর্থনীতি বিষয়ক অধিকার মানার দায় থাকে না। রাষ্ট্রের বদলে যে অর্থনীতিতে গেল, সংস্থাপুঁজি, তার সঙ্গে তো নাগরিকের কোন অধিকার-সম্বন্ধ নেই। ফলে নাগরিকের আর্থনীতিক অধিকারের অমান্যতা শুরু হলো, চলতে থাকলো। এই বিষয়টাকে এইখানে থামিয়ে দেব না। দিলে এই লেখাটার বিষয়ে আসা হবে না। আমি এবার একটা জটিলতায় ঢুকতে চাইবো।

এই লেখাটার প্রথম দিকের কোন একটা জায়গায় একটা কথা পেড়ে রেখেছিলাম। 'নাগরিক অধিকার' রাষ্ট্র স্বীকৃত, মান্য, লিখিত। যে আর্থনীতিক অধিকারের কথাগুলো বলে এলাম সে সব সেই রকমেরই। এর বাইরেও মানুষজন নানাভাবে, নানা বিষয়ের সঙ্গে, নানা দিন ধরে আর্থনীতিক সম্পর্ক বানায়। যেমন জমি, বীজ, জল, নদী, সমুদ্র, সমুদ্র উপকূল, পাহাড়, শস্য, জঙ্গল, শহরভূমি এমন সব বিষয়ের সঙ্গে, এমন সব বিষয় নিয়ে। এই সব সম্পর্ক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, দার্শনিক। এবং ফলত 'স্বাভাবিক'। এবং রাষ্ট্রের স্বীকৃতি নিরপেক্ষ। যদি অধিকারের ভাষায় বলতে বলা হয়, একটা প্রস্তাব 'প্রকৃতির অধিকার', আর একটা প্রস্তাব 'প্রকৃতি-মানুষ' সম্পর্কের অধিকার। এই অধিকার অলিখিত, কিন্তু রাষ্ট্র স্বাধীনতা-উত্তরকালে অস্বীকার করেনি। বরং স্বীকার আছে। যেমন আদিবাসী জীবনযাপনভূমির ওপর 'আদিবাসীদের অধিকার'। এবং সাম্প্রতিক লিখিত, বনের ওপর 'বনবাসীদের অধিকার'। কিন্তু বিশাল অংশটাই অলিখিত, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতিহীন, অথচ অস্বীকৃত নয়। 'স্বীকৃতিহীন' আর 'অস্বীকৃত' দুটো শব্দের মধ্যে পার্থক্যটা আগে ছিল না। এখন আনা হচ্ছে। আর এখানেই জটিলতা।

উদাহরণ নিয়ে বিষয়টা বুঝতে চাইছি। সমুদ্র— জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যান, সমুদ্রে যাবার আগে, সমুদ্র থেকে ফিরে এসে সমুদ্রতট ব্যবহার করেন, নৌকো রাখতে, সারাতে, রং লাগাতে, জাল রাখতে, শুকোতে, সারাতে, মাছ নামাতে, বাছতে, বিক্রি করতে, শুকোতে, নিজেরা থাকতে। সমুদ্রে যাবার, তট ব্যবহার করার এই যে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক, সামাজিক, আর্থনীতিক 'অধিকার'। সমুদ্র জেলেদের, এটা কোথাও লিখিত নেই, রাষ্ট্রের লিখিত স্বীকৃতি নেই। এটা স্বাভাবিক অধিকার। এবার জটিলতাটা আনছি। সমুদ্র ধীবরদের কাছে এই 'অধিকার' স্পষ্ট, স্বীকৃত। রাষ্ট্রের কাছে অস্পষ্ট, অস্বীকৃত। এই রকম পরপর বলে যাওয়া যায় কৃষকের বীজ, নদী-জেলেদের নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া, মাঝিদের নৌকা বাওয়া, পর্বতবাসীদের পাহাড়ে থাকা। দরিদ্র শহরবাসীর শহরে থাকা। ভূমিবাসীদের শস্য ব্যবহার করা। এমন অনেক অনেক। এমন এমন সব, অনেক অনেকের কাছে স্বাভাবিক, স্পষ্ট অধিকার। রাষ্ট্রের কাছে এই অধিকার অলিখিত, অস্বীকৃত, অস্পষ্ট। আর এভাবেই চলে আসছিল এতকাল।

এখন কাল পরিবর্তনে এতকালের চলে আসাকে পালটে দেওয়া, আটকে দেওয়া। এখন সংস্থাপুঁজির কাল। পুঁজির

চাহিদায় সব কিছু ঢুকিয়ে নেওয়া। জমি, বীজ, শস্য, জল, জঙ্গল, নদী, পাহাড়, সমুদ্র, শহর, সব কিছু। একটার পর একটা আইন, নীতি, প্রকল্প, ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সব কিছু সংস্থাপুঁজিকে দিয়ে দেওয়া, তার অধিকারে দিয়ে দেওয়া, অধিকার বানিয়ে দেওয়া। মালিকানার অধিকার, ব্যবহারের অধিকার, বদলে দেবার অধিকার, দখলদারির অধিকার। কয়েকটি উদাহরণের নাম, জমি অধিগ্রহণ আইন, বীজ, আইন, জাতীয় কৃষক নীতি। খনি আইন, মেধাস্বত্ব অধিকার আইন, জাতীয় শহর নীতি, বড়ো বাঁধ, বিশেষ আর্থনীতিক অঞ্চল, উপকূল পরিচালন ব্যবস্থাপনা, জাতীয় পর্যটন নীতি। এইসবের মধ্যে দিয়ে শাসিতের 'স্বাভাবিক' অধিকারের বদলে শাসকের 'রাষ্ট্র নির্মিত' অধিকার বানিয়ে দেওয়া হলো। অধিকারের জায়গা বদল হল। শাসিতের কাছ থেকে শাসকের কাছে। শাসিতের অধিকার অস্বীকার করা হলো। শাসকের অধিকার নির্মাণ ও স্থাপন করা হলো।

স্থানান্তরের উদাহরণ ॥
অধিকারের ধারণা, অধিকারের পরিসর

নাগরিক অধিকার বলতে বোঝায়, আগে বলা হয়েছে, খাদ্যের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, এমন সব জীবনযাপন উপাদানের অধিকার। এই সব অধিকার লিখিত, স্বীকৃত। এই সব অধিকারের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা প্রকাশিত। নাগরিকের অধিকারকে মান্যতার দায়বদ্ধতা। এখন অর্থনীতির কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র সরে গেছে, সরে যাচ্ছে, সংস্থা পুঁজিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। ফলে আর্থনীতিক অধিকার মান্যতার দায় থেকেও রাষ্ট্রের সরে যাওয়া। এখানে একটি সমস্যাকে নিয়ে আসবো। রাষ্ট্র অর্থনীতি থেকে সরে গেলেও রাজনীতি থেকে সরে যেতে পারে না। আর রাজনীতিতে থাকতে গেলে নাগরিকের কাছ থেকে সরে যাওয়া না। এই যে দ্বন্দ্ব, অর্থনীতি থেকে সরে যাওয়া, আর রাজনীতি থেকে সরে না যাওয়া, এই দ্বন্দ্বের সমাধানে 'অধিকার'কে স্থানান্তর করা হলো। 'অধিকার' এর অর্থ বদলে দেওয়া হলো। 'অধিকার' বদলে হলো ত্রাণ, খয়রাতি, ক্ষতিপূরণ, অনুদান। 'অধিকার' পালটে, খাদ্যের অধিকার হলো খাদ্য সুরক্ষা 'আইন'। কর্মসংস্থানের অধিকার হলো গ্রামে ১০০ দিনের কাজের 'আইন'। 'অধিকার'-এর বদলে 'আইন' প্রকল্প। 'অধিকার' চাওয়া (=দাবি)র বদলে প্রকল্প পাওয়া। অধিকার আন্দোলনে চলে এলো প্রকল্পের পরিমাণ, প্রাপকের যোগ্যতা, প্রাপ্তির ব্যবস্থাপনা, এমন সব অরাজনীতিক বিষয়। অতএব অধিকার ধারণার স্থান পরিবর্তন হলো, আগে রাষ্ট্র অধিকারের উদ্ভাবক, নির্মাণকারী ছিল না। অধিকারের উদ্ভাবনা, নির্মাণে ছিল নাগরিকের রাজনীতি, আন্দোলন, দাবি। রাষ্ট্র তখন ছিল অধিকারের প্রয়োগকারী, রক্ষক। এখন রাষ্ট্রই অধিকারের উদ্ভাবক এবং প্রয়োগকারী। অধিকারের উদ্ভাবন, নির্মাণ শাসিতের কাছ থেকে শাসকের কাছে চলে গেল, নিয়ে যাওয়া হলো।

স্থানান্তরের উদাহরণ॥ অধিকার ও আনুগত্যের সংযুক্তিকরণ

আগে অধিকারের সঙ্গে নাগরিকের স্বাধীনতা, স্বাধীন অবস্থান যুক্ত ছিল। অধিকার ছিল নাগরিকের মত, ধারণা, অবস্থান নিরপেক্ষ। এখন রাষ্ট্র-নাগরিক সম্পর্কে 'আনুগত্য'কে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। কারণ রাষ্ট্রের ব্যর্থতায় নাগরিক রাষ্ট্রের সমালোচক, প্রতিবাদী, বিক্ষুব্ধ এবং তার প্রকাশ নানাভাবে। রাষ্ট্র চায় অনুগত নাগরিক। রাষ্ট্রের এই মনোভাবকে, ইচ্ছাকে, প্রকল্পকে রাষ্ট্র 'অধিকার'-এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। নাগরিকের অধিকার পাওয়া-না-পাওয়াকে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা-না-থাকার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হল। উদাহরণ রাজনৈতিক বন্দির অধিকার।

রাষ্ট্রের প্রতি রাজনীতিক বিরুদ্ধতায় যে কোনো বন্দিই 'রাজনৈতিক বন্দি', এমনই লিখিত সংজ্ঞার্থ, আইনি বয়ান। রাষ্ট্র এখন সব ধরনের রাজনীতিক বিরুদ্ধতায় রাজি নয়। রাষ্ট্র একধরনের বিরুদ্ধতা আপাতত মানতে রাজি আছে আর এক ধরনের বিরুদ্ধতা মানতে রাজি নয়। যে ধরনের রাজনীতিক বিরুদ্ধতা মানতে চায় না রাষ্ট্র, তাদেরকে ঘোষণা করে, করলো 'নিষিদ্ধ', 'নিষিদ্ধ সংগঠন'। যাদের বিরুদ্ধতা মানতে চায় না তাদের সনাক্ত করলো 'না-রাজনীতিক বন্দি' বলে। তাদেরকে দেওয়া হবে না রাজনৈতিক বন্দির অধিকার। অধিকার স্থানান্তরিত হলো। 'শাসিত' রাজনীতিক বন্দির পরিসর থেকে 'শাসক'-এর পরিসরে। এমনই উদাহরণ, যা শাসিতের কাছে 'আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার অধিকার', তাই শাসকের অপছন্দে, 'বিচ্ছিন্নতাকামিতা'।

অন্য অন্য ক্ষেত্রেও অধিকারকে আনুগত্যের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে অধিকারকে আনুগত্যের অধীন করে, অধিকার-এর পরিসর পালটে দেওয়া হয়েছে। শাসিতের পরিসর থেকে শাসকের পরিসরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উদাহরণ, আগে অধিকার আইনের অধীন, অনুগত ছিল না প্রতিবাদের, বিরোধিতার রাজনীতির সভা, মিছিল, সমাবেশ করার অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার। এমন সব ছিল শাসিতের 'স্বাভাবিক' অধিকারের মতন। এখন, মিছিল, মিটিং, সভা, সমাবেশকে, ধর্মঘটকে, আইনি বিষয়, আইন শৃঙ্খলার বিষয়, বিচারালয়ের বিষয়, প্রশাসনের বিষয় বানিয়ে তোলা হয়েছে। শাসিতের রাজনীতিক অধিকারকে শাসকের 'অনুমতি' দেবার অধিকার-এ পরিণত করা হলো। অধিকার শাসিতের পরিসর থেকে শাসকের পরিসরে স্থানান্তরিত হলো। অধিকারের স্থানান্তর ঘটলো।

স্থানান্তরের উদাহরণ॥ অধিকারের ধারণা

লেখাটা বড়ো হয়ে যাচ্ছে, আমি বড়ো লেখা লিখতে পারি না। হয়তো এতক্ষণে একঘেয়ে হয়ে গেছে। একই কথা বারবার বলা হয়ে যাচ্ছে। এবার ছোট করে শেষ করে ফেলি। যা বলতে

চেয়েছিলাম, মনে হচ্ছে বোধহয় বলে ফেলতে পেরেছি। এখন আরও দুটো একটা বিষয়, দুটো একটা উদাহরণ দিয়ে আমার বলার কথাটার জোর বাড়াতে চাইছি। অল্প কথায়, বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে। বাইরে বাইরে, ভিতরে না ঢুকে।

আগে অধিকার ছিল একটি নাগরিক ধারণা, সামাজিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, ন্যায়, ঔচিত্য ধারণা। এখন পালটে দিয়ে অধিকারকে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি প্রশাসনিক ধারণা, একটি আর্থনীতিক ধারণা। অধিকার ধারণার সঙ্গে এখন জুড়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক, আর্থনীতিক ধারণা। জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'জাতীয় নিরাপত্তা', 'রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা', 'আর্থনীতিক উন্নয়ন', এমন সব সরকারি ধারণা। নাগরিকের অধিকার পাওয়া-না-পাওয়ার নির্ধারণ নাগরিকের, শাসিতের পরিসর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো শাসকের পরিসরে, রাষ্ট্রের ধারণায় রাষ্ট্রের সুরক্ষা থাকা না থাকায়, রাষ্ট্রের ভাবনায় জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়া-না-হওয়ায়। অধিকারের স্থানান্তর।

আগে অধিকার নির্মাণে, অধিকার প্রাপ্তিতে একটি সামগ্রিক বর্গ ধারণা ছিল। যেমন 'নাগরিক', 'কর্মী' এইরকম। এখন 'সামগ্রিক বর্গ' ধারণায় বিরোধ, বিভক্তি, দ্বন্দ্ব, সংঘাত বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সামগ্রিক বর্গকে ভেঙে ভেঙে টুকরো করে করে বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া চলেছে। সামগ্রিক বর্গের অধিকার ধারণা পালটে যাচ্ছে। বিভক্ত বর্গের অধিকার ধারণা জন্ম নিচ্ছে। দুটি অধিকার ধারণাকে বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

উদাহরণ কয়েকটি। হকারদের অধিকারের বিপরীতে পথচারীদের অধিকার। মিছিল, সমাবেশের বিরুদ্ধতায় শহরবাসীর অধিকার। শ্রমিক, কর্মচারীর অধিকারের বিপরীতে উপভোক্তার অধিকার। বস্তিবাসীদের অধিকারের বিপক্ষতায় উচ্চবর্গের শহরবাসীর অধিকার। জলাভূমির অধিকারের বিপ্রতীপে আবাসনের অধিকার। বন্ধ কারখানা খোলার দাবির অধিকারের মুখোমুখি শপিংমলে কেনাকাটার অধিকার। বন্দিমুক্তির অধিকারের বিপক্ষে দেশবাসীর আইনশৃঙ্খলার অধিকার। এমনভাবে এমনিভাবে অধিকারের দ্বন্দ্ব নির্মাণ। নাগরিকের একটা অংশকে রাষ্ট্রের সঙ্গে পেয়ে যাওয়া। নাগরিকের একটা অংশকে অন্য অংশের বিপরীতে, বিরোধিতায়, সংঘাতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। শাসিতের অধিকারের বিরুদ্ধে, শাসকের অধিকারের পাশে, শাসিতের একটা অংশকে রেখে দেওয়া। আর এমনি করেই অধিকারের বিভাজন ঘটিয়ে, অধিকারের স্থান পরিবর্তন করানো। শাসিতের অধিকারের পরিসর থেকে একটা অংশ শাসকের অধিকারের পরিসরে চলে গেল, চলে যাচ্ছে। নিয়ে যাওয়া চলছে।

যে বিষয় নিয়ে লিখতে চাওয়া, অধিকারের পরিসরের স্থানান্তর, অধিকারকে শাসিতের কাছ থেকে শাসকের কাছে নিয়ে চলে যাওয়া, সেই বিষয়টি আপাতত বলা হলো। বোধহয় বলা হলো।

এবার অন্য কথা।

এই অবস্থায় আমাদের, অধিকার আন্দোলন কর্মীদের কথা। অধিকার আন্দোলন, অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একটা কাজ 'অধিকার'কে তার প্রাথমিক, সঠিক, আগের ধারণায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। অধিকারকে শাসিতের পরিসরে, নাগরিকের ভূমিকে রেখে দেওয়া। শাসকের পরিসরে নিয়ে যেতে না দেওয়া।

এই লেখায় আমার দেখাতে চাওয়া এখন 'অধিকার'-এর যাত্রাপথ শাসক নির্ধারিত। যা প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত অধিকার ধারণা তাকে নবনির্মিত, বিভাজিত, অপসারিত অধিকার ধারণার দিকে নিয়ে যাওয়া, শাসকের নিয়ে যাওয়া। অধিকার আন্দোলন কর্মীদের প্রকল্প অধিকারের এমন যাত্রাপথের বিপরীত যাত্রাপথ বানানো, শাসিত নির্ধারিত পথ বানানো।

আমার একটি প্রস্তাব। আর একটি যাত্রাপথের প্রস্তাব। 'অধিকার'কে রাষ্ট্রীয় অধিকার ধারণা, 'নাগরিক অধিকার ধারণা' থেকে মুক্ত করে এনে 'গণতান্ত্রিক অধিকার ধারণা', 'মানবিক অধিকার' ধারণায় নিয়ে আসা। গণতান্ত্রিক অধিকার ধারণা, মানবিক অধিকার ধারণা বানানো এবং সেখানেই বসবাস করা। সে এক 'অন্য অধিকার' আন্দোলনের কথা।

সে এক অন্য লেখার বিষয়।

মানবাধিকার ও শ্রেণী রাজনীতি

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

মানবাধিকার রক্ষা অথবা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ বহু মানুষ আছেন যাঁদের কোন ঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান নেই। অঘোষিত কোনো রাজনৈতিক ভাবনা এঁদের অনেকের মধ্যেই আছে, কিন্তু কখনই তাঁরা তা প্রকাশ্যে উপস্থিত করেন না। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, কপটতা বা অসততার জন্যই রাজনীতি থেকে এঁরা নিজেদেরকে আলাদা করেন। মানবাধিকার আন্দোলনে বহু সৎ এবং নিষ্ঠাবান নেতা এবং কর্মী আছেন, যাঁরা মনে করেন যে মানবাধিকার আন্দোলনের মঞ্চটিকে রাজনীতি-মুক্ত রাখা দরকার। এটা তারা মনে করেন এই যুক্তিতে যে তাঁদের মতে এই আন্দোলনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটলে এই আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে আসবে রাজনৈতিক বিভাজন, রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির অনুপ্রবেশ ঘটবে অধিকার-আন্দোলনে, আর সেটা ঘটলে এই আন্দোলনের মঞ্চটির যে আলাদা গুরুত্ব থাকে— দলমত নির্বিশেষে সব মানুষের কাছে এই আন্দোলনের যে বিশেষ আবেদন থাকে, সেটাই হারিয়ে যাবে। এই আন্দোলনও হয়ে পড়বে রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট আর পাঁচটা আন্দোলনের মতোই সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ সিদ্ধ করার আন্দোলন, দলের বাইরে থাকা মানুষদের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই। অধিকার রক্ষা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে রাজনীতির বাইরে রাখার কথা এঁরা বলেন এই যুক্তিতেই। এই আন্দোলনের নেতানেত্রীরা যে কোনো ঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেন না, তার পিছনেও আছে এই যুক্তিটিই।

যুক্তিটির তত্ত্বগত ভিত্তি খুঁজে নেওয়া যায় উত্তর আধুনিক মতাদর্শ থেকে। সমাজে রাজনীতি অবশ্যই একটা 'ডিসকোর্স' এবং কোনো কারণেই এই ডিসকোর্সটিকে খাটো করে দেখা যায় না। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে সমাজে রাজনীতি-কেন্দ্রিক ডিসকোর্সই একমাত্র ডিসকোর্স নয়। রাজনীতির ডিসকোর্সে সমাজের সব মানুষই কম-বেশি অংশগ্রহণ করে বটে, কিন্তু রাজনীতির বাইরে সামাজিক মানুষের আরও অনেক পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়টিকে কেন্দ্র করে আরও বহু ডিসকোর্সে একই মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে। অধিকার রক্ষা বা অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এরকম একটা ডিসকোর্স তাই থাকতেই পারে, দলীয় মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও যে ডিসকোর্সে বহু সামাজিক মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে। এই ডিসকোর্সে অংশগ্রহণ করাটা একটা ভিন্ন সামাজিক পরিসরের বিষয়, যার সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয়ের পরিসরটিকে একাকার করে দেওয়া শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, বহু পরিচয় ভিত্তিক মানুষের যে সামাজিক অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বকেই খর্ব করা হয় এর ফলে। 'সব কিছুতেই রাজনীতি টেনে আনা'র বামপন্থী অভ্যাসকে নিন্দা করতে গিয়ে অনেকেই যা বলে থাকেন, তার যুক্তিভিত্তিও এটাই। এক কথায়, অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রাজনীতি টেনে আনার দরকার নেই। এই আন্দোলন ভিন্ন পরিসরের আন্দোলন, যা রাজনীতিকে বাদ দিয়েই চলতে পারে আর সেজন্যই রাজনৈতিক পরিসরে যাঁদের মধ্যে ডিসকোর্স ভিত্তিক সংঘাত আছে, তাঁরা সবাই মিলে এই অধিকার রক্ষা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার যে ডিসকোর্স তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেই ডিসকোর্সে ডিসকোর্স-ভিত্তিক মতপার্থক্য ও সংঘাত থাকতেই পারে। শুধু এটা মনে রাখলেই চলবে যে রাজনৈতিক পরিসর থেকে এই অধিকার বক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পরিসরটির ভিন্নতা আছে। স্বীকৃতি দিতে হবে এই ভিন্নতাকে।

শুধু অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নয়, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বহু বিষয়কে রাজনৈতিক পরিসরের বাইরের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা ইদানিং ক্রমবর্ধমান। 'অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী'র একটা সামাজিক পরিসরও গড়ে উঠছে সর্বস্তরে। এসবের পিছনেও আছে সেই যুক্তিবোধ, যার তাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজে নেওয়া যায় উত্তর আধুনিক মতাদর্শে, যে মতাদর্শে কোনও 'গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ বা চরম বাচন নেই, আছে ভিন্ন ভিন্ন বাচন ভিত্তিক ডিসকোর্সের স্বীকৃতি— বৃন্দাবনের বাঙালি বিধবা থেকে কর্পোরেটের জমি লুণ্ঠন, সব কিছুকেই যা প্রকাশ করতে পারে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে গড়া সামাজিক ডিসকোর্সের ভাষায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই ভিন্নতার যুক্তির জমিটিতে রাজনীতির চাষ যাতে নিষিদ্ধ করা যায় তার আয়োজনও কিছু কম নেই। ইদানিং একটা কথা মিডিয়াতে বেশ চালু হয়ে গেছে। কথাটা হলো 'রাজনীতির কারবারি'। নিন্দা বা ব্যঙ্গের ছোঁয়া থাকে কথাটায়, এমন বলা যাবে না সরাসরি। বাহ্যত, কথাটা তৈরি করা হয়েছে রাজনৈতিক পরিসরটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে। রাজনীতিটা সবার কারবার নয়। এটা কিছু বিশেষ লোকের কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রের বাইরে অনেকটা সামাজিক পরিসর অছে, 'অরাজনৈতিক' ব্যক্তিদের যা বিচরণক্ষেত্র। রাজনীতির 'কারবার'-এর মধ্যে এসব আসে না, ঐ ক্ষেত্রগুলি রাজনীতির কারবারের বাইরে অবস্থিত। এস্যার্থ, এসব সামাজিক পরিসরে রাজনীতির চাষ না করাই ভালো।

অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সহ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে

রাজনীতির আছে গভীর সম্পর্ক। সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের পরবর্তী যুগে সমাজতন্ত্র-কেন্দ্রিক পাল্টা বাচনটি যখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, পুঁজিকেন্দ্রিক বচনটিই যখন মহাবাচনে পরিণত হয়েছে আর সেই মহাবাচনের পৃথিবীর ন্যায্যতা নির্মাণকল্পে উত্তর-আধুনিক খণ্ড বাচনের তত্ত্ব যতই দৃঢ়মূল হয়ে উঠছে, ততই এই সব আন্দোলনে আসছে অরাজনৈতিক চেহারা, 'রাজনীতির কারিগর'দের থেকে সযত্নে পৃথক করে দেওয়া হচ্ছে সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত যাবতীয় আন্দোলনগুলিকে। উদ্দেশ্য হলো এই খণ্ডবাচনগুলিকে একসূত্রে গেঁথে পুঁজির বিরুদ্ধে একটা পাল্টা মহাবাচন নির্মাণের চেষ্টা যাতে আর কখনই দৃঢ়মূল না হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করা। এর জন্যই এত অরাজনীতির পরিসর গড়া, এর জন্যই এত 'অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী'র ক্লোনিং করা। এই পরিসরগুলি যদি আবার কোনো কারণে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে একটা সমাজতান্ত্রিক মহাবাচনের পরিসর তৈরি করে ফেলে, তাহলে এই ক্লোনিং করা অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরাই *সহজ পাঠের* শম্ভুর মতো লাঠি হাতে নেমে পড়বে 'রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা' রোধ করতে।

কেন এসব কঠিন কথা বলতে হচ্ছে, সেটা ব্যাখ্যা করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

'অধিকার'-এর পরিসর ও রাজনীতির পরিসর

'অধিকার'-এর ডিসকোর্সের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আছে। সম্পর্ক থাকার কারণ এই যে, অধিকার-এর সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক আছে। স্বার্থ নিয়ে থাকে সামাজিক দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব নিরসনে ক্ষমতা একট বড় ভূমিকা পালন করে, আর এই ক্ষমতাকে ঘিরে সামাজিক মানুষের যে সংঘাত সেটার অভিব্যক্তি হ'লো রাজনীতি। সংঘাতটা যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠে, রাজনীতি তখন নেয় যুদ্ধের চেহারা। অন্য সময় এই রাজনীতি ডায়ালগ থেকে ভোটযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত নানা বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয় আমাদের সমাজ জীবনে। কথাগুলিকে ব্যাখ্যা করা দরকার। স্বার্থবর্জিত কোনো অধিকার-এর অস্তিত্ব যেহেতু হয়না, একথা সকলেই মেনে নেবেন যে আন্দোলন হলো স্বার্থ রক্ষা বা স্বার্থ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। অধিকার নিয়ে আন্দোলন করার কথা তখনই উঠতে পারে, যখন সংশ্লিষ্ট অধিকারটি নিয়ে স্বার্থের সংঘাত থাকে। স্বার্থের সংঘাত না থাকলে আন্দোলন বা সংগ্রামের কথাই ওঠে না। সংঘাত শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। এই 'সংঘাত' কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে ক্ষমতার বিষয়টি। উত্তর আধুনিকতন্ত্রের ভাষাতেই বলা যায়, অধিকার কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট ইস্যুটিতে থাকে একটা আধিপত্যকারী ডিসকোর্স, আন্দোলন হয় এই আধিপত্যকারী ডিসকোর্সের বিপরীতে একটা পাল্টা ডিসকোর্স গড়ার মধ্য দিয়ে, আধিপত্যকারী ডিসকোর্স তার ক্ষমতার সাহায্যে যেটা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সংঘাত বাধে এই নিয়েই। ক্ষমতাকে ঘিরে সামাজিক মানুষের যে সংঘাত সেটারই অভিব্যক্তি হলো রাজনীতি। অধিকারের আন্দোলনে যেহেতু এই ক্ষমতা কেন্দ্রিক সংঘাতটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না, অধিকারের আন্দোলনের পরিসরটিও রাজনীতি মুক্ত থাকতে পারে না। রাজনীতি তাতে থাকতেই হবে, যেহেতু তার কেন্দ্রীয় বিষয় হলো ক্ষমতার সংঘাত। এই রাজনীতি সংসদীয় দলভিত্তিক রাজনীতির চেহারার দেখা না দিতেই পারে। এই রাজনীতি সংসদ বহির্ভূত সশস্ত্র-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ না করতেই পারে। কিন্তু আধিপত্যকারী ডিসকোর্সের বিপরীতে যে পাল্টা ডিসকোর্স নির্মাণের চেষ্টা হয়, তার অভ্যন্তরীণ রসায়নটিতে যা থাকে তা রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এজন্যই বলা যায়, অধিকার আন্দোলনের পরিসরটি রাজনৈতিক ডিসকোর্সের পরিসরের বাইরে অবস্থিত— এই ধারণাটি ভ্রান্ত। আরও বলা যায়, ডিসকোর্স কেন্দ্রিক ক্ষমতার সংঘাত যেহেতু সর্বত্র আছে, সর্বত্রই থাকবে রাজনীতি, কেননা ক্ষমতাকে ঘিরে সামাজিক মানুষের যে সংঘাত রাজনীতির মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটে। সে রাজনীতি হতে পারে রক্তপাতহীন রাজনীতি, ক্ষেত্র বিশেষে তা হয়ে উঠতে পারে রক্তপাতময় রাজনীতি। উত্তর আধুনিক তত্ত্বের অন্যতম দুর্বলতা এই যে খণ্ডবাচন ভিত্তিক ডিসকোর্সগুলির অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল ক্ষমতা-সংঘাত যে আসলে রাজনীতির ডিসকোর্সটির সার্বভৌমত্বই সূচিত করে, এই সত্যটির স্বীকৃতি নেই এই তত্ত্বে।

কথা উঠতে পারে, এবং এই কথাটিই বলা হয়ে থাকে এই বিতর্ক প্রসঙ্গে যে 'রাজনীতি' কথাটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে, 'অরাজনৈতিক' কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে রাজনীতিকে এতটা ব্যাপক অর্থে বিবেচনা না করে। অধিকারের পরিসরেও হয়তো একটা ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি আছে। কিন্তু সে রাজনীতির পরিসর রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি নয়, সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি যে রাজনীতি করে থাকে কিংবা যে রাজনীতির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে উৎখাত করার চেষ্টা করে যাকে বিশেষ কিছু রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী। রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির পরিসর ভিন্ন। অধিকার প্রতিষ্ঠা বা অধিকার রক্ষার আন্দোলন যাঁরা করেন তাঁদের এজেন্ডায় রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি থাকে না, থাকে এমন কিছু দাবিভিত্তিক আন্দোলন যা বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই বিশেষ কিছু ক্ষমতায়নের কথা বলে। রাষ্ট্র-ক্ষমতায় ভাগ বসাবার রাজনীতি এটা নয়, বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের সুবিধা করে দেবার উদ্দেশ্যও থাকে না এই দাবি-ভিত্তিক আন্দোলনে। যাঁরা এই আন্দোলন করেন, বিশেষ কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠার বাইরে কোনো আকাAÇþyও থাকে না তাঁদের। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিছুটা ক্ষমতা অর্জন করে গদি দখলের খেলায় নামার বাসনাও থাকে না এঁদের। এই অর্থে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পরিসরটি রাজনৈতিক পরিসর থেকে ভিন্ন। এবং এই অর্থেই এর পরিসরটি 'অরাজনৈতিক'।

এই বক্তব্যের যাথার্থ্য নিয়েও সংশয় আছে। অরাজনৈতিক দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাগরিক আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার ঘটনা বিরল নয় পৃথিবীতে। পশ্চিম জার্মানির 'সবুজ' আন্দোলন কীভাবে শেষ পর্যন্ত একটা সবুজ পার্টির জন্ম দিলো এবং সেই পার্টি কীভাবে কসভো যুদ্ধে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম রাজনৈতিক মুখ হয়ে উঠলো, সেটা আমরা দেখেছি। উল্টোদিকে এটাও দেখা গেছে যে অরাজনৈতিক চর্চাভিত্তিক বা এনজিও ভিত্তিক আন্দোলন থেকে জনমুখী রাজনীতির দাবিতে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তা থেকে রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এই সব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় অধিকারের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির অংশ হয়ে পড়াটা অসম্ভব কিছু নয়। অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পরিসরটি রাজনীতির পরিসর থেকে ভিন্ন থাকবেই, রাজনীতিকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি হিসেবে সীমায়িত করলেও সে কথা বলা যায় না। বস্তুত আম-আদমি পার্টির উত্থানের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির যোগসূত্রটি ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠছে এমনকি ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশেও।

কেন এটা ঘটতে পারছে, তার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। অধিকার-আন্দোলনের মধ্যে আছে ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি। যত ক্ষুদ্র পরিসরেই এই আন্দোলন সংগঠিত হোক না কেন, তার মধ্যে এই রাজনীতি থাকবেই। এই রাজনীতি যে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, সামাজিক পরিস্থিতি যদি এমন থাকে যে সামান্য সংঘাতের মধ্য দিয়েই এই ক্ষমতায়নে সামিল হওয়া সম্ভব, তাহলে এই রাজনীতি রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক বৃহত্তর রাজনীতিকে পরিহার করেই চলতে পারে। অধিকার আন্দোলনের রাজনীতি সেক্ষেত্রে সীমিত থাকতে পারে তথাকথিত অরাজনৈতিক পরিসরের মধ্যেই। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি যত সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অধিকার আন্দোলনের ক্ষুদ্র রাজনীতি ততই তার বৃত্ত ভাঙতে বাধ্য হয়; অধিকার প্রতিষ্ঠা বা অধিকার রক্ষার আন্দোলনের রাজনীতি যুক্ত হতে শুরু করে বৃহত্তর রাজনীতির পরিসরের সঙ্গে। অধিকার আন্দোলন তখন আর তথাকথিত অরাজনৈতিক পরিসরের মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না। অধিকার আন্দোলনের পরিসরের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিসরের সম্পর্কটা তখন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। ক্ষমতার যে একটা গ্রান্ড ন্যারেটিভ আছে, আর সেই ন্যারেটিভে সব কিছুই রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে পরিস্থিতি বিশেষে, সেটা তখন সকলেই উপলব্ধি করেন। অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সৎ এবং নিষ্ঠাবান নেতাকর্মীরা তখনও যদি রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিসর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন অথবা সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না নিতে থাকেন তবে এই আন্দোলন হাইজ্যাক করে নিতে পারে রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানীরা, পশ্চিমবঙ্গে বন্দিমুক্তি ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে নিয়ে ঠিক যা ঘটেছিলো বছর তিনেক আগে। পরিণামে অধিকার আন্দোলনের ক্ষুদ্র রাজনীতির পরিসরটিও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে— পশ্চিমবঙ্গে এখন যা ঘটছে। অধিকার আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা যদি বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের অধিকার আন্দোলন-ভিত্তিক ক্ষুদ্র রাজনীতির মেলবন্ধন করার কাজটা অবিরত করে যান, 'অরাজনৈতিক' হবার চেষ্টা না করেন, তাহলে এই আন্দোলনভিত্তিক রাজনীতিই সমাজ জীবনে একটা মস্ত ভূমিকা পালন করতে পারে, ঠিক যেভাবে তা করেছে ল্যাটিন আমেরিকায়।

এটা করতে হলে অধিকার আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক উৎস নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে, উত্তর আধুনিক বাচন ভিত্তিক চিন্তার বাইরে গিয়ে একটা গ্রান্ড ন্যারেটিভের ভিত্তিতেই যা করা সম্ভব। সেটার জন্য প্রয়োজন হবে 'শ্রেণী', 'শ্রেণীস্বার্থ', 'শ্রেণীরাষ্ট্র'— এইসব কথাগুলোর পুনরুচ্চারণ। এইসব শব্দগুলো শুনলেই যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন কিংবা মাছি তাড়াবার মতো করে এগুলিকে সরিয়ে দিয়ে সোভিয়েতে কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হতো তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করেন যেসব পন্ডিতবর্গ, তাঁদের উপেক্ষা করেই একথাগুলো বলতে হবে, বলতে হবে মানবাধিকার আন্দোলনকে তার কাȦÇþত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার তাগিদ থেকে।

মানবাধিকারের শ্রেণী রাজনীতি

সোভিয়েত-উত্তর পৃথিবী হলো নয়া-উদারবাদী অর্থনীতির পৃথিবী। পুঁজির ওপর জাতি-রাষ্ট্র আরোপিত যে বাধাগুলি ছিলো, সেগুলি ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে এই নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পৃথিবীতে। পুঁজির সঙ্গে শ্রমের (শ্রমজীবীর) যে যুদ্ধ, পুঁজির সূচনাকাল থেকেই সে যুদ্ধ অসম যুদ্ধ। পুঁজিকে বাঁচতে হয় ক্রমাগত বর্ধিত পুনরুৎপাদনের নিয়ম মেনে আর এই বর্ধিত পুনরুৎপাদন চালাতে হলে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বণ্টনের সময়ে শ্রমিককে দিতে হবে যতটা সম্ভব কম হিস্যা, অর্থাৎ যতটা সম্ভব কম মজুরি। এটা পুঁজি করতে পারে, কারণ সে লড়ে শ্রমিকের এক মজুত বাহিনীর ওপর দাঁড়িয়ে, কর্মরত শ্রমিককে খুশিমতো যেখানে পাঠিয়ে দেবার ক্ষমতা ধরে পুঁজি। লড়াইটা তাই অসম। তবুও শ্রমিক এই মজুরি নিয়ে টানা হেঁচড়া চালায় (মার্কসের ভাষায় পুঁজির সঙ্গে শ্রমের একটা গেরিলা যুদ্ধ চলে), জেহাদ ঘোষণা করে পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতি যাতে সামাজিক সংকটের জন্ম না দেয় তার জন্য আধুনিক রাষ্ট্র পুঁজিকে শাসন করে। তার ওপর জনকল্যাণমূলক কাজের দায় চাপায়। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে কাজের নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তার নানাবিধ আইনি ব্যবস্থা করে। এ রকমই দাঁড়িয়েছিলো ব্যবস্থাটি, বিশেষত রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পরবর্তীকালে এইসব ব্যবস্থা জোরদারই হয়েছিলো পশ্চিম ইউরোপে। সোভিয়েত পতনের পরবর্তী যুগে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পুঁজিকে

শাসনে রাখার জন্য যে সব ব্যবস্থা ছিলো, সেগুলি ক্রমশ তুলে দেওয়া হচ্ছে। পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের যে অসম লড়াই, সে লড়াই-এ শ্রমিক ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে। একের পর অর্জিত অধিকার হারাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, ফলত অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পরিসর ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

লক্ষণীয় যে এই লড়াইগুলো আর খণ্ডবাচনের পরিসরে ধরে রাখা যাচ্ছেনা। প্রতিটি খণ্ডবাচনের মধ্যে ক্রিয়াশীল ক্ষমতার রাজনীতি এখন ক্ষমতায়নের রাস্তা খুঁজছে বৃহত্তর রাজনীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির আঙিনায়। গ্রিসের শ্রমিককে ন্যায্য কাজে ন্যায্য মজুরির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গ্রিসের রাষ্ট্রীয় ঋণ শোধের দায় সংক্রান্ত সমস্যার কথা শুনতে হয় আর তার জবাব খুঁজতে তাকে অধিকার রক্ষা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষুদ্র রাজনীতির বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতিতে নামতে হয়। কর্মহীন মার্কিন শ্রমজীবীকে গড়তে হয় 'ওয়াল স্ট্রিট দখল করো' আন্দোলন। 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস'-এর অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডার পাল্লায় পড়ে নিগৃহীত ল্যাটিন আমেরিকার শ্রমজীবীকে যে আঁকড়ে ধরতে হয় 'একবিংশ শতক-এর সমাজতন্ত্র'র পথ, তার মূলেও আছে অধিকার কেন্দ্রিক খন্ডবাচনের মধ্যে ক্রিয়াশীল ক্ষমতার রাজনীতির সীমাবদ্ধতা, যে সীমাবদ্ধতা কাটাতে গিয়ে সেখানেও ক্ষমতার রাজনীতিকে বেছে নিতে হচ্ছে বৃহত্তর রাজনীতির পরিসর। নয়া উদারবাদের জমানায় শ্রমিকের ওপর পুঁজির আক্রমণ যেহেতু বিশ্বায়িত হয়ে উঠেছে, বিশ্বের সর্বত্রই অধিকারের আন্দোলনগুলি বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে তাদের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে কম বা বেশি মাত্রায়।

লক্ষ্যণীয় যে এইভাবে গড়ে ওঠা অধিকার কেন্দ্রিক আন্দোলনের রাজনীতি সামাজিক দ্বন্দ্বকে প্রকাশিত করছে শ্রেণী রাজনীতির ভাষায়। সেটাই হবার কথা, কারণ শ্রম এবং পুঁজির দ্বন্দ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকত যে রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্র বা জাতিরাষ্ট্র এখন পিছু হটছে, আধিপত্যকারী ডিসকোর্স এখন পুঁজির ডিসকোর্স, আর সেই ডিসকোর্সের পাল্টা ডিসকোর্স গড়ার মরণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে শ্রম অর্থাৎ শ্রমজীবী। ক্লাসিকাল অর্থেই এই ডিসকোর্সের অন্তহীন ক্ষমতকেন্দ্রিক রাজনীতি হলো শ্রেণী রাজনীতি। 'শ্রেণী' শোনামাত্র যাঁরা মানুষের বহু পরিচয়ের ডিসকোর্সগুলি খুঁজতে শুরু করেন, বিশ্বায়নের যুগের আন্তর্জাতিক পুঁজি তাদের জন্য কোনো পরিসরই খালি রাখছে না। পুঁজির বেআব্রু আক্রমণের মুখে সব পরিচয়ের ওপরে উঠছে মানুষের শ্রমভিত্তিক পরিচয়সত্তা, কারণ পুঁজির আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে মানুষের এই পরিচয়-সত্তাটির ওপরই। এমন কি পুঁজির বৃত্তের বাইরে থাকা মানুষরা, শ্রমজীবীদের সঙ্গে যাঁদের পরিচয়সত্তার তফাত আছে, বিশ্বায়িত পুঁজি নূতন করে পুঁজির সঞ্চয় ঘটাবার তাড়নায় আক্রমণ করছে সেইসব মানুষদেরও। জল জমি জঙ্গলের অধিকার রক্ষার ব্যস্ত কৃষক বা মূলবাসী মানুষদের অস্তিত্বের সংকটে ফেলছে কর্পোরেট পুঁজি, সারের বিচারে যা আন্তর্জাতিক পুঁজিরই অংশবিশেষ। তাঁদের যে অধিকার রক্ষার সংগ্রাম, ক্ষমতার রাজনীতির বিচারে সেটার সঙ্গে পুঁজির সঙ্গে সরাসরি সংগ্রামে লিপ্ত শ্রমজীবীদের ক্ষমতায়নের রাজনীতির আর কোনো তফাতই থাকছে না। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে শ্রমভিত্তিক একটা গ্রান্ড ন্যারেটিভ।

কেন অধিকার কেন্দ্রিক এই সব রাজনীতি শ্রেণী রাজনীতির চেহারা নিয়ে হাজির হচ্ছে সেটার কারণ খুঁজতে হলে আজকের আন্তর্জাতিক পুঁজির বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে। আজকের আন্তর্জাতিক পুঁজি জাতিরাষ্ট্র আরোপিত বাধাগুলিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। বলা উচিত যে সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে যাবার পর শক্তির ভারসাম্য পুঁজির দিকে চলে যাওয়ায় জাতিরাষ্ট্রের দিক থেকেও এই আশঙ্কা আর ছিলো না যে জাতিরাষ্ট্র আরোপিত বাধাগুলি অপসারিত হয়ে গেলে শ্রমিক বিদ্রোহের চাপে সমাজব্যবস্থাই বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং তার ফলে পুঁজি বিপন্ন হয়ে পড়বে। সুতরাং পুঁজি এই বাধা অতিক্রম করেছে একথা যেমন সত্য, পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী যে জাতিরাষ্ট্র, সেই জাতিরাষ্ট্রও এইসব বাধা তুলে নেবার কাজে সোৎসাহে নেমে পড়ছে। এর ফলে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছে বিশ্বজুড়ে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠলে অর্থনীতি কেন্দ্রিক মানুষের যে পরিচয়, পুঁজির বিপরীতে যে পরিচয়ের একটিই মাত্র আছে— শ্রমজীবীর মাত্রা, সেই একমাত্রিক পরিচয়েই মানুষকে চিহ্নিত করার বাস্তবতা জোরদার হয়ে ওঠে। সেই শ্রমজীবী কায়িক শ্রম করতে পারে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। অথবা স্রেফ মানসিক শ্রম করতে পারে বিপিও-র কর্মী হিসেবে কিংবা ইনটেলের কমপিউটার হার্ডওয়ার্ড ডিভিশনে। কিন্তু আজকের আন্তর্জাতিক পুঁজির মার দুক্ষেত্রেই নেমে আসতে পারে যে কোনো সময়, দুক্ষেত্রেই আজ চরম অর্থনৈতিক অনিশ্চয়— জনকল্যানমুখী রাষ্ট্রনীতির যুগে যা ছিলো না— কেননা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে কর্মনিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা, কোনটাই এখন আর এই শ্রমজীবী ভোগ করে না। ঠিক এরকমই পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়েছে আজকের যুগে। এটা ঘটেছে আজকের বিশ্বায়নের নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে। অদূর অতীতেও এই পরিস্থিতি ছিলো না।

এর নিট ফল এই দাঁড়িয়েছে যে মানুষের যে অন্যসব পরিচয়সত্তা আছে, সেইসব পরিচয়সত্তা-ভিত্তিক ডিসকোর্সগুলির গুরুত্ব কমছে কিংবা সেই ডিসকোর্সগুলিও পুঁজিবিরোধী ডিসকোর্স-এর অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। যে যুবক কর্মজগতে চরম অনিশ্চয়তার শিকার হয়েছে যদি সে সমকামী হয় তাহলে তার সমকামী পরিচয়সত্তার ডিসকোর্স নিয়ে এতটা ভাবার সময় তার এখন আর থাকবে না, যতটা সময় তার থাকতে পারত সামাজিক নিরাপত্তার নেটওয়ার্ক দিয়ে পুঁজিকে যখন ঘিরে রাখা হতো, সেই প্রাক্ বিশ্বায়ন পর্বে। অন্যদিকে, এটাও ঘটতে পারে,

এবং বহু ক্ষেত্রে এটাই ঘটছে যে বিশ্বায়নের পুঁজি নারীর ওপর আক্রমণ তীব্রতর করেছে, ফলত পুরুষ আধিপত্যর বিরুদ্ধে যে নারী বিরোধী ডিসকোর্স, তার গুরুত্ব কমে আসছে নারীদের ক্ষেত্রে। পুঁজির আক্রমণ সামলানোটাই প্রধান হয়ে পড়ছে নারী শ্রমজীবী, এমনকি গার্হস্থ্য শ্রমে যার সময় কাটে সেই শ্রমের বাজারের বাইরে অবস্থিত নারীদের ক্ষেত্রেও। পুরুষ শাসিত সমাজ এখন তার কাছে পুঁজি শাসিত সমাজের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। যে নারী পুঁজির অনুগ্রহে বিপুল বৈভবের মুখ দেখছে, তার সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত তার ভগিনীর দূরত্ব বাড়ছে বিপুল মাত্রায়। দুজনকে আর অনায়াসে এক নারীবাদী ডিসকোর্সের অংশীদার করা যাচ্ছে না।

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা আদৌ ঠিক হবে না যে মানুষের যে বহুবিধ পরিচয় আছে, সেটা নাকচ হয়ে গেছে বিশ্বায়নের যুগে। এটা ভাবাও ঠিক হবে না যে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ কিংবা পরিচয়মাত্রার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকত্বর তত্ত্ব (determinism and essentialism) নিয়ে উত্তর আধুনিক তাত্ত্বিকদের যে সমালোচনা, সেটার গুরুত্ব আজ আর নেই। (যদিও এটা বলা যেতেই পারে যে চিরায়াত মার্কসবাদ কখনই নির্ধারণবাদ বা অত্যাবশ্যকত্বর তত্ত্বকে অনুমোদন করে না)। মানুষের বহুবিধ পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়গুলি ঘিরে মানুষের নানা ডিসকোর্স আছে। শুধু যে বিষয়টা আমরা খেয়াল করতে বলছি তা হল, নয়া উদারবাদী অর্থনীতির যুগে শ্রমজীবীর ওপর পুঁজির আক্রমণ যত তীব্র হয়ে উঠছে, ততই পুঁজিকে ঘিরে শ্রমজীবীর যে ডিসকোর্স, সেটা প্রাধান্যে চলে আসছে এবং অন্যসব পরিচয়সত্তা ভিত্তিক ডিসকোর্সের গুরুত্ব কমছে। শুধু তাই নয়, ডিসকোর্স ভিত্তিক যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সেটা এখন বেশি বেশি করে শ্রেণী রাজনীতির চেহারা নিয়ে হাজির হচ্ছে এবং তা রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির পরিসরে প্রসারিত হচ্ছে। অধিকার প্রতিষ্ঠার ডিসকোর্সের মধ্যে যে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি থাকে, যে রাজনীতি রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির বাইরে ক্রিয়াশীল এবং এই অর্থে যা অরাজনৈতিক হিসেবে চিত্রিত করার একটা প্রবণতা থাকে অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে, সেই রাজনীতিই আজকের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। 'অরাজনৈতিক' মানবাধিকার কর্মীদের এই সত্যটি বুঝতে হবে নতুবা তাঁদের প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়া আন্দোলনের ফসল প্রতিক্রিয়াশীলদের গোলায় উঠবে। কীভাবে সেটা ঘটে পরবর্তী উপবিভাগে তা আলোচনা করবো।

রাষ্ট্র, অধিকার আন্দোলন ও রাজনীতি

নয়া উদারবাদী অর্থনীতির যুগে পুঁজির ওপর জাতিরাষ্ট্র আরোপিত বাধাসমূহের অবসান ঘটছে ক্রমাগত। কিন্তু জাতি-রাষ্ট্র এই অবস্থায় পুঁজি এবং শ্রমের যুদ্ধে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করছে এটা ঠিক নয়। জাতি-রাষ্ট্র কাজ করছে পুঁজির পক্ষেই। কীভাবে তা করছে জাতিরাষ্ট্র সেটা ভাবা যেতে পারে। সংকটে পড়লে পুঁজি জাতি-রাষ্ট্রের হাত ধরেই সংকট কাটানোর চেষ্টা করে। চিরদিনই পুঁজি সেটা করে থাকে। বিশ্বায়নের যুগেও সেটাই ঘটছে এবং ঘটবে। ২০০৮-এর বিশ্ব-মন্দার প্রেক্ষিতে তা আর এক রূপ প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু তার বাইরে অর্থনীতি নিয়ে রাষ্ট্রের যা দায়িত্ব, ক্রমশ তা সংকুচিত করে দেওয়া হচ্ছে বর্তমান যুগে। রাষ্ট্র কর্পোরেট ট্যাক্সের হার কমিয়ে আনছে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে আসছে বড় ধরনের সংস্কার। ঋণের টাকায় সমাজসেবা করা চলবে না, কাজেই রাষ্ট্রীয় ঋণ কমিয়ে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বেঁধে দিতে হবে। দেশে দেশে রাজকোষ নীতি এভাবেই পরিবর্তিত হচ্ছে মূল্যস্ফীতি রোধ করার নামে। রাষ্ট্র-চালিত অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিতে বিলগ্নিকরণ করতে হবে। এর অর্থ, সরকারি সম্পত্তি যা আছে তা বেসরকারি হাতে তুলে দিতে হবে, সরকারি কাজ বেসরকারি সংস্থার কাছে 'আউটসোর্স' করার ব্যবস্থা করতে হবে। বস্তুত প্রতিরক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ছাড়া আর কোনো কিছুর দায় রাষ্ট্রের ওপর থাকবে না। নয়া উদারবাদ মনে করে বাজার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সে সব পরিষেবা পৌঁছে যাবে নাগরিকের কাছে। এমনকি প্রতিরক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু ক্ষেত্রের কাজও বেসরকারি সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা যেতে পারে, এই চিন্তাও প্রবল হয়ে উঠছে ইদানিং। প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসের বোলবেলাও যে বেড়ে উঠছে এই বিশ্বায়নের যুগে, সেটাও এসেছে এই অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার একাংশ বেসরকারিকরণের নয়া উদারবাদী নীতির হাত ধরে।

যাই হোক, এই অবস্থায় রাষ্ট্র যাঁরা চালান, প্রশাসন বিচারব্যবস্থা আইনসভা কেন্দ্রিক যে রাজপুরুষরা আছেন, এঁদের কাজ কী? নয়া উদারবাদী চিন্তার তাত্ত্বিক রূপকার ফ্রেডরিখ হায়েক বহু আগেই বলে গেছিলেন (Law, Legislation, Liberty; মার্গারেট থ্যাচার যাকে এই নয়া উদারবাদী যুগের বাইবেল হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন), এঁদের কাজ দাঁড়াবে বাজারব্যবস্থা যাতে ঠিকমতো কাজ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আইনি ব্যবস্থাকে দৃঢ়মূল করা, অর্থাৎ যে সব প্রতিষ্ঠান মারফত বাজার ব্যবস্থা কর্যকর হয় সেই প্রতিষ্ঠানগুলির আইনি রূপ দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠানটি যাতে আইন মোতাবেক চলে সেটা দেখভাল করা। রাষ্ট্র নিজে কিছু করবে না, তার কাজ ইংরেজিতে যাকে বলে 'facilitator', সেটাই। একমাত্র তখনই রাষ্ট্র এই ব্যবস্থাটিতে হস্তক্ষেপ করবে, যখন তা সংকটে পড়বে। সংকট কাটানোতেও তার ভূমিকা সহায়ক বা ফেসিলিটেটর-এর। মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি হবে এর ফলে এবং তারই ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত হলে মানুষের স্বাধিকার বাড়বে এবং তার ফলে অর্থনীতি বহির্ভূত অধিকারের ক্ষেত্রগুলিতেও

মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি ঘটবে। নারীর অধিকার কিংবা সমকামীর অধিকার নিয়ে তখন আর মাথা ঘামানোর দরকার থাকবেনা।

দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত এই তত্ত্বটির বিরুদ্ধ যুক্তি কী আছে, সে নিয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যেটা লক্ষ্য করা যেতে পারে তা হলো, সোভিয়েত-উত্তর পৃথিবীতে এই তত্ত্বটির গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণের কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে। 'রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি অদক্ষতার ধাত্রীভূমি' এ কথাও এখন সামাজিক মান্যতা পেয়ে গেছে। বেসরকারি উৎপাদনক্ষেত্রে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ী ব্যাংক-ঋণ থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সর্বত্র ভারতবাসী এটা জেনে গেছে যে বেসরকারি পুঁজির হাত ধরেই অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে এবং ক্ষুদ্র চাষির ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকি বন্ধ করাই যুক্তিসংগত। সবাই এটা মেনে নিয়েছে যে নয়া উদারবাদের বিকল্প নেই (TINA), সবাই উদ্গ্রীব হয়ে লক্ষ্য করে বিদেশী পুঁজি ভারতকে বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে বাছতে চাইছে কিনা, বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে ভারতের 'রেটিং' কী। সবাই জানে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম মেনেই চলতে হবে, পেটেন্ট আইনে এরকম পরিবর্তন এলেই দশ টাকার ওষুধকে একশো টাকায় বিক্রি করার ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। এসব নিয়ে বিতর্ক নেই।

বিতর্ক নেই বলেই রাষ্ট্রনেতাদের কাজের পরিধি সংকুচিত হয়ে গেছে এবং রাজনীতির সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদির দাড়ি কিংবা রাহুল গান্ধির পাঞ্জাবির হাতা গোটানোর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে নির্বাচনে, এটা এখন আলোচ্য বিষয়, কেননা মূল বিষয় নিয়ে এখন একটা ঐকমত্য এসে গেছে সংসদীয় রাজনীতির চৌহদ্দিতে। জনগণও জানেন ভোটে যা-ই হোক, পেটেন্ট আইন বদলাবে না, বিলগ্নিকরণ বন্ধ হবে না, নিয়োগ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রর কোনো দায় থাকবে না, সামাজিক সুরক্ষা বাজার থেকেই কিনতে হবে কারণ পেনশন আইন বদলাবে না। ফিরিস্তি আরও লম্বা করা যায়, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তার আর প্রয়োজন নেই। মোটের ওপর কথাটা এই যে, নয়া উদারবাদের যুগে রাষ্ট্র-দর্শন বদলে গেছে, রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির চৌহদ্দিও নতুন করে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

এই অবস্থায় অধিকার-এর আন্দোলনের চৌহদ্দিও বদলে দেবার চেষ্টা চলছে। অধিকার সংক্রান্ত যেসব আন্দোলন নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলে যাবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলিকে 'রাজনীতির ব্যাপার' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা একদল 'অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী' এই সব আন্দোলন কিছুটা দানা বাধা মাত্র 'বড় বেশি রাজনীতি হচ্ছে' বলে চিৎকার তুলছেন। রাজনীতির কারবারিরা কীভাবে এগুলো কব্জা করছে সে নিয়ে তাঁরা প্রবন্ধ লিখছেন, টিভিতে টক-শো করে মুন্ডপাত করছেন এই 'রাজনীতির কারবারিদের', এঁদের চিন্তায়, অধিকার সংক্রান্ত সেইসব আন্দোলনই করা যাবে যা রাষ্ট্রের এই নয়া সংজ্ঞায়িত সীমানাটিকে মেনে নিয়ে ডিসকোর্স ভিত্তিক ক্ষমতার রাজনীতিতেই অধিকার আন্দোলনকে সীমিত রাখে। সমস্যা হলো এত নির্বিষ আন্দোলন আজকাল আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। পুঁজির প্রবল আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে অধিকার কেন্দ্রিক সামান্য আন্দোলনও আজ নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে এই কারণে যে রাষ্ট্র তার কাজের সীমানাকেই সংকুচিত করে আসছে। বাজারমুখী নয়া উদারবাদী ব্যবস্থায় অতি সহজেই 'ক্রেতা সুরক্ষা'র অধিকার নিয়ে আন্দোলন করা যায়, সে আন্দোলনকে 'অরাজনৈতিক' পরিসরে সীমিত করে রাখাও সম্ভব। কেননা সে আন্দোলনে যে ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি থাকে সেটি নবসংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু এই 'সুরক্ষার' আন্দেলনকেই যদি কাজের সুরক্ষার অধিকারে বিস্তৃত করা হয়, রাষ্ট্র কিছুই করতে পারে না, কেননা কাজের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এখন বাজারের ইচ্ছাধীন, রাষ্ট্র সেখানে নাক গলাতে পারে না। এই অধিকার চাইতে গেলেই সেটা আর অধিকার রক্ষা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মর্যাদা পাবে না, ওটা হবে পলিটিক্সের ব্যাপার এবং এটা যে দলীয় রাজনীতির ব্যাপার, অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা সে বিষয়ে একমত হয়ে যাবেন। তারা বরং ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ক্রেতা সুরক্ষার দাবিতে অরাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করা নিয়ে।

মুশকিল হলো ক্রেতা হিসেবে বাজারে প্রবেশের জন্য যে টিকিট লাগে, যার উপর দাঁড়িয়ে ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলন করা যায়, সে টিকিট পেতে হলে লাগে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার, সমাজের সদস্যরা যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বেশী উদ্গ্রীব। এ জন্যই নির্বিষ কোনো অধিকার আন্দোলনের এজেন্ডাই আজকাল আর দাঁড় করানো যাচ্ছে না। অধিকার আন্দোলন এমন সব ইস্যুতেই দানা বাঁধছে, যেগুলি রাষ্ট্রের এই নবসংজ্ঞায়িত সমাজকেই মানতে চাইছে না। এই কারণেই ডিসকোর্স ভিত্তিক ক্ষমতায়নের রাজনীতি প্রায় ব্যতিক্রমহীন ভাবে বৃহত্তর অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি কেন্দ্রিক ক্ষমতার রাজনীতির চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ছে। অধিকার আন্দেলনের সঙ্গে যুক্ত অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা সভয়ে আবিষ্কার করছেন যে সবকিছুই শেষ পর্যন্ত 'রাজনীতির কারবারিদের চৌহদ্দিতে গিয়ে পড়ছে।

এই অবস্থায় অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একটি প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, অধিকার আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের যে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। অধিকার রক্ষার সামান্য আন্দোলনও যেহেতু বৃহত্তর রাজনীতির এলাকায় চলে যাচ্ছে, এই সব আন্দোলনের অরাজনৈতিক চরিত্রকে কাজে লাগিয়ে এর মধ্যে ঢুকে পড়ছে একদল সুযোগসন্ধানী যারা এগুলিকে হাইজ্যাক করে নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজেদের

এরপর ৭৫ পৃষ্ঠায়

অধিকার চেতনা

সমাজতন্ত্রে মানুষের অধিকার

শ্যামল দাস

'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা'র আলোকে ১৯১৮-র সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধান-একটি প্রাথমিক আলোচনা

১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরই ৮ই নভেম্বর ১৯১৭ লেনিন কৃষিজমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সনদ ঘোষণা করেন। তিনি জানতেন জমির প্রশ্নের সীমাহীন গুরুত্ব। সাথে সাথে এও জানতেন কৃষিজমি প্রকৃত কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে না পারলে বিপ্লব টিকিয়ে রাখা ও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসাধ্য। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর, সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কৃষকদের সাথে প্রতারণা করেছিল কেরেনেস্কি সরকার। আর এই প্রতারণার সাথী ছিল মেনশেভিক ও সমাজগণতন্ত্রী বিপ্লবীরা। আইনত ১৮৬২ সালে ভূমিদাস প্রথা রদ হলেও রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকেছিল ব্যাপকভাবেই। কৃষকদের হাতে জমির অধিকার অর্পণ করার সনদই ছিলো অক্টোবর বা নভেম্বরের বিপ্লবের প্রথম গণতান্ত্রিক সনদ। যে সনদ প্রকৃত উৎপাদকদের হাতে উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ চাষযোগ্য জমি ফেরত দিয়েছিলো।

এরপর ১৫ নভেম্বর ১৯১৭ সোভিয়েত বহু তর্কবিতর্কের পর আরেক দফা অধিকার সংক্রান্ত সনদ ঘোষিত হয়। আর এই সনদটি ছিলো রুশ শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বিজয়ী বিপ্লবের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা। প্রথমত, কৃষকদের মুক্তির পর সৈনিক ও নাবিকদের ঊর্ধ্বতন সেনা অফিসারদের স্বৈরতান্ত্রিক নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সেনা অফিসার নিয়োগের পদ্ধতিতে বদল আনা হলো। এতদিন সেনাবাহিনী-নৌবাহিনীতে অফিসার হিসাবে যোগ দিতেন অভিজাতরা। আর সাধারণ সৈন্য ও নাবিক হতেন গ্রামাঞ্চলের কৃষক পরিবারগুলির সন্তানেরা। সে-কারণে রাশিয়ান সৈন্যদের বলা হত "উর্দিপরা কৃষক"। ১৫ নভেম্বরের সনদ অনুযায়ী সমস্ত সেনা অফিসারদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং প্রয়োজনে তাদের ফিরিয়ে নেবারও সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের মুক্তির জন্যে সমস্ত কারখানা, মিল বাজেয়াপ্ত করে সোভিয়েতের অধীনে আনা হলো। রাশিয়ার সমস্ত জনগণের উপর থেকে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটানো ছিল এই সনদের লক্ষ্য।

এছাড়াও ১৫ নভেম্বর ১৯১৭-র এই সনদে সংখ্যালঘু জাতির অবদমন এবং ধর্মীয় সংখ্যাগুরু কর্তৃক ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অবদমন নির্মূল করার লক্ষ্যে আরও চারটি ঘোষণা করা হলো:

১) রাশিয়ার সমস্ত জনগণের সাম্য ও সার্বভৌমত্ব;
২) রাশিয়ার জনগণের মুক্ত আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার; এমনকি বিচ্ছিন্ন হওয়ার, স্বাধীনতা ঘোষণা করার অধিকার;
৩) সমস্ত জাতিগত, ধর্মগত সুবিধা ও বাধার অবসান;
৪) জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু ও জনগোষ্ঠীর মুক্ত বিকাশের অধিকার।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই এই গণতান্ত্রিক ঘোষণাগুলি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া। এই ঘোষণাগুলির মাধ্যমে এতদিনকার অর্থনৈতিক-সামাজিক-জাতিগত-ধর্মীয় শোষণ-নিপীড়নের মূলে আঘাত করা হয়েছিল। নিপীড়কদের অধিকারের বিপরীতে নিপীড়িত ও শ্রমজীবী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপে রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াই চালিয়ে জয়যুক্ত হয়েছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। কোথাও কোথাও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপসও করা হয়েছিল। আর এই বিপ্লবগুলির পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে রাষ্ট্রের মালিক হয়েছিলো কার্যত মালিকশ্রেণী। তারা ছিলো উৎপাদনের উপকরণের মালিক। সংখ্যাগুরু মানুষ ছিলেন মজুরি-শ্রমিক, যদিও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এই মজুররাই ছিলেন লড়াইয়ের সামনের সারিতে। এ ইতিহাস আমাদের জানা আছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে যে সংখ্যালঘু পুঁজিপতিরা ক্ষমতায় উপবিষ্ট হলেন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শাঁসটা তাঁরাই নিলেন। ছিবড়ে পেলেন মজুরি-শ্রমিকরা। কারণ এই বিপ্লবগুলি অধিকার সংক্রান্ত যে সনদগুলি গ্রহণ করলো তাতে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা রেখে দেওয়া হলো মালিকশ্রেণীর হাতে। অর্থাৎ এ এমন এক গণতন্ত্র যেখানে আইনের চোখে সবাই সমান বা প্রত্যেকরই নির্বাচিত করার বা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার আছে বা প্রত্যেকেই একটি মাত্র ভোট দেবার অধিকারী। কিন্তু উৎপাদনের উপকরণের মালিক (জমি বা কারখানা) পুঁজিপতি বা অভিজাতরা।

ধরুন আম্বানি-টাটা-হিন্দুজারও একটি ভোট, আবার শ্রমিকদেরও একটি ভোট। ৪৫০০ কোটির প্রাসাদের মালিক মুকেশ আম্বানির একটি ভোট বা মুম্বাইয়ের ঝোপড়-পট্টির

ঝুপড়ি মালিক সেলিমেরও একটি ভোট। পুলিশ অফিসার অঙ্কিত গর্গের একটি ভোট এবং সোনি সোরিরও একটি ভোট। বাথানিটোলায় উচ্চবর্ণের জোতদারদের বাহিনীর হাতে নিহতদের জীবিত অবস্থায় ছিল একটি করে ভোট এবং উচ্চবর্ণের জোতদারদেরও একটি করে ভোট। সুতরাং সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সমস্ত নাগরিকের অধিকার সমান। আমরা যারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে নাগরিক এবং নিপীড়িত মানুষের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হই ভাবিত হই তারা এবং নিপীড়িত মানুষরা নিজেরাও জানেন যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পিরামিডের শীর্ষে বা তার কাছাকাছি যারা থাকেন বাস্তবত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সুফল তাদের ভোগেই বেশি জোটে। ক্ষমতার পিরামিডের শীর্ষে বা তার কাছাকাছি যারা থাকেন, 'অধিকার'এর বাস্তব ও প্রায়োগিক সুবিধা তাঁরাই বেশি ভোগ করেন।

রোমক দাস-সমাজে কি গণতন্ত্র ছিল না? সেনেটর ছিল, অমাত্য ছিল। তারা আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিত। পুরোহিতরাও ছিল তাদের পাশে। দাসরা তো না-মানুষ— তাদের আবার গণতন্ত্র কি? আসলে দাস-ব্যবস্থার যুগের গণতন্ত্র ছিল দাস-মালিকদের গণতন্ত্র। যেমন সামন্ততন্ত্রে ছিল সামন্তপ্রভুদের 'গণতন্ত্র'। সামন্ততন্ত্রের পরাজয়ে বিজয়ী বুর্জোয়ারা যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সেটা আসলে উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের বা বুর্জোয়াদের গণতন্ত্র। আর এই সারবস্তুটাকে আড়াল করার জন্য আওয়াজ তোলা হয় 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'-র। এই সমগ্র শ্লোগানটির মাধ্যমে সুচতুরভাবে আড়াল করা হয় মালিকানার প্রশ্নটিকে, উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার প্রশ্নটিকে— সে কৃষি-জমিই হোক বা কারখানা, খনি বা কাপড়কল। শ্রমিক ও শ্রমজীবী বা প্রান্তিক মানুষকে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য অত্যন্ত চতুরতার সাথে ব্যবহার করা হলো 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র শ্লোগানটিকে। সে কারণেই সম্পত্তি-সম্পর্ক বিযুক্ত গণতন্ত্রে অধিকারের প্রশ্ন সংখ্যাগুরু শ্রমজীবী জনগণের কাছে সোনার পাথরবাটি।

তা সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্র থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সমাজ সামান্য হলেও এগোলো। জমিতে আবদ্ধ 'ভূমি-দাস' মুক্ত হয়ে তার শ্রমশক্তি কোথায় বিক্রি করবে— সে স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৯১৭-নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে নির্মিত, উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার ভিত্তিতে নির্মিত বা ঘোষিত সামাজিক অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে উল্টে দেওয়া হয়। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা হয় প্রত্যক্ষ উৎপাদকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় অথবা 'স্বাধীন উৎপাদকদের স্বেচ্ছাসংঘ' সমস্ত উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা পায়। চরিত্র ও রূপে যা সমস্ত ধরনের অতীত উৎপাদন সম্পর্কগুলির বিপরীত।

১৯১৭-র নভেম্বর ৭ ও ১৫ তারিখের সনদগুলির ধারাবাহিকতায় ১৯১৮-র ১০ই জুলাই সোভিয়েত কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাংবিধান গৃহীত হয়। প্রস্তাবনাতেই শ্রমজীবী এবং শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই সমগ্র সোভিয়েত রিপাবলিক-এর একমাত্র মূল আইনি লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়। সমস্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই সংবিধানের পাঠ ও ব্যাখ্যা আবশ্যিক করা হয়। যার অর্থ আগামী প্রজন্মের কাছে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির প্রশ্নকে গুরুত্ব সহকারে হাজির করা।

প্রথম সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল 'শ্রমজীবী ও শোষিত মানুষের অধিকারের ঘোষণা'— রাশিয়াকে শ্রমিক, সৈন্য ও কৃষকদের সোভিয়েত বলে ঘোষণা করা হয়। এটা ছিল প্রথম ঘোষণা। দ্বিতীয় ঘোষণায় রাশিয়ান সোভিয়েত রিপাবলিককে মুক্ত জাতিগুলির মুক্ত মিলন হিসাবে ঘোষিত হয়। প্রথম সনদের প্রথম অধ্যায়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সংবিধান ঘোষণা করে যে সোভিয়েত রাষ্ট্র মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ, শ্রেণী বৈষম্যের অবসান, পৃথিবীর সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করবে :

ক) জমির সামাজিকীকরণের জন্য জমির ও ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটনার জন্য বিনা ক্ষতিপূরণে সব জমি জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা এবং কৃষকদের মধ্যে তা যে যতটা চাষ করতে পারবে এই নীতির ভিত্তিতে বণ্টন করা।

খ) সমস্ত বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, জলসম্পদ এবং জনগণের ব্যবহারযোগ্য সমস্ত কিছুই, সমস্ত দ্রব্যাদি ও প্রাণীকুল, কৃষি খামার এবং কৃষি সংস্থা জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয়;

গ) সমস্ত কল-কারখানা, রেলপথ ও পরিষেবা এবং উৎপাদনের উপকরণ ও পরিবহন ব্যবস্থা সোভিয়েত রিপাবলিকের সম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত হয় এবং শ্রমিক সোভিয়েতের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

ঘ) আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও লগ্নি পুঁজির প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পূর্বতন জার সরকার, জমিদার বা পুঁজিপতিরা যে ঋণ নিয়েছিল তা নাকচ করার ব্যাপারে সোভিয়েতের তৃতীয় সম্মেলনে আলোচনা চলছে। দুনিয়া জুড়ে শ্রমিক বিদ্রোহ জয়লাভ করা পর্যন্ত সোভিয়েত সরকার এই পথেই যাবে।

ঙ) সমস্ত ব্যাঙ্ক মালিকানা বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রমিক ও কৃষকের সরকার। পুঁজির নিগড় থেকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

চ) পরগাছা বা পরশ্রমজীবীদের উৎখাতের লক্ষ্যে শ্রমের

প্রতি শাশ্বত দায়বদ্ধতার সিদ্ধান্ত হয়।

ছ) শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে এবং শোষকদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকদের সশস্ত্র করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এবং সমাজতান্ত্রিক লাল সেনা সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলিকে নিরস্ত্র করারও সিদ্ধান্ত হয়।

তৃতীয় কংগ্রেসে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বশান্তি লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার জন্য শিশু সমাজতন্ত্রের দৃপ্ত ঘোষণা। পুঁজিবাদী সভ্যতা সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে যেভাবে উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছে তার অবসানের জন্য শিশু সোভিয়েতের ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। ১৯১৮-র এই সংবিধানেই ফিনল্যান্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ও আর্মেনিয়ার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের (সেলফ ডিটার্মিনেশন) অধিকার স্বীকৃত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে সোভিয়েত সরকারের সমস্ত শাখায় শোষকদের সমস্ত ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয় এবং শ্রমিক, সৈন্য ও কৃষকদের ডেপুটিদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়। সোভিয়েত সংবিধানের দিশামুখ এইভাবেই নির্ণিত হয়েছিলো ১৯১৮-র জুলাই মাসের সারা রুশ সোভিয়েতের তৃতীয় অধিবেশনে।

১৯১৮-র এই সংবিধানকে খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে পুঁজিপতিদের বা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবানদের দ্বারা মানুষের শোষণ মুক্তির দিশায় অবিচল ছিলো এই সংবিধান। সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্শর্ত যে পুঁজিবাদের বিনাশের বা ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা— তার শুরু হয়েছিল শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্র কর্তৃক এই সংবিধানের গ্রহণে।

শিক্ষাকে সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্ত করে শ্রমজীবীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ঘোষণা করে এই সংবিধান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। জনগণকে যেমন ধর্ম পালনের অধিকার দেওয়া হয়, ঠিক তেমনই ধর্ম বিরোধিতার অধিকারও সংবিধানে স্বীকৃত হয়।

আমরা এখন দেখতে চেষ্টা করব ১৯১৮-র সোভিয়েত সংবিধান অনুযায়ী শাসন ক্ষমতার বিন্যাসকে। আর্টিক্‌ল ৩-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'দি অল রাশিয়ান কংগ্রেস অফ সোভিয়েত ওয়ার্কার্স, পিজ্যান্টস, কসাক্‌স, রেড আর্মি ডেপুটিজ'। সোভিয়েত সরকারের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানটির নাম 'অল রাশিয়ান কংগ্রেস অফ সোভিয়েট্‌স'। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিলো প্রতিনিধিত্ব-মূলক। শহরাঞ্চলে প্রতি ২৫ হাজার ভোটার নির্বাচিত করতেন একজন প্রতিনিধি ও গ্রামাঞ্চলে ১লক্ষ ২৫ হাজার ভোটার প্রতি নির্বাচিত হত একজন প্রতিনিধি। বছরে কমপক্ষে দুবার অল রাশিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা বাধ্যতামূলক ছিলো। বিশেষ পরিস্থিতিতে বা এক তৃতীয়াংশ আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলির অনুরোধে অল রাশিয়ান কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন ডাকা যেত। অল রাশিয়ান কংগ্রেস নির্বাচিত করত ২০০-র বেশি সদস্য, যারা গঠন করতেন অল রাশিয়ান কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি। এই কার্যকরী সমিতির দায়িত্ব ছিল অল রাশিয়ান কংগ্রেস অফ সোভিয়েতকে পরিচালনা করার এবং দুটি অধিবেশনের অন্তর্বর্তী পর্যায়ে এই কার্যকরী সমিতিই দায়বদ্ধ থাকত সোভিয়েত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য।

এই কার্যকরী সমিতির হাতেই সোভিয়েত শাসনের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এই কার্যকরী সমিতি আবার গঠন করে কাউন্সিল অফ পিপল্‌স্ কমিশার, যাদের ওপর ন্যস্ত হয় সোভিয়েত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তরগুলির দায়িত্ব। এই কার্যকরী সমিতি কাউন্সিল অফ পিপ্‌ল্‌স কমিশারদের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ গ্রহণ বা খারিজ করতে পারত। কাউন্সিল অফ পিপ্‌ল্‌স কমিশনারদের রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচনার জন্য অল রাশিয়ান কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সামনে রাখা হত গ্রহণ বা খারিজের জন্য। সর্বমোট ১৭টি জনগণের কমিশারিয়েট বা দপ্তর ছিল: বিদেশ, সেনা, নৌবাহিনী, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা, বিচার, শ্রম, সামাজিক কল্যাণ, শিক্ষা, ডাক ও তার, জাতীয় মন্ত্রক, অর্থ, পথ ও পরিবহন, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প, জাতীয় সরবরাহ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, সুপ্রিম সোভিয়েত অফ ন্যাশনাল ইকনমি ও জনস্বাস্থ্য। এই কমিশারিয়েটগুলি ছিল এক একটি কমিটির অধীন আর কমিশার সেই কমিটির প্রধান। সোভিয়েত সরকারের দপ্তর বা মন্ত্রক বিষয়ে এগুলিই ছিল ১৯১৮-র সোভিয়েত সংবিধানের ঘোষণা। নবম অধ্যায়ের ৪৯ নম্বর ধারায় অল রাশিয়া কংগ্রেস এবং অল রাশিয়ান কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির বিচার্য বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও সোভিয়েত শাসনকে আরও চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। যেমন রিজিওনাল, প্রভিনসিয়াল, কাউন্টি ও গ্রামীণ।

১৯১৮-র সংবিধান সমস্ত সোভিয়েত নাগরিককে নির্বাচন করার বা নির্বাচিত হবার অধিকার দেয় নি। নির্বাচিত করতে বা হতে পারতেন নীচে বর্ণিত নাগরিকগণ—

১) যারা জীবনধারণের জন্য সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদিত শ্রমে যুক্ত, এবং যারা ঘরের কাজ করেন যার ফলে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিরা উৎপাদনী শ্রমে যুক্ত হতে পারেন; অর্থাৎ সমস্ত শ্রেণীর ও স্তরের শিল্প শ্রমিক, কৃষক ও কসাক কৃষি শ্রমিকরা যাঁরা লাভের জন্য কাউকে নিযুক্ত করেন না;

২) সেনা ও নৌবাহিনী সোভিয়েতগুলির অন্তর্ভুক্ত সেনারা;

৩) ওপরে বর্ণিত দুধরনের নাগরিকদের মধ্যে যারা কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছেন।

এই তিন ধরনের নাগরিকদের স্ত্রী-পুরুষ, ধর্ম, জাতীয়তা ব্যাতিরেকে সব পূর্ণবয়স্ক নাগরিকই ছিলেন নির্বাচিত করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকারী।

কারা নির্বাচিত হতে বা নির্বাচন করতে পারবেন না তাও স্পষ্টভাবে ঘোষিত ছিল।

ক) যারা লাভের জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করেন;

খ) কোনো কাজ না করেও যারা সুদ, সম্পত্তি থেকে আয় করেন;

গ) বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী ও ব্যবসার দালালরা;

ঘ) সমস্ত ধরনের সাধু-সন্তরা;

ঙ) পুরোনো জমানার পুলিশের চররা বা জারের গোপন পুলিশ বাহিনী ওখরানার সদস্যরা;

চ) মানসিক প্রতিবন্ধীরা;

ছ) যে সমস্ত নাগরিকের অধিকার কোনো অন্যায়ের ফলে সোভিয়েত কেড়ে নিয়েছে— সেসব ব্যক্তিরা।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে নেবার অধিকার ছিল নির্বাচকদের। এছাড়াও সোভিয়েতে বাজেটের বিস্তৃত বর্ণনা আছে ১৬ নম্বর অধ্যায়ে।

এছাড়াও শ্রমজীবী মানুষের মতপ্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল ১৯১৮-র সংবিধানে। প্রচারমাধ্যমকে মুক্ত করা হয়েছিল ব্যক্তি-পুঁজির বন্ধন থেকে। শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল, শ্রমিক ও কৃষকদের কারিগরি ও বাস্তব সাহায্য করবে সংবাদপত্র, পুস্তিকা, বই প্রকাশের জন্য। এছাড়াও এই সংবিধানে শ্রমজীবী জনগণকে জমায়েত হবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, রাষ্ট্রের ব্যয়ে সভা-সমিতির জন্য সর্বসুবিধাযুক্ত হল তৈরির কথাও ঘোষণা করেছিল এই সংবিধান।

চিরায়ত মার্কসবাদী সাহিত্যে সমাজতন্ত্রের ধারণা, (মার্কসের সময় বলা হত সাম্যবাদ) কোন হেঁয়ালি না রেখেই পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে কার্ল মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' পুস্তিকাটিতে:

> নিজস্ব বুনিয়াদের উপর বিকাশ লাভ করেছে এমন এক কমিউনিস্ট সমাজ নয়, বরং তার বিপরীত, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে উদ্ভূত হচ্ছে, ঠিক এমন কমিউনিস্ট সমাজই আমাদের আলোচ্য, এবং তেমন সমাজ কী অর্থনৈতিক, কী নৈতিক, কী বুদ্ধিবৃত্তিগত, সমস্ত দিক থেকে যে পুরাতন সমাজ থেকে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেই মাতৃজঠরের জন্মচিহ্ন তখনও বহন করছে। তাই এখানে একজন উৎপাদক সমাজকে যতটা দিচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে, সমাজের কাছ থেকে বাদছাদের পর, ঠিক ততটাই ফেরত পাচ্ছে। সমাজকে সে যা দিয়েছে তা হল তার ব্যক্তিগত শ্রম অবদান।... সে এই পরিমাণ শ্রম দিয়েছে এবং সেই প্রমাণপত্র পেশ করে সে সমাজের ভোগোপকরণ ভাণ্ডার থেকে সমান শ্রম-মূল্যের ভোগ্য বস্তু নিয়ে যাবে। কোনো একটা বিশেষ রূপে সে সমাজকে যে পরিমাণ শ্রম দিয়েছে, অন্যরূপে সে ততটাই ফিরে পাচ্ছে।
>
> স্পষ্টতই, এটা যেহেতু সমমূল্যের বিনিময়, সেইহেতু পণ্য বিনিময়ের একই নীতি এক্ষেত্রেও বলবৎ। আধার ও আধেয় পাল্টে গেছে, কারণ এই পরিবর্তিত অবস্থায় কেউ নিজের শ্রম ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না, এবং অপরপক্ষে, ব্যক্তিগত ভোগোপকরণ ছাড়া আর কিছুই ব্যক্তির অধিকারে আসতে পারে না। কিন্তু, বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে এই ভোগোপকরণ বণ্টনের ব্যাপারে তুল্যমূল্য পণ্য বিনিময়ের নীতিই বলবৎ থাকছে: কোনো বিশেষ রূপের নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের বিনিময় হচ্ছে অন্য রূপের একই পরিমাণ শ্রমের সঙ্গে।"

এর পরেও মার্কস এই "সমান অধিকার"-এর নীতিকে "বুর্জোয়া অধিকার" বলে চিহ্নিত করছেন। কারণ এখানে উৎপাদকদের দেয় শ্রমের সঙ্গে তাদের অধিকারেরর হিসাব কষা হচ্ছে সমানুপাতে। এরপর মার্কস ব্যক্তি উৎপাদকদের "শারীরিক বা মানসিক" শক্তির তারতম্য অনুযায়ী তার শ্রম দেওয়ার তারতম্যের বা কম-বেশির উল্লেখ করেছেন। আর একটু এগোলে আমরা দেখতে পাব মার্কসের মত হচ্ছে "সুতরাং আর সব অধিকারেরই মতো এই অধিকারটিও অন্তর্বস্তুর দিক থেকে অসমানতার অধিকার মাত্র"। আর এই অসমানতার অধিকার থেকে সাম্যের পথে অধিকারকে মার্কস বিস্তৃত করতে চেয়েছেন এই ভাবে— "কেবল তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তরেখাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা সম্ভব হবে, সমাজ তার কেতনে মুদ্রিত করতে করতে পারবে— প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্য অনুসারে, প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজনমতো!" ব্যক্তি মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রাক্‌শর্ত মার্কসের মতে এটাই।

মার্কস 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' পুস্তিকাটিতে পুঁজি-বাদের পর প্রাথমিক স্তরের সাম্যবাদী সমাজের যে ছবি এঁকেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিন সম্ভবত তাকেই রূপ দেবার প্রাথমিক চেষ্টা করেছিলেন ১৯১৮-র সংবিধানে। সমানতার অধিকার। সাম্যের অধিকার।

অধিকার চেতনা

মিডিয়া, জনস্বার্থ ও জনাধিকার

বিপ্লব রায়

'পিপলি লাইভ' সিনেমাটা মনে পড়ে? সেই যে ঋণগ্রস্ত গরিব কৃষক পরিবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ছোট ভাই নাথ্থাকে আত্মহত্যার হুমকি দিতে বলে। সে খবর ছড়াতেই পিলপিল করে ছুটে আসে টেলিভিশন মিডিয়া। জেলা, রাজ্য ছাড়িয়ে জাতীয় চ্যানেলগুলির ক্যামেরা ক্রু এবং রিপোর্টার বাহিনী ঘাঁটি গাড়ে নাথ্থার বাড়ির সামনে। তাদের প্রতিযোগিতার জেরে এবং রাজনৈতিক দলগুলির ফায়দা তোলার চক্করে পড়ে নাথ্থা ও তাঁর পরিবারের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। 'সেনসেশনাল' খবর পরিবেশনে পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার তাড়নায় মিডিয়া প্রতিনিধিরা নাথ্থার প্রাতঃকৃত্য সারার প্রাইভেসি-টুকু রাখে না। দরিদ্র কৃষকের প্রতি ছদ্ম-সহমর্মিতার আড়ালে তাদের 'লাইভ কভারেজ' নিষ্ঠুর, অমানবিক বাণিজ্য-তাড়নার মর্মস্পর্শী ছবি হয়ে ওঠে। সে গ্রামেরই অন্য কৃষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু খবরে ঠাঁই পায় না। নাথ্থাকে ঘিরে মিডিয়ার টিআরপি-র লড়াই আর রাজনৈতিক নেতাদের বিবৃতি-যুদ্ধ, সরকার এবং বিরোধীদের ক্ষমতা-দ্বৈরথে তাকে বোড়ে বানানোর প্যাঁচ-পয়জার অ্যাবসার্ডিটির চরমে পৌঁছোলে নাথ্থা পালায়। তার অনুপস্থিতিতে মিডিয়া এবং নেতৃবৃন্দ উৎসাহ হারিয়ে ফেলে পাততাড়ি গুটিয়ে গ্রাম ছাড়ে। খবরের শিরোনাম থেকে ঝরে গিয়ে নাথ্থা ভেসে ওঠে কোনও এক শহরের নির্মীয়মান অ্যাপার্টমেন্ট সারির সামনে ঠিকা শ্রমিকের ভূমিকায়। ধুলোমাখা ম্লানমুখ ছিন্নমূল কৃষকসন্তানের মুখ হারিয়ে যায় সাইনিং ইন্ডিয়া-র অন্ধকারে।

ছবিটির পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার মিডিয়ার অন্দরমহলের লোক। মিডিয়ার বাণিজ্যবুদ্ধির নির্মমতা সম্পর্কে অঞ্চল-জেলা-রাজ্য-জাতীয় স্তরে কর্মরত সাংবাদিকদের থাকবন্দি ক্ষমতার 'হায়ারার্কি' সম্পর্কে এবং ব্যক্তি সাংবাদিকদের মানবিক বোধগুলির অবনমন সম্পর্কে তিনি জেনেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সূত্রেই। পেশাগত সূত্রে আমিও সেই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার শরিক। সে কারণেই বলতে পারি, অনেকে ছবিটিকে মিডিয়ার নঞর্থক সমালোচনার দায়ে ফেললেও এটি অতি বাস্তবসম্মত চিত্রায়ন।

অধিকার রক্ষা এবং সম্প্রসারণে মিডিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই 'পিপলি লাইভ' প্রসঙ্গ টেনে এনে আমি মাস মিডিয়া তথা কর্পোরেট পুঁজি-নির্ভর ও নিয়ন্ত্রিত, বহুল প্রচারিত মিডিয়ার সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিন্তু সার্বিক প্রেক্ষাপটে এটাও যোগ করতে চাই: জাতি-রাষ্ট্র, কর্পোরেট স্বার্থ এবং বৃহৎ রাজনৈতিক দল ও সামাজিক-ধর্মীয় ক্ষমতাবানদের সঙ্গে বৃহৎ মিডিয়ার গাঁটছড়া যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি এদের বিভিন্ন শিবিরের মধ্যে টানাপোড়েন ও বিরোধের কারণে মিডিয়ায় জনস্বার্থ ও জনাধিকার সংক্রান্ত খবরাখবর ও আলোচনা। কেননা গণতন্ত্রে সব ধরনের ক্ষমতার দাবিদারদের জনস্বার্থের দোহাই পাড়তেই হয়। এবং মিডিয়াও যেহেতু সামাজিক পণ্য উৎপাদনকারী তাই নিজেকে জনকণ্ঠের দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠায় তাকে জনাধিকার, জনস্বার্থের কথা বলতে হয়। মিডিয়া পেশাদারদের মুন্সিয়ানা এখানেই যে কীভাবে জনস্বার্থ ও অধিকারের সংজ্ঞাকে বিশেষ ক্ষমতা-স্বার্থের খাপে খাপে সঙ্কুচিত করে ফেলা যায়, বদলে দেওয়া যায় সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যমের অতীত অভিজ্ঞানগুলিকে, কাঁটছাট বা চেপে যাওয়া যায় নতুন ঘরানার সঙ্গে বেমানান খবর এবং মতামতকে।

কয়েক দশক আগেই নোয়াম চমস্কি এবং হেরম্যান তাদের প্রখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ *ম্যানুফ্যাকচারিং অব কনসেন্ট*-এ এই বিষয়ে সবিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁদের বিশ্লেষণ আমেরিকান মিডিয়ার 'প্রোপাগান্ডা মডেল' মোতাবেক ঠান্ডা-যুদ্ধ এবং তার অব্যবহিত পরে কমিউনিস্ট বা অন্যান্য মার্কিন-বিরোধীদের খবরাখবর 'ফিল্টার' করার পাশাপাশি মার্কিন-সমর্থক বা 'মুক্ত দুনিয়া'-র প্রবক্তাদের মুক্তকচ্ছ প্রচারের অজস্র নমুনা তুলে ধরে। নানা দেশে সরকারি নির্যাতনে হতাহত বন্দিদের ক্ষেত্রে মার্কিন মিডিয়ার মানদণ্ডে 'worthy & unworthy victims' বা সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য ও অযোগ্য রাষ্ট্রবিরোধীদের নানা উদাহরণের মাধ্যমে তাঁরা স্পষ্ট করে দেখান তথাকথিত নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা এবং গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীরা কী চরম পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে। প্রধান মাপকাঠি— আমেরিকা ও তার পশ্চিমী সহযোগীবৃন্দ এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি ফোবিয়া। এখন কমিউনিজমের জায়গা নিয়েছে ইসলামিক বিশ্ব সম্বন্ধে মনোভাব। পরবর্তীকালে হেরম্যান, রবার্ট ম্যাকচেসনে সহ বহু মিডিয়া-গবেষক মার্কিন-পশ্চিমী বৃহৎ মিডিয়ার সংবাদ-চয়ন ও পরিবেশনের অর্থনীতি-রাজনীতির হালহকিকৎ উন্মোচন করেছেন। বিশ্বায়নের সুবাদে ভারতীয় মিডিয়ার কর্পোরেটায়ন এবং বিশ্ব-পুঁজির সঙ্গে সম্বন্ধ এখন অতীব নিবিড়। ওয়াল স্ট্রিট এবং ফ্লিট স্ট্রিট, রুপার্ট মারডক ও অন্যান্য ধনকুবের মিডিয়া টাইকুনদের সঙ্গে ভারতীয় মিডিয়া-ব্যারনদের গাঁটছড়া দৃঢ়তর। তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়ার জনস্বার্থ, জনাধিকার সংক্রান্ত সংবাদ প্রতর্ক ও পরিবেশনাতেও।

সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিই। মার্কিন সরকার দ্বারা

দেবযানী খোবরাগাড়ে নামে ভারতীয় মহিলা কূটনীতিকের লাঞ্ছনা ঘিরে জাতীয়তাবাদী ক্ষোভ-ক্রোধ উদ্‌গীরণের সঙ্গে তাল মেলানোর ফাঁকেই মিডিয়ার একটি অংশ ওই কূটনীতিকের পরিচারিকা হিসাবে আমেরিকায় পাড়ি-জমানো সঙ্গীতা রিচার্ডের কাহিনী সামনে আনে। মানবাধিকার ও নারী অধিকার বিষয়ে কম্বুকণ্ঠ কূটনীতিক কীভাবে নিজের বাড়িতেই সেইসব অধিকার হরণ-দলন করেছেন, তারই বিবরণ এইসব প্রতিবেদনে। এবং সেই সূত্রেই মার্কিন বিচারবিভাগীয় তৎপরতার প্রতি ঠারে ঠোরে সমর্থন। একদিকে জাতীয়তাবাদী প্রতর্ক, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক রক্ষাকবচ ও শিষ্টাচার লঙ্ঘনের অভিযোগ ঘিরে ওয়াশিংটন-দিল্লী চাপান-উতোর। অন্যদিকে প্রবাসী ভারতীয় নারীর গার্হস্থ্য শ্রমিকের শোষণ-বঞ্চনার অভিযোগ এবং তাকে ঘিরে মার্কিন প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও অভিবাসীর অধিকার রক্ষায় নীতিনিষ্ঠ উদ্যোগের প্রতর্ক। প্রাচ্য ভণ্ডামির বিরুদ্ধে আদর্শনিষ্ঠ প্রতীচ্যের দৃঢ়তার গল্প। বিদেশি আম আদমির পাশে মহাক্ষমতাধর মার্কিন গণতন্ত্রের রক্ষকদের থাকার অঙ্গীকার। পরিস্থিতি জটিল। পক্ষাবলম্বন দূরূহ। কিন্তু মজার বিষয়, আমেরিকার ভারতীয় 'ন্যানি'-র দুর্দশায় কাতর ভারতীয় বৃহৎ মিডিয়ার এই অংশ কোনওদিন দেশের লক্ষ লক্ষ 'কাজের লোক' নিয়ে সবিস্তার রিপোর্ট করেনি। তাদের দৈনন্দিন শোষণ-লাঞ্ছনা, যৌন নির্যাতন, কাজের অনিশ্চয়তা নিয়ে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন ছাপেনি বা দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে দেখায়নি। কেননা তাতে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত পাঠক-দর্শককুল ব্যাপক চটে যাবে। মেগা সিরিয়ালের বাঁধা-দর্শক গিন্নিবান্নিরা সিরিয়ালে 'ঝি' নির্যাতন দেখালে চ্যানেল ঘুরিয়ে দেবেন, টিআরপি পপাত ধরণীতলে। বিদেশে অভিবাসী 'ন্যানি'দের সম্পর্কেও বৃহৎ মিডিয়া কোনওদিন রা কাড়েনি। কেননা এতে সমূহ সর্বনাশ। তৈলপিচ্ছিল শেখতন্ত্র সহ নানা বিদেশি সরকার, এনআরআই-কুল অথবা 'মানি অর্ডার' অর্থনীতির স্বদেশি সুফলভোগীরা রে রে করে তেড়ে আসবে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদা, চব্বিশ পরগণা বা অন্য জেলা থেকে পাচার মেয়েদের উদ্ধার নিয়ে মাঝে মধ্যে এনজিও উদ্যোগের খবর আমরা পড়ি বাংলা ও ইংরেজি কাগজে। কিন্তু এই নারী পাচারের অর্থনীতি-রাজনীতি তথা সামাজিক কার্যকারণ নিয়ে ধারাবাহিক মিডিয়া তদন্ত এবং প্রচার কী আমরা দেখতে পাই?

পাই না, কারণ ঝাঁ চকচকে গাড়ি, করিনা-দীপিকার 'ব্যবহৃত' শ্যাম্পু, সাবান, লোশন ইত্যাদির বিজ্ঞাপনদাতাদের 'টার্গেট অডিয়েন্স' গাঁ-গেরামের এই হাভাতে পরিবারগুলি নয়। আর বিজ্ঞাপন যুদ্ধই আসল। বাকিটা মায়া। সরকারি-কর্পোরেট উন্নয়ন-প্রতর্কের পক্ষে-বিপক্ষে ঢক্কানিনাদে চাপা পড়ে থাকে এইসব প্রান্তিক পরিবারের মেয়েদের আর্ত কণ্ঠস্বর। কখনও সখনও তা মিডিয়ায় আসে 'হিউম্যান স্টোরি' হিসাবে। ব্যস। কেরালায় 'গাদাম্মা' নামে পরিচিত মধ্যপ্রাচ্যে গৃহবন্দি গার্হস্থ্য-শ্রমিক মেয়েদের শোষণ-বঞ্চনার কাহিনী নিয়ে তৈরি সিনেমা হিট। কিন্তু এই বঞ্চনা বন্ধে কেন্দ্র-রাজ্য সরকার, জাতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়ার কোনও কার্যকর উদ্যোগ কি চোখে পড়ে? না, কেন না এটা বিশ্বায়িত অর্থনীতি-শ্রমনীতির ধ্যানধারণার বিরোধী। বড় জোর এই অভিবাসন রাজ্য সরকারের উন্নয়ন ব্যর্থতাকে ঠেস দিতে ব্যবহার্য। পুরুষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সিঙ্গাপুরে সম্প্রতি ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষোভ-ক্রোধের বিস্ফোরণ সংক্রান্ত খবরাখবরেও একই প্যাটার্ন লক্ষ্য করা গেছে।

তবু এভাবেই ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এবং অন্তরালের অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতাধরদের টানাপোড়েনের সূত্রে অভিবাসী নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মর্মান্তিক কাহিনী কিছুটা জনসমক্ষে আসে। তাই বা কম কিসে! জনস্বার্থ ও জনাধিকারের পক্ষে লড়াকু সংগঠন-আন্দোলনগুলিকে এ ধরনের হঠাৎ-খোলা জানালাগুলিকে ব্যবহার করায় তৎপর হতেই হবে। একই সঙ্গে সে জানালাগুলি যথানিয়মে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলেও ম্রিয়মান হওয়া চলবে না। এ এক অন্তহীন লড়াই। 'Unworthy victims' কখন যে 'Worthy' হয়ে ওঠে! কিন্তু মিডিয়া গবাক্ষের অন্তরালবর্তীদের অঙ্ক সম্বন্ধে সচেতন থাকাটাও জরুরি। নইলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিন যাবে। অমুক চ্যানেল বা কাগজ জনস্বার্থ ও জনাধিকারের প্রতি বেশি সংবেদনশীল ও উদার— এহেন বিভ্রম ছড়াবে এবং ভাঙ্গবে।

পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েকবছরে অভিজ্ঞতার কথায় আসি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম লালগড় থেকে পরিবর্তন-পরবর্তী পর্বে পার্কস্ট্রিট-কাটোয়া-কামদুনি-মধ্যমগ্রাম-গাইঘাটা-বীরভূমে নারী ধর্ষণ-নির্যাতন-খুন থেকে নোনাডাঙ্গা-লোবা-সারদা কেলেঙ্কারি।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে রাজ্যের সর্ববৃহৎ সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠী সরকারি উদ্যোগে কৃষকের জমিদখলের পক্ষে লাগাতার ওকালতি করেছে বৃহত্তর জনস্বার্থের দোহাই পেড়ে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কর্পোরেট-বান্ধব শিল্পায়ন-উন্নয়ন প্রকল্পের কম্বুকণ্ঠ সমর্থনে এই প্রভাবশালী গোষ্ঠী কৃষি ও কৃষক, বর্গাদার ও খেতমজুর তথা জমির উপর নির্ভরশীল বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ আমজনতার রুটি-রুজির অধিকারকে আমল দেয়নি। সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিমালিকানাধীন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ঘোর সমর্থক, মুক্ত বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে জাতীয় বিকাশ ও সমৃদ্ধির তত্ত্বে তন্নিষ্টপ্রাণ এই মিডিয়া ব্যারনরা কিন্তু কৃষকের সম্পত্তির অধিকারকে নাকচ করেছেন। শিল্পের জন্য জমি জোগাড়ে বাজারের নিয়মকানুনে বিশ্বাস রাখেননি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে কালচক্রের অমোঘ নিয়মে কৃষক ও কৃষিভিত্তিক সমাজ-সংসার হারিয়ে যাবে, এই অর্থনৈতিক নিয়তিবাদের প্রবক্তারা ঘোর কমিউনিস্ট বিরোধী হলেও ক্ষমতাসীন

মার্কসবাদীদের অতিসরলীকৃত মার্কসীয় ইতিহাস-ব্যাখ্যায় গলা মিলিয়েছেন। শুধু সম্পাদকীয় বা উত্তর-সম্পাদকীয় পাতায় তাদের নিও-লিবারাল (আসলে নিও-কনজারভেটিভ) প্রতর্ক আটকে থাকলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু প্রতিদিনের সংবাদ শিরোনামে, চয়নে ও পরিবেশনে ঐ গোষ্ঠীর মালিকদের রাজনীতি-মতাদর্শের চোলাই উপচে পড়ত (এবং এখনও তা পড়ছে)। সেসময় সিঙ্গুরের ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক জমিদাতাদের বিষয়ে খবরাখবরে ইচ্ছুক প্রগতিপন্থী, ভবিষ্যৎদর্শী ও আধুনিক এবং অনিচ্ছুকেরা প্রগতিবিরোধী, অপরিণামদর্শী ও অতীতজীবী কুয়োর ব্যাঙ বলে চিহ্নিত হতেন। খেতমজুর, বর্গাদারদের অধিকার ধর্তব্যের মধ্যে আনা হত না। জমি অধিগ্রহণ ও টাটার কারখানার সামাজিক-অর্থনৈতিক অভিঘাত সম্পর্কে শুধুমাত্র সেইসব প্রতিবেদনই সকালের আলো দেখত যা বামফ্রন্ট সরকার ও টাটা গোষ্ঠীর পক্ষে জনমত গঠনে সাহায্য করে। জমিদাতাদের ছেলেরা প্রশিক্ষণ পেয়ে দক্ষ শ্রমিক হবে, ক্ষতিপূরণের টাকায় পাকাবাড়ি উঠছে, মোটর সাইকেল বিক্রি হু হু করে বাড়ছে, ন্যানোর আগেই ভ্যানোর (মোটরচালিত সাইকেল ভ্যান) দল ছুটছে— এরকম কত খবর। উচ্চ-প্রযুক্তির কারখানায় যারা চাকরি পাবেন না তাদের রুটি-রুজির অনিশ্চয়তা, তিন-চার ফসলি জমির মালিকদেরও বাজার-নির্ভর খাদ্য জোগাড়ের সমস্যা, খেতমজুর, বর্গাদার এবং অন্যান্য গ্রামীণ গরিবদের ভাত-কাপড়ের সংকট, সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে জমি নিয়ে ফাটকাবাজি, কৃষিতে শিল্পবর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব, সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তার সংকোচন— ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় ও রাজ্য স্তরের জনমত জায়গা পেত না বললেই চলে। জমিহারা কৃষক পরিবারে আত্মহত্যার ঘটনায় পরিবার ও স্থানীয়দের বক্তব্যের থেকে জোর থাকত সরকারি ও শাসকদলীয় ভাষ্যে।

নন্দীগ্রামে প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাবের জন্য জমি যোগাড়ে লক্ষ্ণ শেঠের অধীন হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের নির্দেশনামাকে কেন্দ্র করে কৃষক ক্ষোভ-ক্রোধ-ভীতির উদ্‌গীরণ পর্বকে এই মিডিয়া গোষ্ঠীই গুজবভিত্তিক এবং বিরোধীদের উস্কানি-প্রসূত মারদাঙ্গা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। দিন সাতেক পর স্বয়ং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য শেঠ-সাম্রাজ্যের ফরমানকে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলার নির্দেশ দিলে এরা সুর বদলায়। কিন্তু সিঙ্গুরের মতোই সরকার ও শাসক দলের যৌথ ডান্ডাবাজির বিরুদ্ধে এরা ক্ষমাসুন্দর মনোভাব নেয় যতদিন না জনবিক্ষোভের জের স্থানীয় স্তর পেরিয়ে রাজ্যস্তরে অনুভূত হয়। আড়াল থেকে রাজ্য শাসন নিয়ন্ত্রণের স্বপ্নে বিভোর মিডিয়া ব্যারনরা বুদ্ধদেবকে রাজধর্ম স্মরণ করান যখন নন্দীগ্রামে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে ওই গোষ্ঠীর সার্কুলেশন ও টিআরপি-তে টান ধরেছে। বাজার দখলে এগিয়ে গিয়েছে তৎকালীন বিরোধীপক্ষের সমর্থক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলি।

পরিবর্তন-পরবর্তী রাজ্যে নতুন সরকারের সঙ্গে এই বৃহৎ গোষ্ঠীর সম্পর্ক অম্লমধুর। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে এদের প্রধান বখেড়া জমিনীতি নিয়েই। কেন্দ্রীয় স্তরে জমিগ্রহণ ও জমিচ্যুতদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত আইনে বেসরকারি প্রকল্পের জন্য কৃষক-সম্মতির নানা শর্ত-কন্টকিত এবং ছাড়-সম্বলিত ব্যবস্থাতে এদের ঘোরতর আপত্তি। কর্পোরেটদের ক্ষেত্রে কিছু সরকারি নিয়ন্ত্রণের কথা উঠলেই এরা সমাজতন্ত্রের ভূত দেখতে পান। কিন্তু কৃষকের জমি দখলে রাষ্ট্রের জবরদস্তির পক্ষে এরা লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থনীতির বেসরকারিকরণ এবং মার্কিন ঘেঁষা বিদেশনীতি গ্রহণের কারণে একদা মনমোহনের 'সিংহগর্জন' এঁদের হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু কর্পোরেট ভারতের মনোগ্রাহী দ্বিতীয় দফার 'সংস্কারে' ব্যর্থতার কারণে সিংহ এই মিডিয়ার কাছে এখন মেষশাবকে পরিণত। দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত কংগ্রেসের ভোটভাগ্য ফেরানোর তাড়নায় জনস্বার্থমূলক নানা আইন— ১০০ দিনের কাজ, খাদ্য নিরাপত্তা আইন, হকার স্বার্থ সুরক্ষা আইন ইত্যাদিকে এই পত্রিকাগোষ্ঠী প্রথম পাতা বা প্রাইমটাইমের খবর বলেই বিবেচনা করেনি। ভেতরের পাতা বা নন-প্রাইমে তা পরিবেশিত হয়েছে এইসব আইনের সমালোচকদের বক্তব্য সহ। একশ দিনের কাজ প্রকল্প ভোটে কংগ্রসের কামধেনু বলে বিবেচিত হলেও এই মিডিয়া ব্যারনরা তাকে জাতীয় অর্থনীতির গর্ভস্রাব বলে নিন্দায় মুখর। প্রকৃতপক্ষে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং সমাজের সর্বাধিক শোষিত-নিপীড়িতদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও খাদ্য-স্বাস্থ্য-জ্বালানি-পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকিকে এক ভোটমুখী 'পপুলিস্ট' রাজনীতি বলে মুন্ডপাত করেন। কিন্তু কর্পোরেট পুঁজির জন্য নানাবিধ ছাড়, ভরতুকিকে এরা জাতীয় বিকাশ ও সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা জ্ঞানে প্রচারে সোচ্চার। এদের কাছে কর্পোরেট স্বার্থই জনস্বার্থ। সমস্ত জনাধিকার কর্পোরেট অধিকারের অধীনস্ত। কেননা এরা মনে করেন কর্পোরেট বিকাশের সুফল চুঁইয়ে পড়বে সমাজের নিচুতলায়। গরীব-গুরবো মায় মধ্যবিত্ত সেই উচ্ছিষ্ট অমৃত পান করে কৃতার্থ হবে।

এই 'growth fundamentalist' বা অর্থনীতির বৃদ্ধি-সর্বস্ব বাজার মৌলবাদীদের এখন নয়নের মণি নরেন্দ্র মোদী। গুজরাত ২০০১-এর কালিমা মুছিয়ে তাকে দিল্লির রাজপাটে অভিষিক্ত করাই সারা দেশের কর্পোরেট মিডিয়ারও লক্ষ্য। যে বঙ্গীয় বাজার-মৌলবাদীরা একদা অমর্ত্য সেনকে সামনে রেখে জমিদখলের ঐতিহাসিক-তাত্ত্বিক নায্যতা প্রমাণে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন, অধুনা তাদের কাছে সেন মহাশয় ব্রাত্যপ্রায়। কেননা তিনি বৃদ্ধি-সর্বস্ব অর্থনীতির সমালোচক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকার প্রবল প্রবক্তা। বৃদ্ধি-সর্বস্বতার কারণে দেশে ধনী-দরিদ্র্যের অসাম্য প্রকটতর, সমাজের সর্বাধিক নিম্ন বর্ণ ও বর্গের মানুষের কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানীয় জল পৌঁছয়নি। ভরতুকির সুফল পৌঁছোয় না তাদের কাছে— এসব

সেন বহুদিন ধরে বলছেন। তিনি মোটেই ব্যক্তিগত মালিকানাহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষধর নন। বাজার ও সরকারের সমন্বয়ে বিশ্বাসী। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রাদর্শ যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিককে বাজারের জন্য সক্ষম হয়ে উঠতে সাহায্য করবে, তাকে তার পছন্দসই জীবনযাপনের সুযোগ-স্বাধীনতা এবং সক্ষমতা দেবে। দুর্বলতম ও প্রান্তিকতম মানুষকেও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার ভরসা জোগাবে।

তাঁর এই উদার, গণতান্ত্রিক সামাজিক ন্যায়নীতি ভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে সামাজিক ডারউইনবাদী নিও-লিবারালদের সংঘাত রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক স্তরে ইদানীং তীব্রতর। তাঁর একদা গুণগ্রাহী মিডিয়া ব্যারনদের তিনি চটিয়েছেন মিডিয়া ও মোদীদের সমালোচনার কারণে। জ্যাঁ দ্রেজের সঙ্গে অধ্যাপক সেনের সাম্প্রতিক 'অ্যান আনসার্টেন গ্লোরি, ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস কন্ট্রাডিকশনস' বইতে ভূমিকাতেই তাঁরা লিখেছেন : "যেটা চোখে পড়ার তা হল অর্থনীতির বৃদ্ধির গতি নিয়ে মিডিয়ার আগ্রহ। কিন্তু একইসঙ্গে নজর কাড়ে বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার পক্ষপাতমূলক চরিত্র সম্পর্কে তাদের প্রায় সার্বিক নীরবতা। যে বৃদ্ধি প্রক্রিয়া দেশটাকে সাব-সাহারান আফ্রিকার দারিদ্র্যের সমুদ্রে ক্যালিফোর্নিয়া মতো কিছু (সমৃদ্ধির) দ্বীপ বানিয়েছে।" তার উপর তিনি উন্নয়নে মোদীর গুজরাত-মডেলকে নাকচ করেছেন যা কিনা কর্পোরেট ভারতের প্রশংসাধন্য। এবং তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন মোদীকে তিনি প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাননা। ব্যস, এতেই সেনের মিডিয়া-দর কম গেছে। তাঁর তাত্ত্বিক প্রতিপক্ষ জগদীশ ভগবতী, যিনি বৃদ্ধি-কেবলম পথেই দারিদ্র্যমোচনে বিশ্বাসী, মোদী-মডেলের প্রশংসক ও তার প্রধানমন্ত্রীত্বের সমর্থক, তিনি এখন বঙ্গীয় মিডিয়া ব্যারনকুলের প্রধানেরও 'হট ফেভারিট'। এই গোষ্ঠীর মিডিয়ার অর্থনীতি সংক্রান্ত বিতর্ক এবং খবরাখবর লক্ষ্য রাখুন, দেখবেন সিঙ্গুর পর্বে সেনের কভারেজের তুলনায় আজ প্রথম পাতা এবং প্রাইম টাইমে তাঁর মতামতের গুরুত্ব কত কম। বিপরীতে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে রাজস্থান ও দিল্লিতে কংগ্রেসের হার সেন ও দ্রেজ প্রচারিত অর্থনৈতিক মডেলের পরাজয় বলে প্রথম পাতায় বিশ্লেষণের নামে মালিকদের তত্ত্ব ফেরি করা হয়েছে। এটাকেই চোমস্কিরা তাঁদের 'প্রোপাগান্ডা মডেল'-এ চিহ্নিত করেছিলেন কর্পোরেট ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের 'বিশেষজ্ঞ'-ব্যবহার এবং সে প্রয়োজন ফুরোলে বা বেগড়বাই করলে তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে নতুন বিশেষজ্ঞদের আমদানির ব্যবস্থা বলে। এ খেলা চলছে নিরন্তর।

এরাই লালগড়ে যৌথ বাহিনী নামানোর পক্ষে লাগাতার ওকালতি করেছে। আবার কিষেণজির 'ফোন-ইন' বা 'বাইট' ধারাবাহিক চালিয়ে টিআরপি যুদ্ধে সামনের সারিতে থেকেছে। যৌথবাহিনী তাকে নৃশংসভাবে 'খতম' করার পর শিরোনামে ও সম্পাদকীয়তে উল্লাস প্রকাশ করেছে। কেননা, তখন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ২৪ x ৭ চ্যানেলে চ্যানেলে লাগাতার ব্রেকিং নিউজ, উৎকণ্ঠা-উদ্বেগে থরথর দৃশ্য-শ্রাব্য উত্তেজনার ঘনঘটা, যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধ থেকে দূরে নিরাপদ লিভিংরুমে বসে নগরবাসীর জঙ্গলমহল দর্শনের উৎসুক্য টিকিয়ে রাখতে জলপাই-উর্দিধারীদের উদ্যত অস্ত্র-প্রদর্শনী এবং কিষেণজি-বিকাশের গামছাঢাকা মুখনিঃসৃত বিপ্লবী বাণী বড়ই উপাদেয় ছিল। কাঁধে ঝোলানো বা পাশে রাখা এ কে ৪৭ 'এক্সক্লুসিভ' সাক্ষাৎকারকে চমকপ্রদ বানাতে অব্যর্থ অস্ত্র ছিল। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' থেকে সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'— 'ড্যানচি'-বাবু বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসলালিত রোম্যান্টিক আদিবাসী-ভুবন খুব একটা বদলায়নি। অদূরের জঙ্গলমহল কিষেণজি-বাহিনী ও যৌথবাহিনীর তৎপরতামুখর মৃত্যু-উপত্যকায় পরিণত হলে তাতে ধাক্কা লেগেছিল বটে। কিন্তু লালগড় আন্দোলনের প্রথম পর্বটুকু বাদ দিলে টিভি বা সংবাদপত্রে সেখানকার আমজনতার কথা বিশেষ ঠাঁই পায়নি। সিপিএম-এর মানুষ, কিষেণজির 'জনগণ' বা মমতার 'মা-মাটি-মানুষ'-এর আশা আকাঙ্ক্ষা, রাগ-ক্ষোভ-দুঃখ-বেদনার কাহিনীর তুলনার অঘোষিত গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক তরজাই প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। যে পুলিশি সন্ত্রাস ঘিরে ক্ষোভের উদ্‌গীরণ, সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়। হারিয়ে যায় ছিতামণি মুর্মু-লক্ষী প্রতিহারদের মুখ।

পরিবর্তন-পরবর্তী জমানায় শাসকীয় উন্নয়ন ও শান্তির প্রতর্ক জামা বদলে হাজির হয়েছে। যে বৃহৎ মিডিয়া-নিন্দিত 'রাস্তার রাজনীতি, বন্ধ্যা বন্‌ধ, অবরোধ, হিংসার রাজনীতি'র কল্যাণে তৃণমূলেশ্বরী আজ বঙ্গেশ্বরী, সে রাজনীতির দায়ে নয়া শাসকদল ও সরকার সবরকম বিরোধী কণ্ঠস্বর ও প্রতিবাদী পরিসর কেড়ে নেওয়ায় বদ্ধপরিকর। বিগত জমানায় মিডিয়া-শাসন, সংবাদজীবীদের উপর আক্রমণ এবং বশংবদ মিডিয়া নির্মাণের প্রক্রিয়া এই আমলে চতুর্গুণ পল্লবিত। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্ব থেকেই বঙ্গদেশের সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক শিবির বিভাজন স্পষ্ট। সেই মেরুকরণ এখন বহুবিস্তৃত। একদা যেসব চ্যানেল ও পত্রিকা উন্নয়ন-শিল্পায়নের দামামা বাজিয়ে বিরোধী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের মুন্ডপাত করত, তারা আজ 'বিবেকী কণ্ঠস্বর'গুলিকে পর্দায় বা কাগজে ঠাঁই দিচ্ছে। কিন্তু পাল্লাভারী সেদিনের প্রতিবাদী এবং আজকের দায়িত্বশীল, উন্নয়ন-পাগল শাসক শিবিরের মিডিয়া মুখপত্রগুলির। দ্বিধাবিভক্ত 'সুশীল' সমাজ বা নাগরিক সমাজও এই মেরুকরণে মদত জুগিয়েছে। নানা ঘটনায় দু পক্ষের চাপান-উতোরের ফাঁকে জনস্বার্থ ও জনাধিকারের নানা ভাষ্য চুঁইয়ে আসে। শিবির-সচেতন মিডিয়ার লাগসই 'ভক্স পপুলি' বা জনতার কণ্ঠস্বর নির্মিত হয়। অর্ধসত্য, একপেশে সত্যের বাখানে প্রকৃত সত্য, সামগ্রিক সত্য বারংবার চাপা পড়ে যায়। বামপন্থী মিডিয়া তো আর এক কাঠি সরেস। দলের আয়নাতেই

এরা মানুষের মুখ দেখতে অভ্যস্ত। দল কাঁদলে এরা মানুষের দুঃখকষ্ট, অধিকার হরণ নিয়ে কাঁদে। দল দুচ্ছাই করলে এরাও চোখ পাকায়। অচলায়তনের জানালা খুলে এরা বাইরের পৃথিবীর দ্যাখে ততটুকুই, যতটুকু দলের বুড়ো মোড়ল অনুমতি দেয়। তাও ভোটে হারার পর। স্বাধীন সাংবাদিকতায় তো আবার বামপন্থীরা বিশ্বাস করে না। ওটা পেটি বুর্জোয়া ভাইস।

এভাবেই তাপসী মালিক-রাধারানী আড়িদের মতো সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ধর্ষিতা, অবমানিতা মেয়েদের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় পার্ক স্ট্রিট-কাটোয়া-কামদুনি-মধ্যমগ্রামের ধর্ষিতা নিহত বা জীবন্মৃত মেয়েদের। মিছিলে হোক বা মিডিয়ায়, পুরোন ও নতুন শাসকদের তুই-মুই চলতে থাকে, চলতেই থাকে। আমার পতাকায় মোড়া লাশ শহিদের, তোদের ঝান্ডায় ঢাকা দেহ একটি সংখ্যা মাত্র। আমাদের আমলে ধর্ষিতার চরিত্র খারাপ, ধর্ষণ সাজানো ঘটনা, ধর্ষক ধান্দাবাজ, বিরোধীদের মদতপুষ্ট। তোদের আমলে ধর্ষিতা নিগৃহীতা শাসক দলের পাপের শিকার। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন আর দুর্নীতিগ্রস্ত দলতন্ত্রের যুগলবন্দীতে গেঁজে ওঠা লোক্যাল কমিটি রাজের ক্ষমতা-দম্ভের আস্ফালনে অসহায় আর্ত মানুষের মুখ। তোদের পুলিশ দলদাস, বিবেকহীন ক্রীড়নক, অত্যাচারী তোলাবাজ, মাস্তানদের মদতদার। আমাদের পুলিশ জনগণের বন্ধু, আইননিষ্ঠ, বিবেকবান, নিপীড়িতের রক্ষক, দুষ্ট দমনকারী। তোদের পুলিশ গুলি চালিয়ে কৃষক মেরেছে, ধর্ষিতাদের অভিযোগ নেয়নি, বিরোধীদের লাশ পুঁতে কঙ্কালকান্ডে সাহায্যকারী। আমাদের পুলিশ গণধর্ষিতা নিহত মেয়ের লাশ ছিনতাই করে পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে। গণধর্ষণের অভিযোগ জানিয়ে থানা থেকে ফেরার পর ফের ধর্ষিতা হলেই পুলিশি ব্যর্থতা ও ঔদাসীন্যের দিকে আঙ্গুলে তোলা যাবে না। কেন না, পুলিশ বড় অসহায়। সমাজে ধর্ষকের বাড়বাড়ন্ত, একা পুলিশ কীভাবে বুঁদির কেল্লা করবে? তাছাড়া, তাদের কি আর কাজ নেই? এত ভিআইপি, এত মেলা, এত উন্নয়ন যজ্ঞ— সেখানে পাহারাদারি কে করবে? তোরা থানাকে পার্টি অফিস বানিয়েছিলি, আমরা থানাকে পার্টি অফিসে তুলে এনেছি। ব্যস, শোধবোধ।

আমরা চপলা সর্দার, দীপালি বসাকদের নিয়ে তুলকালাম রাজনীতি করেছি, রাইটার্সে জ্যোতি বসুর ঘরের সামনে বসে পড়েছি। তো কী হয়েছে, বিরোধীদের দায়িত্বই পালন করেছি। তা বলে তোরা মধ্যমগ্রামের মেয়েদের লাশ পাল্টা ছিনতাই করে ভাবগম্ভীর শোকমিছিলের নাটক করবি, কামদুনির পাশে দাঁড়িয়ে আহা-উহু করবি? এটা রাজনীতি, শান্ত পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করার অপচেষ্টা। আমরা 'রাফ অ্যান্ড টাফ'— এসব বরদাস্ত করব না। তোরা বলতিস— সাতবার রাইটার্স দখল করেছি, কেননা মানুষ সঙ্গে আছে। তাই বিরোধীদের ট্যা ফোঁ সহ্য করব না। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময় তোদের পালের গোদা হুঙ্কার ছেড়েছিল— আমরা ২৩৫, ওরা ৩৫। আমায় মুগুর মেরে কতবার হাসপাতালে পাঠিয়েছিস, মনে পড়ে? এখন এত তেল পুড়িয়ে ঘাম ঝরিয়ে ক্ষমতায় এসেছি। আড়াই বছরেই তোদের তর সইছে না। আরে, আমিও তো তোদের ঝাড়েবংশে প্রায় সাফ করে দিয়েছি। বিধানসভা থেকে পঞ্চায়েত— জনগণের আশীর্বাদ তো আমাদের দিকেই। সন্ত্রাস বলে এখন কাঁদলে হবে? তোদের হার্মাদ বাহিনী এতকাল যা করেছে সে তুলনায় আমাদের ভৈরব বাহিনী তো নেহাৎ গোকুলে বাড়ছে।

মোদ্দা কথা, ভোটের পর ভোটের রায়ে আমি বা আমরাই জনস্বার্থের একমাত্র ঠিকেদার। আমি চাইলে রাম-রহিমের দাবিদাওয়া ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার, আমি না চাইলে তা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র, মাওবাদী বিশৃঙ্খলা। আমি গোবিন্দপুর রেল কলোনি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রাস্তায় বসে পড়েছিলাম। তাই বলে নোনাডাঙ্গার ঝুপড়িবাসীদের পুনর্বাসনের দাবিতে তোরা কেন মিছিল করবি? আমি ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে সব সমীকরণ বদলে গেছে, এটা বুঝিস না মুর্খের দল! কলকাতা এখন লন্ডন হওয়ার অধীর আগ্রহে কম্পমান। আমার সঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময় অনশন করেছ বা ধরনা দিয়েছ, তো কী হয়েছে? এখন উল্টে-পাল্টে যাওয়া সময়টাকে না বুঝে মিছিল-মিটিং করলে পিটিয়ে ঝামা করে দেব, মাওবাদী কেসে জেলে ঢুকিয়ে দেব। ইউএপিএ-ও লাগিয়ে দিতে পারি। বুঝবি কত ধানে কত চাল। এখন আমি উন্নয়ন করছি, পাহাড় হাসছে, জঙ্গল হাসছে। এসময় গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে ছেঁদো কথা আমি সহ্য করবো না।

আমার কথামতো চললে বুদ্ধিজীবী বলে সম্মান করব বা হরেক কমিটিতে নেব, পুরস্কার দেব। আমাকে গণতন্ত্র নিয়ে জ্ঞান দিতে এলে কবীর সুমনের দশা হবে। একঘরে করে দেব, ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে যাবে। পরিবর্তনের জন্য দুদিন মিছিলে হেঁটেছ বলে ভেবো না আমরা সমান, এক পংক্তিতে বসার অধিকারী। অপমানে সমান হওয়া যায়, ক্ষমতায় নয়। পরিবর্তন এনেছি আমি। আমিই নিউ বঙ্গ অপেরার মেগাস্টার, বাকিরা এলেবেলে পার্শ্বচরিত্র মাত্র। এই মাত্রাজ্ঞান না থাকলে ভুগবে। আমাকে শিরোধার্য করলে আমি কল্পতরু, অতীব স্নেহশীলা। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস দেখালে আমি শ্রীমতী ভয়ংকরী। সে আমার দলের ভিতরে হোক বাইরে, এমন স্পর্ধা আমি কোনওকালে সহ্য করি না। এখন তো সে প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে বা আমাদের নিয়ে ইন্টারনেটে ঠাট্টা ইয়ার্কি করলে ছেলেদের লেলিয়ে দেব, গারদে পুরে দেব। সব সিপিএম-মাওবাদী আঁতাত। সাংবাদিকদের মধ্যেও যারা এটা বুঝে নিয়েছে, তারা আমার স্নেহ ও প্রসাদ থেকে বঞ্চিত নয়। যাদের স্বাধীনতার, স্বাতন্ত্র্যের ঘোড়ারোগ আছে তাদের কপালে দুঃখ আছে। কাগজের মালিক-সম্পাদকরা নিজেদের যত বড় ক্ষমতাবান ভাবুন না কেন, আমার সঙ্গে সমঝোতায় না এলে সরকারি লাইব্রেরি লিস্ট থেকে নাম কেটে দেব। ছকে খেললে

জমিজমার ব্যবস্থা করে দেব। আগের জমানাতেও তাই হয়েছে। তোমরা করলে লীলা, আর আমরা করলে বিলা, তাই না!

অতএব, সাধু সাবধান। সারদা-কাণ্ডে আমাকে এবং আমার স্নেহধন্যদের ফাঁসানোর চেষ্টা করে কারা জেলের ঘানি টানছে, দেখছ না! আমাকে তুষ্টু রেখে দলকে রসে বসে রাখো, নেহাৎ পুকুরচুরি না করলে আমি চোখ ফিরিয়ে থাকব। কিন্তু আমার তিলতিল যত্নে গড়ে তোলা ভাবমূর্তিকে কালি ছিটানোর চেষ্টা করলে পার পাবে না। আমার খেয়ে আমার পরে, আমাকে খুঁটি ধরে ফুলে ফেঁপে উঠে আমাকেই চোখ রাঙানোর চেষ্টা করে এর আগে কতজন ধূলিশয্যা নিয়েছে, তা মনে রেখো। একমাত্র আমি সত্য, বাকি সব মায়া।

পাঠক, এই শাসকীয় স্বগত সংলাপ চলতেই থাকবে, কেন না অলীক কুনাট্যের সবে তৃতীয় অঙ্ক চলছে। মিডিয়ায় এহেন সংলাপেরই নানাভাষ্য আমরা প্রতিদিন শুনতে পাই। এর মধ্যেই যুক্ত থাকে জনাধিকার ও রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে নানা কূটতর্ক এবং তা নিয়ে শাসক-বিরোধীদের চাপান-উতোর। পশ্চিমবঙ্গে শাসকীয় প্রতর্কটির বিক্রয়যোগ্যতা এতটাই যে বিরোধীদের পরিসরটিও অনেকটাই সরকার ও শাসকদলের দখলে। জবরদস্তি জমি-দখলে বা সরকারি উদ্যোগে বেসরকারি পুঁজির জন্য জমি-দালালের ভূমিকাতে নানা আপত্তি, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ অনীহা, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব নাকচ এখনও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-হরিপুর আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বহনকারী। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, রাজ্যের পাওনা-গন্ডা ইত্যাদি প্রশ্নে কেন্দ্র-বিরোধিতার সূত্রে রাজ্যবাসী তথা জনস্বার্থের প্রশ্নে প্রাক্তন শাসকদের হাতের তাসগুলিও বর্তমান শাসকদের দখলে। বৃহৎ-পুঁজি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায় ভ্রূ-কুঞ্চন সত্ত্বেও কমদামে ওষুধ বিক্রির সরকারি উদ্যোগ, কৃষিপণ্যের বাজারে ফড়ে-শাসনের চেষ্টা, নানা ভাতা-প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও ন্যায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদির সূত্রে তা আরও জোরদার করার প্রয়াস চলছে। এক হাতে ভিন্নমত-প্রতিবাদ-বিরোধিতার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে অন্য হাতে বরাভয় মুদ্রা ফুটিয়ে কল্পতরু সাজার প্রণোদনা কতটা ভোটভিত্তি সংহত ও সম্প্রসারণের তাড়নাজাত আর কতটা বিকল্প উন্নয়ন-ভাবনার ফসল সে তর্ক চলছে। এই তর্ক সুস্থ, সৎ এবং সামগ্রিক হতে পারে শিবির নিরপেক্ষ মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজের অপরাপর মঞ্চে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পশ্চিমবঙ্গে শিলীভূত মেরুকরণকে ভেঙে দলনিরপেক্ষ একটি নাগরিক পরিসরের স্বপ্ন দেখালেও তা শেষপর্যন্ত শাসক-বিরোধী শিবির-ভাগের কানাগলিতে পথ হারিয়েছে। অন্যদিকে বৃহৎ মিডিয়ার মালিকরা তাদের নিজস্ব রাজনীতি ও বাজার দর্শন মোতাবেক পছন্দসই বুদ্ধিজীবী, বুধমন্ডলী বেছে নিয়েছেন। জনস্বার্থ ও জনাধিকার এখন ভাগের মা।

ফলে আপাতত— থোড় বড়ি খাড়া। খাড়া বড়ি থোড়।

মানবাধিকার ও শ্রেণী রাজনীতি

৬৫ পৃষ্ঠার পর

জায়গা করে নিচ্ছে। এরা যেহেতু একথা ভালোমতোই জানে যে এই সব আন্দোলনকে অতিদ্রুত রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির অংশ করে ফেলা যায়, গোড়া থেকেই এঁদের লক্ষ্য স্থির থাকে। অধিকার আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণে যে অনীহা আছে, সেটাও এরা ভালোমতোই জানে এবং সেটার সুযোগ নিয়ে অতি দ্রুত এরা এই আন্দোলনকে কব্জা করে এবং তারপর সেটা কাজে লাগিয়ে গদি দখলের লড়াই-এ নামে। গদি দখলের পর গদি রক্ষার নিয়মেই এরা এইসব আন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরে এবং অধিকার রক্ষা আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কোণঠাসা করে ফেলে। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে এটাই ঘটেছে। এটাকে যারা 'ব্যতিক্রম' হিসেবে দেখতে চান তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে পোল্যান্ডে সলিডারিটি আন্দোলনেরও একই দশা হয়েছিলো, জার্মানির 'সবুজ' আন্দোলনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিলো একই পথে।

এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হলে অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির যে সম্পর্ক আছে, যে সম্পর্কের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটি এই রচনার প্রথম উপবিভাগে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, সেটি নিয়ে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করতে হবে অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি নাগরিককে। ডিসকোর্স ভিত্তিক ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা ভিত্তিক রাজনীতির সম্পর্ক আছে, আর এই সমস্যারই তীব্রতা বেড়েছে নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রনীতির জমানায়। 'রাজনীতি' থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আর করা যাবে না। এই উপলব্ধিতে যাঁরা পৌঁছে যাবেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, অধিকার আন্দোলনে আজকের যুগে সবচেয়ে বড় বিপদের উৎস 'অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী'। এঁরা 'অরাজনৈতিক পরিসর' গড়ার চেষ্টা করেন এই আন্দোলনগুলি যাতে বাঞ্ছিত রাজনীতির মাত্রা না পায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য। লেখ ওয়ালেশ থেকে শুরু করে এখনকার পশ্চিমবঙ্গের কিছু 'অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী'র ইতিহাস পর্যালোচনা করে মনে হয়, এই অরাজনীতির পিছনে আছে একটা বিশেষ রাজনীতি যা নয়া উদারবাদের ন্যায্যতা নির্মানের কাজটি করে এইসব আন্দোলনের জমিতে অরাজনীতির বিষবৃক্ষ রোপণ ক'রে। অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একসময় অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, নয়া উদারবাদ সেই পরিসরটিও সংকুচিত করে ফেলেছে বিপুলভাবে। আজকের মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীদের এই বিষয়টি সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে।

ভিন্নমত ও বিদ্রোহের অধিকার

সমরেশ মিত্র

'সিডিসন' বা রাজদ্রোহ-র ধারণা পুরোনো। যবে থেকে সমাজে বর্গ বিভাজন চালু হয়েছে তবে থেকেই সমাজে বিদ্যমান ক্ষমতাবান বর্গের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন বর্গের দ্বন্দ্ব কখনও গণ ক্ষোভ কখনও বা গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। স্পার্টাকাস-এর নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ, প্যারি কমিউন, আমাদের দেশে 'সিপাহি বিদ্রোহ' সাঁওতাল বিদ্রোহ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় এবং বর্তমানে সুটিয়া-কামদুনি-মধ্যমগ্রাম, মানুষের বিক্ষোভ কেন্দ্রীভূত হয়েছে সরকারের শাসনের ব্যর্থতা, পক্ষপাতিত্ব এবং সরকারি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

ক্ষমতাবানরা সমাজে তাদের প্রতিপত্তি, সম্পত্তি এবং অন্যান্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মত, পথ ও শাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত কণ্ঠ, উদ্যত ক্রুদ্ধ মুষ্টিতে আগল পরানোর অভিপ্রায়ে নানান শাসন প্রবর্তন করেছে। বিদ্রোহীরা পাল্টা দাবি তুলেছেন— আওয়াজ তুলেছেন। বলেছেন, 'বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত'। বিদ্রোহ, যা ক্ষমতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত, তাকেই শাসকরা, ক্ষমতাবানরা রাজদ্রোহ নাম দিয়েছে দেশে দেশে, যুগে যুগে। তবে পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে এই ধারণা সংস্থাগত এবং আইনি রূপ গ্রহণ করেছে। দ্রোহের বিস্তৃতি এবং তীব্রতা যত বেড়েছে, সেই সমস্ত দ্রোহ বা তার প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করার জন্য ক্ষমতাবানদের প্রয়োজন হয়েছে দ্রোহ বা রাজদ্রোহ সম্পর্কে আরও বিস্তৃততর ব্যাখ্যার।

আধুনিককালে সমাজ-সংগঠন রাষ্ট্রের কাঠামোয় বিধৃত। রাষ্ট্র চালনার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পরের মতামতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র এই ভিন্নমতকে মেনে নেয়— একে কখনও রাজদ্রোহ বলে বিচার করে না। কিন্তু যখনই রাষ্ট্রের ন্যায্যতাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে, মত ও পথের ওপর ভিত্তি করে— রাষ্ট্র রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে। 'রাজদ্রোহ' তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র'-র সমার্থক হয়ে উঠেছে।

ইংরাজের বিরোধিতা করে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে— এক সময় ইংরাজরা তথাকথিত নরমপন্থী, চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে জেলে পুরেছে। গান্ধীজী ভগৎ সিং-এর দ্রোহের আদর্শের বিরোধী অবস্থানে ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যতীন দাসের অনশনে মৃত্যু 'ডায়াবলিক্যাল স্যুইসাইড', সেই গান্ধীজী এবং ভগৎ সিং-যতীন দাসরা রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী হন। বামপন্থীরা এবং বাম-বিরোধী কংগ্রেস-বিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি পশ্চিমবঙ্গে বিধান রায়, প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন প্রমুখ কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ক্রমাগত বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এর ফলে এক সময় কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেস সরকার নিষিদ্ধ করেছে। অতীতে ইংরেজ সরকার দ্বারা আনীত মীরাট বা কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার আদলে স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'আমহার্স্ট স্ট্রীট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা' বা অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার 'পার্বতীপুরম ষড়যমন্ত্র মামলা' দায়ের করেছে। বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকার এবং স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়ের করা মামলার বিষয়টি তো এই সেদিনের কথা।

বামফ্রন্ট আমলে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-এ বর্তমানের 'পরিবর্তনের সরকার'-এর প্রধান রাজনৈতিক দল প্রবল সরকার-বিরোধী আন্দোলন করে। স্থানে স্থানে প্রশাসনকে কার্যত অচল করে দেয়— রাস্তা অবরোধ থাকে বহুদিন। বিধানসভায় গিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করে দেন। সেই তাঁরাই আবার রাজদ্রোহের অভিযোগে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করেন ভিন্নমতাবলম্বী কিষেণজিকে, যে ছত্রধর মাহাতোর মোটর বাইকের পিছনে চড়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যাত্রা করেছিলেন, রাজদ্রোহের অভিযোগে বিতর্কিত ইউএপিএ আইন বলে সেই মুখ্যমন্ত্রীই ছত্রধর মাহাতোর কারাবাসের ব্যবস্থা করেন।

মতামতের ভিন্নতা কখন রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার ভূমিকায় চলে যায়, তার সীমানা নির্ধারণ করে রাষ্ট্র। আইনি বা বেআইনি পদ্ধতিতে ভিন্ন মতের দ্রোহ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে স্তব্ধও করে রাষ্ট্র, বা রাষ্ট্রপরিচালনাকারী শ্রেণী। দ্রোহ-র সঙ্গে তাই শ্রেণীর সম্পর্ক অতি গভীর।

রাজদ্রোহের ধারণা এবং সেই দ্রোহ ঠেকানোর জন্য সাংগঠনিক এবং সংবিধানিক পদ্ধতিতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি তার চূড়ান্ত রূপ পায় পুঁজিবাদের পথে যাত্রা শুরুর সময়ের ইংল্যান্ডে। ইংরাজি ভাষায় এই 'সিডিসন' বা রাজদ্রোহ কথাটির প্রথম দেখা মেলে ষোড়শ শতকের এলিজাবেথের সময়ের ইংল্যান্ডে, যে কথাটির মূল ল্যাটিন উৎসের অর্থ করা যেতে পারে খানিকটা এই রকম— পৃথক করে দেওয়া, অসন্তোষ দমন। সেই ষোড়শ শতকের ইংল্যান্ডে যখন আর্থিক ক্ষেত্রে আদিম পুঞ্জীভবন তার তীব্র রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, যখন ইংল্যান্ড তার সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পররাজ্য দখল ইত্যাদিতে হাত পাকাচ্ছে এবং যার অবধারিত ফল ব্রিটেন কর্তৃক তার পার্শ্ববর্তী স্থলভাগে থাবা বসানো।

ভেড়ার চারণক্ষেত্রের জন্য জায়গা তৈরি করার জন্য স্কটল্যান্ডের শস্যক্ষেত্র থেকে মানুষ হটিয়ে দেয় ব্রিটেনের শাসকরা, ওয়েলস-এর সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আয়ারল্যান্ডকে পদানত করে। বস্তুত ব্রিটেনে এই 'সিডিসন' আইনের সর্বশেষ প্রয়োগ ঘটে এই আয়ারল্যান্ডকে কেন্দ্র করেই। ১৯৭২ সালে ব্রিটিশ সরকার তার নাগরিকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনার সময় ঘোষণা করে যে ঐ ব্যক্তি ব্রিটেনের অধিবাসীদের উত্তর আয়ারল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার রিপাবলিক্যান সরকারের পক্ষ নিয়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে ব্রিটিশ ভারতে বালগঙ্গাধর তিলক, মোহনদাস গান্ধী, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, এমনকি বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে-র বিরুদ্ধেও সেই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধর অভিযোগ এনে তাঁদের চূড়ান্ত শাস্তি দেয়।

বিভিন্ন অবস্থায় এই দ্রোহ-বিরোধী অবস্থান বিভিন্ন রূপে এসে হাজির হয়। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের নানা কালাকানুন (বলার স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, আঁকা বা গান গাওয়ার স্বাধীনতা), আর ইসলামি দেশগুলিতে আল্লা-নিন্দা রোধ বিষয়ক আইন (ব্লাসফেমি অ্যাক্ট) আসলে একই মুদ্রার দুটি পিঠ। এদেশে যারা যেভাবে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে, ইসলামি দেশগুলোতেও মোল্লাতন্ত্র এই আল্লা-নিন্দা বিরোধী আইন ধর্ম-বিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবেই প্রয়োগ করে। ভিন্নমত রাষ্ট্রের বা ক্ষমতার মান্যতাকে কখনও কখনও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। দ্রোহ দমনেই যে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করবে এমন নয়, অনেক সময় ভিন্ন মতাবলম্বীদেরও রাষ্ট্র দমন করে, রাষ্ট্রের মান্যতা রক্ষার তাগিদেই। যে সব ব্যক্তি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় বা শ্রেণী রাষ্ট্রের মান্যতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে পারে, রাষ্ট্র সেই সব গোষ্ঠীকে স্বীকার করে না। তাই দেখি নিপীড়িত সংখ্যালঘু মানুষদের বিরুদ্ধে জার্মানি বা ইতালি বা মার্কিন দেশে যখন উত্থান ঘটে নব-নাৎসি বাহিনীর বা ক্লু ক্লুক্স ক্ল্যান জাতীয় সংগঠন, যারা দাবি করে যে তারা সমাজের ওপর নজরদারির আগমার্কা সংস্থা— 'ভিজিলেন্স জাস্টিস'-এর প্রতিভূ; এই সংগঠনগুলি 'ভিজিলেন্স জাস্টিস'এর নাম করে সমাজে সংখ্যালঘুদের এই বিক্ষোভকে বিদ্রোহ পর্যন্ত যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়— অথচ রাষ্ট্র এদের বাধা দেয় না। ভারতের গ্রামগুলিও খাপ পঞ্চায়েতের "বিচার" দ্বারা রক্তলাঞ্ছিত। ইউরোপ থেকে মুম্বাই-এর রাস্তা— পুস্তক পোড়ানোর দৌরাত্ম্যে মাঝে মধ্যেই কম্পমান হয়ে ওঠে। "সংস্কৃতি পুলিশ"-এর নামে পার্কে যুবক-যুবতীদের হেনস্থা করা হয়— যে তথাকথিত যুব সংগঠনগুলি এই কাজে লিপ্ত, তারা আবার বিশ্বায়নের সমর্থক। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ একটিই কার্য-কারণ-সম্পর্ক দ্বারা পরস্পর-নির্ভর। এই অবদমন রাষ্ট্রের ছদ্মবেশ। কখনও আইন বা সংবিধানের আকারে (আমাদের দেশে যেমন ইউএপিএ বা আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) কোথাও বা ধর্মীয় অনুশাসন (সম্মান-রক্ষার্থে হত্যা বা 'ধর্মযুদ্ধ') কোথাও বা সাবেকি ঐতিহ্য অথবা নিজের ধারণা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে উৎসারিত। এই ধারণার প্রত্যেকটিরই মূলে অবস্থান করছে ধর্মীয় উন্মাদনা, ঔপনিবেশিক শাসনের ধারণা, নারী অবদমন, জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার স্থায়ীকরণের প্রচেষ্টা— যেগুলি সরাসরি রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য সহায়ক।

ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ টানা যাক। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বে ১৫৭৭ সালে একজন ব্রাহ্মণকে দেব-বিরোধী বা আল্লা-বিরোধী কাজের জন্য হত্যা করা হয়— যদিও সম্রাট আকবর নিজে এই হত্যার বিপক্ষে ছিলেন। যে শেখটি এই হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে তদন্ত শুরু হয়। এই হত্যা যৌক্তিক না অযৌক্তিক, এ বিষয়ে নানান জনের মতামত নেওয়া হয় এবং আধুনিক ভাষায় যাকে "জুরি সিস্টেম অব জাস্টিস" বলা হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন তথ্যাদি বিচার করে স্বাধীনভাবে মতামত দেবেন, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে আকবরের আমলের 'জুরিবৃন্দ' সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসেন যে ঈশ্বর বা আল্লার অবিশ্বাসীদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে শাস্তিবিধান করা অযৌক্তিক এবং ন্যায়নীতির পরিপন্থী। আজকে যাঁরা ইসলামের নামে রুশদি বা তসলিমাকে আক্রমণ করেন বা ফতোয়া জারি করেন, বা যাঁরা দীপা মেহতার 'ওয়াটার' চলচ্চিত্রের স্যুটিং বন্ধ করে দেন, গুজরাতে মুসলমান কিশোরীকে হিন্দু ধর্মের নামে বলাৎকার করেন, তাঁরা এখনও এমন এক ধারণা দিয়ে মানুষের অধিকারকে খর্বিত করছেন যা আমাদের দেশে ৫০০ বছর আগেই বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রের অবদমনের পক্ষ অবলম্বন করে রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার শক্তি হিসেবেই কাজ করছেন, তাই রাষ্ট্র তাদের পাশে।

রাষ্ট্রদ্রোহ-নিরোধক আইন : এদেশে

ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়গত পরম্পরা-ভিত্তিক সামাজিক ন্যায় বিচারের যে প্রক্রিয়া ছিল, মুঘল আমলে তাকে কিছু পরিমাণে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলে। মুঘলরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন, তাঁরা এদেশ থেকে উচ্ছেদের ভয়ে ভীত ছিলেন না। সাধারণ রাজনৈতিক বাদানুবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্য হস্তান্তর-পুনরুদ্ধার— মূলত এই সব ঘিরেই তাঁদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আবর্তিত হতো। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগমনের ফলে অবস্থার একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

শিল্পবিপ্লবের সময় থেকেই যখন ব্রিটেন তাদের নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে

দুর্বল শ্রেণীগুলির সম্পত্তি লুণ্ঠন, সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি দখল করে তথাকথিত শিল্পবিপ্লবের সূচনা ঘটায়, তখন থেকেই সে দেশে ক্রমাগত প্রজা-বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি চলে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং আয়ারল্যান্ড-এর ইংল্যান্ড-বিরোধী সংগ্রাম। এই সমস্ত আন্দোলনে পর্যুদস্ত হয়ে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ব্রিটেন, যেখানে বাক্‌স্বাধীনতার বিষয়টি প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলো, যে দেশে স্বয়ং মার্কস রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাজ পরিবর্তনের প্রাথমিক সূত্র সমূহ গ্রন্থিত করেছিলেন, সে দেশে বাক্‌স্বাধীনতাসহ অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের জন্য একে একে প্রণীত হয় 'ট্রিসন অ্যান্ড ফেলোনি অ্যাক্ট', কমন ল অফ সিডিসিয়াস লিবেল এবং ইংলিশ ল রিলেটিং টু সিডিসিয়াস ওয়ার্ডস।

নিজের দেশের বিরুদ্ধ কণ্ঠ রোধের এই আইনগুলি ব্রিটেনের শাসকদের হাতে অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দেয়। ভারতের মাটিতে কিংবদন্তী-প্রতিম বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পর্যবসিত হয়েছে ততদিনে।

ইতিমধ্যে ঘটলো ভারতের সিপাহি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ। প্রকাশিত হলো নীলদর্পণ। ১৮৬৩ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত ওয়াহাবি বিদ্রোহ ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললো। ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহ-নিরোধক আইন পাশ করায়, যে আইনটি প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আজও ভারতীয় ফৌজদারি বিধির সবচেয়ে বিতর্কিত ১২৪-ক ধারা হিসেবে সগর্বে অবস্থান করছে। এখানে আমরা সংক্ষেপে ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই ধারার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করবো।

১৮৭০ থেকে ১৮৯৮-র মধ্যে ব্রিটিশ সরকার, ভারতের নাগরিকদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ্যে প্রকাশ ও প্রচার রুদ্ধ করার জন্য নাট্য-নিরোধক আইন ১৮৭৬ এবং দেশীয় ভাষায় সংবাদ-প্রকাশ নিরোধক আইন ১৮৭৮ চালু করে। এই নাট্য-নিরোধক ধারা অচিরেই অমৃতলাল বসুর নাটক এবং *নীল দর্পণ*-এর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় এবং ১৮৯১-এ *বঙ্গবাসী* পত্রিকার সম্পাদক শ্রী যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর একটি প্রবন্ধের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিলো ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শোষণের বিরোধিতা।

এই আইনের সবচেয়ে পরিচিত প্রয়োগ ঘটে বাল গঙ্গাধর তিলকের ক্ষেত্রে— পর পর দুবার। পুনার প্লেগ-কমিশনার র‍্যান্ড এবং ব্রিটিশ সামরিক অফিসার লেফটেন্যান্ট আয়হার্স্ট পুনায় চাপেকার ভাইদের গুলিতে নিহত হন। ব্রিটিশ সরকার তিলকদের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করার সময় বলে যে শিবাজীর আফজল খানকে হত্যার কথা টেনে তিলক যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছেন। তিলকের এই মামলা পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ সরকার জেমস স্ট্রাচি-র পদোন্নতি ঘটিয়ে তিলকের বিচারের গঠিত বেঞ্চের কনিষ্ঠতম সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকেই এই মামলা পরিচালনার মুখ্য দায়িত্ব অর্পণ করে। স্ট্রাচি-র ভারতীয়দের প্রতি তীব্র ঘৃণা সর্বজনবিদিত ছিলো। এই মামলার সূত্রে তিনি রাজদ্রোহ-বিষয়ক যে আইনি ব্যাখ্যা যোগ করেন, তা এক কথায় ভয়াবহ। মজার কথা, স্ট্রাচি-র সেই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই আজকের ভারতের ফৌজদারি বিধির ১২৪(ক) ধারাটি দাঁড়িয়ে আছে, যে ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের চোখে ভিন্ন মতাবলম্বী ডঃ বিনায়ক সেন সহ অন্যান্য আরও অনেক মানুষকেই দেশদ্রোহী প্রতিপন্ন করার জন্য ভারত সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে।

১৮৯৮ সালে স্ট্রাচি-র দেওয়া ব্যাখ্যাসমূহ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বৃটিশ পার্লামেন্ট-এ যখন এই বিলটির স্ট্রাচি-র ব্যাখ্যা করা বিষয়গুলিকে একটি সংশোধনীর আকারে পেশ করা হয়, তখন এই বিলটির সমর্থনে ইংরাজ রাজপুরুষ শ্রী চেমার্স বিলটির নির্গলিতার্থ স্পষ্ট করে দেন :

> ইংল্যান্ডে যে ভাষায় কিছু প্রকাশ করা হয় সেটা সহ্য করা হলেও ভারতে সেই ভাষা সহ্য করা যায় না, কেননা ভারতে এমন ভাষার ব্যবহার অলস ক্রোধ প্রকাশেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা সদর্থক এবং সকর্মক পদক্ষেপে পর্যবসিত হতে পারে।

ভারতে বর্তমানে, এই ২০১৪ সালেও, যে রাজদ্রোহ-বিরোধী আইন (ফৌজদারি ধারা ১২৪-ক) চালু আছে, যে আইনটির স্বপক্ষে শ্রী চেমার্স এত স্পষ্ট করে বলেছিলেন, সেই বিলটির সমর্থনে ভারতের তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গর্ভনর জেনারেল আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি বলেন :

> এটা স্পষ্ট যে একটি দেশের শাসকদের মতো একই জাতি এবং ধর্মের নাগরিকদের শাসন করার জন্য যে সমস্ত আইন-কানুন পর্যাপ্ত এবং যথেষ্ট, সেই আইন-কানুনগুলি একটি বহু জাতি-ধর্ম অধ্যুষিত নাগরিকদের শাসনের জন্য বিদেশি শাসকদের পক্ষে পর্যাপ্ত এবং যথেষ্ট নয়।

লর্ড এলগিন আরও স্পষ্ট করে বলেন:

> আমরা ভারতে রাজদ্রোহ দমনে প্রয়োজনীয় আইনি ক্ষমতা পেতে ইচ্ছুক। আমরা এরচেয়ে বেশি বা কম, কিছুই চাইছি না।

অবশেষে আজকে যে আইনটি ১২৪(ক) হিসেবে খ্যাত বা অখ্যাত, সেটি ব্রিটিশ আমলে চতুর্থ আইন ১৮৯৮ হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯০৮ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় বৃটিশ সরকার সংবাদপত্রে বিপজ্জনক সংবাদ প্রকাশ নিরোধক আইন চালু করে। ক্ষুদিরাম কর্তৃক মুজফ্‌ফরপুর আদালতের বরিষ্ঠ ইংরাজ উকিল (তিনি ভারতীয় বিরোধী উকিল হিসেবেই কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন) নিহত হলে বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর *কেশরী*

পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে সরকারি সন্ত্রাসের বিরোধিতা করেন এবং এই নতুন আইনের দ্বারা রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হন।

১৯৬৭ সাল। আগ্রা থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক *এহ্সাম*-এর সম্পাদক গুলাম রসুদ চোয়ারি কাশ্মীরে ভারতীয় শাসনকে সন্ত্রাস উদ্রেককারী বলে উল্লেখ করায় কারারুদ্ধ হন।

১৯৭৪ সাল। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার সেই প্রদেশের হানামকোন্ডা থেকে প্রকাশিত পঞ্জীকৃত মাসিক পত্রিকা *সৃজনা*-র সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করে— এতে ভারত সরকারের বিদেশি-তোষণ নীতির সমালোচনা ছিল।

১৯৭৫ সাল, জরুরি অবস্থা। *অনীক* পত্রিকার সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী ভারতের সিকিম গ্রাস নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে জেলে যান। কর্ণাটকের পিপল্‌স ইউনিয়ন অফ সিভিল লিবার্টিস-এর সাংগঠনিক মুখপত্র (যেটি সংগঠনের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত হয়) *বার্তাপত্র*-র সম্পাদক ডঃ রাতি রাও পত্রিকাটিতে সংঘ পরিবার কেমনভাবে কর্নাটকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে, সে সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এছাড়াও কর্নাটকে সরকার-বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের ভুয়া সংঘর্ষের নামে কেমনভাবে হত্যা করা হচ্ছে, সে বিষয়ে সরব হন। তাঁর বিরুদ্ধে কর্নাটক পুলিশ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে!

সময়ের দিক থেকে একটু পেছিয়ে যাই বেশ কয়েকটা দশক। দেখি, ইংরাজের প্রয়োগ করা রাজদ্রোহের ধারণা কেমনভাবে ১৯৪৭-উত্তর পর্বে ভারতে ক্রমাগত একই ভাবে প্রযুক্ত হয়ে চলেছে।

১৯২২ সাল। *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই তিনটি প্রবন্ধই নাকি রাজদ্রোহমূলক, এই অভিযোগে গান্ধী এবং *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শানকেরলাল বাংকেরকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে। আত্মপক্ষ সমর্থনে ১৯২২ সালেই মহাত্মা গান্ধী বলেন :

> ...১২৪(ক) নামক যে ধারায় আমার বিচার চলছে, আমার মতে ভারতীয় ফৌজদারি আইনের যে সমস্ত ধারায় নাগরিকদের অধিকার খর্ব করার কথা বলা আছে, তার মধ্যে এটিকে রাজপুত্রের সম্মান দিতেই হবে।... যে সরকার অন্যান্য সমস্ত পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় ভারতীয়দের জন্য ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি করেছে, সেই সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করাকে আমি একটি গুণ বলে সম্মান করি। ...

১৯৪৬ সাল। কাশ্মীর। শেখ আবদুল্লা সেখানে ব্রিটিশ শাসনের আইনি অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, প্রশ্ন তোলেন ১৮৪৬-এর ব্রিটিশের সঙ্গে রাজা গুলাব সিং-এর মধ্যে সাধিত হওয়া অমৃতসর চুক্তির যৌক্তিকতা নিয়েও। কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মধ্যে সাদৃশ্য নিয়েও তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দেন। কাশ্মীরের তৎকালীন রাজা হরি সিং আবদুল্লাকে গ্রেফতার করেন।

শেখ আবদুল্লার উকিল তাঁর সমর্থনে উকিল যা বলেন তা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে :

> রাজদ্রোহ হলো আইনের দিক থেকে একটি সর্বগ্রাসী অপরাধ— কিন্তু জনপ্রিয় মানুষদের এই ধারায় বিচারের বিষয়টি বিপজ্জনক। যখনই আপনি মানুষকে এই ধারা দিয়ে সাজা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তখনই আপনি দ্রোহের কারণ কমানোর পরিবর্তে তার মাত্রা বহুগুণ বর্দ্ধিত করে দেবেন।... ১৯৪২-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করার পর ভারতের দূরবর্তী কোণে কোণেও ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ...সমস্যার সমাধানের পথটি আরও বেশি সমস্যাসঙ্কুল।...

১৯৪৯ সাল। ভারতের স্বাধীনতার পর দুবছর অতিক্রান্ত। সরকার-বিরোধী মত ও পথ অবলম্বন করার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর আগেও একবার, যখন ব্রিটিশের আওতায় স্বায়ত্তশাসন চালু ছিলো, সেই নৌ-বিদ্রোহের সময় নেহরুর সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আঘাত হানেন। ব্রিটেনের কমিউনিস্টবৃন্দ রজনী পাম দত্ত-র নেতৃত্বে নেহরুকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে বললে নেহরু বলেন যে তিনি বিষয়টি জানেন না! কিন্তু বামপন্থী মনোভাবাসম্পন্ন পত্রিকা *ক্রশরোড* ছিলো নেহরুর জাতীয় ও বৈদেশিক নীতির তীব্র সমালোচক— অতএব বিরোধী মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে নেহরু সরকার পত্রিকাটির প্রকাশ নিষেধ করে দেয়। কিন্তু বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালে দেখা যায় যে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশটি সংবিধান-বিরোধী এবং নির্দেশটি এই কারণে বাতিল হয়। এই সব নানান বাস্তব কারণে স্বাধীন ভারতের প্রথম সংবিধান সংশোধন হয় ১৯৫১ সালে। যে বিষয়টির জন্য সংবিধান সংশোধনের এই আয়োজন, তার লক্ষ্য ছিলো বিরোধী মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা। ভারতের সংবিধানে মতামতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত যে সব বিষয় অধিকার হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, নেহরুর সময়েই সেই প্রথম সংবিধান সংশোধনে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি শর্তাধীন হয়ে পড়ে। কারোর ভিন্ন মতামত যদি ''সাধারণের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন'' বা ''বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক''-র পরিপন্থী হয়, তবে সেই সব মন্তব্য ও কার্যকলাপ রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হবে। বলা বাহুল্য এই ''জনজীবনে বিশৃঙ্খলা''-র কথা বলে বিরোধী মত অবদমনে ভারত রাষ্ট্র এরপর থেকে সদা তৎপর থেকেছে— ১৯৭৫-র কালা জরুরি অবস্থা জারির অন্যতম ''ন্যায্যতা'' ছিলো এই বিষয়টি।

নেহরু নিজেই এই ধারাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন এই

বলে যে—

আমার নিজের কাছেই ১২৪-এ ধারাটি অন্যন্ত আপত্তিকর এবং গর্হিত— ঐতিহাসিক এবং বাস্তব কারণেই আমাদের আইনে ঐ ধারাটির কোনও স্থান থাকতে পারে না। যত তাড়াতাড়ি ঐ ধারাটি বিদায় হয় ততই মঙ্গল।

নেহরুর এই গুরুগম্ভীর বাক-চাতুরি সত্ত্বেও ভিন্ন মত ও পথের পথিক কায়ূর কমরেডদের ফাঁসি হয়। জরুরি অবস্থায় টুঁটি টিপে রাখা নৈঃশব্দের মধ্যে কৃষক কর্মী কিষ্টা ও ভূমাইয়া-র ফাঁসি হয়। মণিপুরের যুবক ভারতীয় জাতীয় পতাকাতে স্যালুট না করলে বা জয়হিন্দ্ না বললে ভারতীয় জওয়ানরা তাকে প্রহার করে। কাশ্মীরী ভাষায় স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন সন্দেহজনক এই অছিলায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাশ্মীরী অধ্যাপককে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। কাশ্মীর বা নাগাল্যান্ডে জন্মালে অথবা মুসলমান হলেই 'সন্ত্রাসবাদী' তক্‌মা জোটে। সংখ্যালঘু— তা সে জাত-পাত-ধর্ম বা মতাদর্শ, যাই হোক না, আমাদের দেশে তা 'দেশদ্রোহ' হিসেবে ধরা হয়। অথচ ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন অক্সফোর্ড-এ গিয়ে প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন যে সুশাসন ছিলো বলেন, বা জলের দরে বা বিনা পয়সায় দেশের সম্পদ বিদেশিদের বিলিয়ে দেন, সেটা দেশদ্রোহিতা হয় না, বরং দেশের মানুষ তার প্রতিবাদ করলে তারা হন 'মাওবাদী'— ইউএপিএ-র শিকার। স্বপন দাশগুপ্ত, যিনি মাওবাদী মুখপত্র-র সম্পাদক থাকার 'অপরাধ'-এ গ্রেপ্তার হন এবং কার্যত বিনা চিকিৎসায় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে নিহত হন, তিনি 'দেশদ্রোহী' হিসাবে বিচারের কাঠগড়ায়, আর দেশের সম্পত্তি বিলগ্নিকরণের মন্ত্রী, এনরনের প্রাক্তন উকিল রাষ্ট্রীয় প্রহরায় 'দ্রেশদ্রোহী'দের মোকাবিলা করেন।

রাষ্ট্র থাকলেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ থাকবে, তাই রাষ্ট্রদ্রোহিতা থাকবে— রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থাকলেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ থাকবে। মার্কস যাকে ইতিহাসের শুরু বলেছিলেন, মানবজাতির সেই সত্যিকারের ইতিহাস শুরু হওয়ার আগে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত অধিকার হিসেবে মানুষের স্বপ্নে থাকবে। বিদ্রোহের অধিকার তাই একটি ন্যায়নীতির প্রশ্ন, একটি মতবাদিক প্রয়াস— যারা একে তুচ্ছ আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে পর্যবসিত করতে চায়, বিদ্রোহ-বিক্ষোভের আসল লক্ষ্য তারাই।

এই প্রবন্ধের গুরুত্বই আমরা বলেছিলাম, ইংরাজ শাসকবৃন্দ কী বাধ্যবাধকতায় পড়ে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দমনে এবং নিজ দেশের প্রতিবেশী দেশগুলির ভূখণ্ড দখলে রাখতে কেমনভাবে সিডিসান-এর ধারণা আমদানি করেছিল। ভারত রাষ্ট্রও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছে। সিকিম-ভূটান-বাংলাদেশ-শ্রীলংকা- সর্বত্র ভারতরাষ্ট্র তারা থাবা বাড়িয়েছে। সিকিম গ্রাস করেছে, সিকিমের ভারত-বিরোধী বিদ্রোহকে দমন করার জন্য সরাসরি ভারতীয় পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী নামিয়েছে, দেশের মধ্যে যারা ভারতের সিকিম গ্রাসের বিরোধী তাদের গলা টিপে ধরেছে। শ্রীলংকায় 'পিস কিপিং ফোর্স'-এর ছদ্মবেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী রেখে দিয়েছে বহুদিন। ভুটানকে ভারতের 'প্রোটেক্টরেট' করে দেশের মধ্যেও রেখেছে।

ভারত রাষ্ট্র কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে সামরিক কায়দায় মোকাবিলা করছে। দান্তেওয়াড়া, লালগড়, পার্বতীপুরমে বাস্তুচ্যুত-জীবিকা হারানো আদিবাসীদের ওপর আধা-সামরিক বা সরাসরি সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে। নাগাল্যান্ড বা সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত কার্যত আমলা-অধ্যুষিত দুর্নীতি-কণ্টকিত ঝকমকে ইন্ডিয়ার উপনিবেশে পর্যবসিত হয়েছে। আর এ সবই করেছে পুরোনো সাইমন আইন বা বিতর্কিত ইউএপিএ বা আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট মোতাবেক। ইংল্যান্ড-এর সিডিসন-বিরোধী পদক্ষেপ অনুসরণ করে ভারতরাষ্ট্রর বিরুদ্ধে চলমান ঘরে-বাইরে দ্রোহ দমনে আইনি বা বেআইনি যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। রাষ্ট্র ভিন্ন মতকে ততদিনই সহ্য করে, যতদিন সেই ভিন্নমত, রাজদ্রোহে রূপান্তরিত হয় না।

কিন্তু যখন চলতি ব্যবস্থাটাই অন্যায্য, তখন তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপগুলি ন্যায্য।

অধিকার চেতনা

শ্রম-শ্রমিক-শ্রমিক আন্দোলন : অধিকার ও অধিকার হারানো

কুশল দেবনাথ

জন্মলগ্ন থেকে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। আজকের দুনিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী যে অধিকার অর্জন করেছে তা সংগঠিত আন্দোলনের জোরেই পেয়েছে। সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন দিক, যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা সবই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ফসল। শ্রমিকরা লড়াই না করলে এই অধিকার তারা পেত না। শুধু এটুকুই নয়। যে সামাজিক সুযোগ সুবিধা সমাজে রয়েছে, যেমন সপ্তাহের ছুটি বা ৮ ঘণ্টা কাজের আইনগত স্বীকৃতি এগুলোও শ্রমিক আন্দোলনের ফসল। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই শুধু নিজের শ্রেণীর লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেটা গোটা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থও রক্ষা করেছে। প্রসঙ্গত আরো বলা যায়, যেমন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সোভিয়েত বিপ্লব না হলে আমরা জানতেই পারতাম না পেনশনটা কী। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম পেনশন প্রথা চালু করে। এক কথায় বলা যায় শ্রমিকরা যে এই মুহূর্তে বহুবিধ অধিকার অর্জন করেছে অর্থাৎ শ্রমিকরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও তার জীবনমানের, বাঁচার, অধিকারের বিষয়টা লড়াই, সংগঠনের জোরে আদায় করেছে। আজ গোটা দেশে যে ১৪০টা শ্রম আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটাও শ্রমিক আন্দোলনের ফল। শ্রমিকরা সংগ্রাম যতদিন করতে পেরেছে ততদিন সমাজের কাছে তার প্রাসঙ্গিকতা থেকেছে। এমনকি লড়াইয়ের জোরেই শ্রমিকরা শ্রমিকদের মধ্য থেকেই একসময় আমাদের দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধি আইন-সভায় পাঠাতে পারত। বিষয়টা হলো পুঁজির আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই-ই তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

অন্যদিকে পুঁজিপতিরাও বসে থাকেনি। তারা শ্রমিকদের অধিকার কাড়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছে। আমাদের দেশে যে অধিকার শ্রমিকরা অর্জন করেছিল, শ্রমিক আন্দোলন ছত্রভঙ্গ অবস্থায় থাকার জন্য সেই অধিকারগুলি তারা হারাতে শুরু করেছে। যেমন ধরা যাক ৮ ঘণ্টা কাজের বিষয়টা। ৮ ঘণ্টা কাজের স্বীকৃতির বিষয়টা শুধুমাত্র আইনগত দিক ছিল না। এর একটা সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত অবস্থান ছিল। অর্থাৎ একজন শ্রমিক তার জীবন কীভাবে কাটাবে, সমাজে তার অবস্থান কী হবে, সেটাও জড়িয়েছিল ৮ ঘণ্টা কাজের সময়সীমার মধ্যে। এখন পুঁজিপতিরা বলছে, কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে না। কাজের ক্ষেত্রে মালিকরা ঠিক করে দেবে শ্রমিকরা কতক্ষণ কাজ করবে। এখন শ্রমিকদের ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে, যে উন্নত মতাদর্শগত অবস্থান থেকে ৮ ঘণ্টা কাজের সময়সীমার বিষয়টা এসেছিল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সেই মতাদর্শগত অবস্থান দুর্বল হওয়ার জন্য মালিকশ্রেণী এই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারছে। যে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টা শ্রমিকের জীবনে উঠে এসেছিল, সেই সামাজিক সুরক্ষার দিকগুলিও কেড়ে নেওয়ার ভয়ঙ্কর প্রয়াস অব্যাহত। এখন পুঁজিপতিদের মূল কথাই হলো— শ্রমিক আসবে, শ্রম দেবে, মজুরি নেবে, চলে যাবে। শ্রম না দিলে মজুরি নেই, সামাজিক সুরক্ষা তো দূরের বস্তু। রাষ্ট্রও এখানে ক্রমশ নিজের হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তার দিকটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগে শ্রমিকদের উপর এই নিরন্তর আক্রমণ চলছে। অপরদিকে মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের অধিকার কাড়ার জন্য শ্রমব্যবস্থার ব্যাপক বদল করছে। তারা উৎপাদন ব্যবস্থা, কর্মব্যবস্থা ও শ্রমব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। একটি কারখানাকে ভেঙ্গে একই কাজকে বাইরে আউটসোর্সিং করা হচ্ছে। অর্থাৎ একদল কারখানার শ্রমিক, আরেকদল বাইরের শ্রমিক। একই পণ্য উৎপাদনে দুরকম শ্রমিক। দুধরনের মজুরি। অর্থাৎ সংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থাতেও অসংগঠিত শ্রমিক বানানো হলো। তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হলো। ভাগা, ভাউচার, আউটসাইডার ইত্যাদি।

একটা উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রাজ্য সরকার পরিচালিত কল্যাণী স্পিনিং মিল্‌স। এখানে সরাসরি উৎপাদন করার জন্য একদল শ্রমিক নিয়োগ করা হলো, যাদের নাম দেওয়া হলো আউটসাইডার ওয়ার্কার্স। গোটা শ্রম বিরোধ আইনে এই ধরনের কোনো নাম নেই। এই শ্রমিকদের কাজ কী? কাজ প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত থাকা। অর্থাৎ একদল স্থায়ী শ্রমিক যে উৎপাদন করত এরা তা বা তার থেকে বেশি উৎপাদন করত। এদের পিএফ, ইএসআই তো দূরের কথা পরিচয়পত্রও ছিল না। যেখানে স্থায়ী শ্রমিকদের বেতন ছিল দৈনিক ৪৫০ টাকা তখন একই উৎপাদন করে এরা বেতন পেত দৈনিক ৮০ টাকা। কী বিশাল বেতন বৈষম্য! এই শ্রমিকরা যখন পরিচয়পত্র থেকে বেতন বাড়াবার দাবি তুললো তখন এদের গেটের বাইরে করে দেওয়া হলো। স্থায়ী শ্রমিকরাও এদের জন্য এগিয়ে এলো না। এক সাথে ২০০ শ্রমিকের কাজ গেল। কম পয়সায়, বিনা দাবিতে উৎপাদন করলে কাজ করো, সংগঠিত হয়ে দাবি রাখলে কাজ বন্ধ। সরকারি মিলেই যদি এই নৈরাজ্য চলে তবে বেসরকারি মিলে কী অবস্থা হয় তার কথা আর বলার প্রয়োজন থাকে না। আর একটা বিষয়ও এখানে বুঝতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো একই

উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বকে পাল্টে দেওয়া ও কমিয়ে দেওয়া, এমনকি বন্ধ করে দেওয়া। অপরদিকে বিরাট বেতন বৈষম্য তৈরি করে শ্রমিকে শ্রমিকে বিভাজন আনা। সব মিলিয়ে বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমব্যবস্থা ক্রমশ বদলে দেওয়া হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই বদলে দেওয়ার পিছনে কারণটা কী? কেন সংগঠিত শ্রমিককে অসংগঠিত, স্থায়ী শ্রমিককে অস্থায়ী, একই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে একই ধরনের কাজ করেও বিরাট বেতন বৈষম্য, একই উৎপাদন ব্যবস্থায় ভিতরের শ্রমিক— বাইরের শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে কেন? কারণ হচ্ছে, এইভাবে করতে পারলে শ্রমিকদের যা প্রাপ্য আইনি অধিকার তা থেকে তাদের অনেকটা বঞ্চিত করা যাবে। কাজের নির্দিষ্ট সময়, নিরাপত্তা রক্ষা, শ্রম আইনের প্রয়োগ সব পাল্টে দেওয়া যাবে। আবার উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিক-শ্রমিক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ অধিকার বিষয়ক দ্বন্দ্বকে সরিয়ে দেওয়া যাবে।

আগেই বলেছি, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের জোরেই শ্রমিকরা তাদের অধিকারগুলি অর্জন করেছিল। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হবার কারণে, বেশিরভাগ শ্রমিক সংগঠনগুলি লড়াকু দৃষ্টিকোণ বাতিল করার কারণে পুঁজিপতি শ্রেণী বা মালিকশ্রেণী এই ধরনের পাল্টা আক্রমণে নামতে সমর্থ হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণী যে অধিকারগুলি অর্জন করেছিল, সেই অধিকারগুলি ক্রমশ হারাতে চলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমনটা সম্ভব হলো কী করে? এর প্রধান কারণ হলো শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যর্থতা। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে শ্রমিকরা যেমন অধিকার অর্জন করেছিল, আবার ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একাংশ শ্রমিকদের সাথে বেইমানি করেছে। মালিকশ্রেণীর বিভিন্ন আক্রমণকে এই সমস্ত নেতারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তা দিচ্ছে। শুধু চুক্তির দিক থেকে নয়, মতাদর্শগত দিক দিয়ে তারা মালিকদের মতাদর্শের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে। দুটো দৃষ্টিকোণ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হয়। একটা শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ— যে দৃষ্টিকোণের সারবস্তুই হলো শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা করা। শ্রমিক স্বার্থের বিষয়টা এখানে প্রধান দিক হিসাবে থাকে। আবার আর একটা দৃষ্টিকোণ হলো মালিকের দৃষ্টিকোণে সব কিছু করা। অর্থাৎ মুখে শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রেণীস্বার্থের কথা বললেও অন্তর্বস্তুতে মালিকের পক্ষে দাঁড়ানো। মালিকের হাতকে শক্ত করা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই কাজ তারা মালিকের স্বার্থে করে চলেছে। বিষয়টা একটু অন্যভাবে আলোচনা করা যাক। গত কয়েক বছর ধরে উন্নয়ন কথাটা খুব চলছে এ রাজ্যে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উন্নয়নের জন্য সিঙ্গুরে টাটাদের জমি দেওয়া, নন্দীগ্রামে সালেমদের কেমিক্যাল হাবের প্রস্তাব আমরা দেখেছি। এখন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার একই উন্নয়নের কথা বলছে। একটু আলোচনা করা যাক উন্নয়ন সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক কী। শ্রমিকের উন্নয়ন বলতে শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থায় একরকম হবে, আর রাষ্ট্র যদি পুঁজিবাদী সমাজের হয় তা আরেক রকম। শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চলে সেখানে প্রধানত বুর্জোয়াদের মুনাফার বিষয়টাই প্রধান, শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়ন প্রধান নয়। বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী দুটো বিপরীতমুখী শক্তি। ফলে উন্নয়ন কখনোই একভাবে হয় না। বুর্জোয়া মতাদর্শ ক্ষমতায় থাকলে উন্নয়ন তাদের মতোই হবে। তারা তাদের মতো করেই শাসনব্যবস্থা সাজাবে। বুর্জোয়ারা চাইবে তাদের মুনাফা এবং আরো মুনাফা। অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর উন্নয়ন বলতে বোঝাবে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার মৌলিক সমস্যার সমাধান। আমাদের মতো একটি পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নয়নও প্রধানত ক্ষমতায় থাকা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবে। মুকেশ আম্বানি, যার আয় প্রতি সেকেন্ডে হাজার টাকা, সে উন্নয়ন যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে, এক অসংগঠিত শ্রমিক যারা দৈনিক আয় ৩০-৩৫ টাকা সে কি একই দৃষ্টিকোণে দেখবে? না, দেখতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধদেবের আমলে যে উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল আর মমতা ব্যানার্জীর আমলে যে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে মৌলিক নীতিগত তফাত নেই। সুতরাং উন্নয়নের দৃষ্টিকোণে সিপিআই(এম) এবং তৃণমূল কংগ্রেস একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। তাই দেখি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেভাবে সিটু-র নেতারা মালিকের পক্ষে দাঁড়াত আর আজ ক্ষমতার পালাবদল হবার পর তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা একই অবস্থান গ্রহণ করেছে। কারখানায় কারখানায় সিটু নেতারা যে কাজ করত অর্থাৎ শ্রমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে কম পয়সায় কাজ করতে বাধ্য করানো, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত হওয়ার অধিকার কাড়া, মালিকের পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি করা। আজ তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা একই কাজ করছে। নেতাদের রঙের পরিবর্তন ঘটেছে, চরিত্রের ঘটেনি। এই যে ট্রেড ইউনিয়নের ব্যর্থতা বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলা শ্রমিকদের সাথে বেইমানি করা, সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। সুতরাং মোদ্দা অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে যে মালিকের স্বার্থ-ই প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। অপরদিকে রাষ্ট্র যেহেতু কোনো শ্রেণী নিরপেক্ষ সংস্থা নয়, নির্দিষ্টভাবে কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষে কাজ করে, সুতরাং আমাদের দেশেও রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত মালিকের পক্ষে দাঁড়ায়। এখানে রাষ্ট্রের যে অংশ শ্রমদপ্তর তার কাজ প্রধানত শ্রমিকদের পক্ষে যায় না। এর পরিণতিতে শ্রমিকদের একটা বড় অংশই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন হলো শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন। ট্রেড ইউনিয়ন বৃহত্তর শ্রমিক

সমাজকে একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করে। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ন বৃহত্তর শ্রমিক সমাজকে একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করে। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়নে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ট্রেড ইউনিয়নই সঠিক ট্রেড ইউনিয়ন বলে কাম্য হয় যে ইউনিয়নে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে। যখন শ্রমিক আন্দোলন উত্তাল থাকে তখন শ্রমিকরা সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়ায় থাকে। কিন্তু আজ শ্রমিক আন্দোলনের ভাটার পর্যায়ে বড়ো অংশের শ্রমিক মানসিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা ইউনিয়নকে মনে করে নেতাদের ইউনিয়ন। মালিকশ্রেণী তার আক্রমণকে বেশি করে নামাতে পারছে এই কারণে যে ব্যাপক শ্রমিক এটা মেনে নেওয়ার জায়গায় আছে। মানসিকভাবে সে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের জায়গায় নেই। এক ধরনের সমঝোতার মানসিকতা কাজ করছে। এই যে সমঝোতার মানসিকতা তার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন দুর্বল হচ্ছে, শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হচ্ছে, বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠছে না।

এবার অন্য একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আগেই লিখেছি, শ্রমিক আন্দোলনের জোরে শ্রমিকরা শুধু নিজের দাবি আদায় করে নি, এমন দাবি আদায় করেছে যাতে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়েছে। ৮ ঘণ্টা কাজের আইন, রবিবারের ছুটি, কিংবা পেনশন প্রথা এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। এমনকি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতেও তারা সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে বৃহত্তর সমাজ থেকে শ্রমিকশ্রেণী যেন এ্যালিয়েনেটেড হয়ে গেছে। এই বিষয়টা আমরা সব থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারি বন্ধ কারখানার বিষয়ে। হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, কারখানা বন্ধের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হলো অর্থনীতি, তবু সমাজে কোনো আলোড়ন হলো না। হাজার হাজার শ্রমিক কাজ হারালো, কর্মক্ষম মানুষেরা প্রান্তিক মানুষে পরিণত হলো। শ্রমিক শুধু তার কাজ হারালো না, সমাজ হারালো দক্ষ শ্রম। যে দক্ষতায় সে পণ্য উৎপাদন করত সেই দক্ষতাকে আর সমাজের স্বার্থে কাজে লাগানো হলো না, তারা অনুৎপাদক শক্তিকে পরিণত হলো। আবার বন্ধ কারখানার হাজার হাজার একর জমি অব্যবহার্য অবস্থাতেই পড়ে আছে। সম্পদ উৎপাদনের কোনো প্রক্রিয়া নেই। সিঙ্গুরে জমি দখল নিয়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো সমাজ জুড়ে। ন্যায্য প্রতিবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজ্যের বন্ধ কারখানার কত হাজার একর জমি যে বেহাত হয়ে যাচ্ছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সরকার-মালিক-মাফিয়া ত্র্যহস্পর্শে বিভিন্ন কলকারখানার জমি বেহাত হয়ে গেছে। একটা উদাহরণ দিই— বঙ্গোদয় কটন মিলের জমিতে পিয়ারলেস আবাসন হয়ে গেল, কিন্তু সেই কারখানার শ্রমিকরা কোনো বকেয়া টাকা আজ পর্যন্ত পায় নি। এরকম উদাহরণ অজস্র দেখা যাবে। বস্তুত কত 'সিঙ্গুর' যে নীরবে হয়ে গেছে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে, তার কি আমরা খবর রাখি? অথচ এর বিরুদ্ধে সামাজিক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় নি।

অপরদিকে বিভিন্ন কারখানার যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেটা সমাজের কাছে আসতে পারছে না। থাকছে একটা পারস্পরিক যোগাযোগহীনতা। এতে বড়ো ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের। ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সামাজিক আন্দোলনের।

এই যে অবস্থা এই অবস্থায় কী করা দরকার? এই প্রশ্ন আজ খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে, বিগত দশকগুলির শ্রমিক আন্দোলনের। শ্রমিকদের বড়ো অংশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে বিযুক্ত হলো কেন তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব যাতে মুখোমুখী হতে না পারে, তার জন্য মালিকরা নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্রমিকদের ভাগ করেছে। এখানে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বকে সরাসরি মুখোমুখী দাঁড় করানোর জায়গায় যেতেই হবে। ট্রেড ইউনিয়নে যে নেতৃত্ব আজ মালিকদের মতাদর্শর উপর দাঁড়িয়ে চলছে তাদের মুখোশ নির্মমভাবে খুলে দিতে হবে। পুঁজির চরিত্র আজ আন্তর্জাতিক। সুতরাং শ্রমিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। শ্রম-শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করতে হবে শ্রমিকদের মধ্যে, যাতে নানা মতের সংঘাতের মধ্য দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী ভাবধারা শ্রমিকরা গ্রহণ করতে পারে। এবং নতুন ধারার শ্রমিক আন্দোলন যাতে বিকশিত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ব্যাপক শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আমরা দেখেছি, শ্রমিক আন্দোলন সমাজ বা সামাজিক ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। এতে ক্ষতি যেমন হচ্ছে সমাজের, ক্ষতি হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের। অথচ আমরা দেখেছি ১৯৩৭ সালে যখন চটকল শ্রমিকরা লাগাতার ধর্মঘট করছেন, তখন সমাজ কীভাবে তার পক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত চটকল শ্রমিকদের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকে জয়ার শ্রমিক আন্দোলনের স্বপক্ষে গোটা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষেরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে নয়ের দশকে কানোরিয়া জুট শ্রমিক আন্দোলন সামাজিক ভাবে তার প্রাসঙ্গিকতা রাখতে পেরেছিল। আজ যখন শ্রমিক আন্দোলন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তখন শ্রমিক আন্দোলনকে শুধুমাত্র নিজস্ব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক স্তরে তাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হবে। একদল মানুষ তাদের শ্রম দিয়ে গোটা সমাজটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে এবং তার ফসলটা গোটা সমাজ পাচ্ছে। তারা যখন আক্রান্ত, তখন সমগ্র নাগরিক সমাজকে তার পক্ষে দাঁড়াতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শ্রমিক সহায়ক নাগরিক আন্দোলন। অর্থাৎ নতুন অবস্থায় দাঁড়িয়ে নতুনভাবে ভাবনাচিন্তার মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনকে বিকশিত করতে হবে।

ভূমিজীবী মানুষের ভূমি অধিকার

প্রণব দে

জল, জমি, বাতাস— এ সবই প্রাকৃতিক সম্পদ। আমরা সবাই জানি, এই সমস্ত মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ বিনা এই পৃথিবীতে জীবজগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কাজেই এইসব মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জীবজগতের এক স্বাভাবিক অধিকার বর্তমান। ব্যতিক্রম একমাত্র মনুষ্য সমাজ। মনুষ্য সমাজে যেদিন থেকে শ্রেণীভেদের উৎপত্তি হয়েছে, সেদিন থেকে অধিকারের সমস্ত স্বাভাবিকতাও বিলুপ্ত হয়েছে।

জমির বিশেষত্ব হচ্ছে যে জমি, মানুষের শ্রম যুক্ত হওয়ার ফলে, সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে রূপান্তরিত হয়েছিল উৎপাদনের অন্যতম হাতিয়ারে। প্রকৃতপক্ষে জমিই ছিল সম্পত্তির আদি উৎস। বিবর্তনের পথ ধরে সম্পত্তি-মালিকানার চরিত্রও ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হলো। প্রাথমিক গোষ্ঠীগত মালিকানা থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভব হলো ব্যক্তিগত মালিকানা। জমি ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করলো ব্যক্তির হাতে। সামন্ততন্ত্র জন্ম দিল ভূমিদাস প্রথার। তারপর এক সময়ে জমি-কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে বদল আনলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। জমি পরিণত হলো পুঁজির উপকরণে। আধুনিক উদারনৈতিক বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজি শুধু জমিই গ্রাস করলো না, জল-বাতাস সহ মানুষের বেঁচে থাকার প্রতিটি প্রাকৃতিক উপাদান এখন পুঁজির গ্রাসে।

২

ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন, বিশ্বের ৬২টি দেশে ৮ থেকে ২০ কোটি একর কৃষিজমি ৪১টি দেশের বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার দখলে। ৬২টি দেশের মধ্যে লুণ্ঠনের তীব্রতা ঘনীভূত হয়েছে মূলত এশিয়া-আফ্রিকার ২৪টি দেশে। সামগ্রিকভাবে বর্হিদেশীয় দখলিকৃত জমির ৩৩ শতাংশ এশিয়ায়, ৪৭ শতাংশ আফ্রিকা মহাদেশে (২০১২)।[১]

ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষকরা তাঁদের তালিকায় যে ৬২টি অপহৃত দেশের (grabbed countries) নাম দিয়েছেন, তার মধ্যে ভারতের নাম নেই। কিন্তু ৪১টি অপহারক দেশের (grabbing countries) তালিকায় ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা ঠিক, ভারত এখন অন্য দেশে, বিশেষত আফ্রিকার গরিব দেশগুলিতে, জমি-অপহারক দেশগুলির অন্যতম। আমেরিকা ও চীনের পরেই ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অপহারক দেশ। ৬৩ লক্ষ হেক্টর (১.৫৬ কোটি একর) ভিনদেশী কৃষিজমি ভারতীয় কোম্পানীগুলির দখলে।[২] ভারত এখন অন্যতম কৃষিসাম্রাজ্যবাদী দেশ।

রাষ্ট্রসংঘ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী উন্নতিশীল দেশগুলিতে ২০০ কোটি মানুষের জীবিকা ৫০ কোটি ক্ষুদ্র জোতের উপর নির্ভরশীল। এশিয়া এবং আফ্রিকার নিম্ন-সাহারা অঞ্চলে এই ক্ষুদ্র জোতগুলিতে ৮০ শতাংশ খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়।[৩] এই অবস্থান আর বজায় থাকছে না। জমি দখলকারী দেশগুলি গরিব দেশগুলির কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে থাবা বসিয়ে কৃষিজ দ্রব্যের বাণিজ্যে প্রায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেছে। খাদ্যশস্য, বাণিজ্যিক ফসল, পশুখাদ্য, ভোজ্য তেল, জ্বালানি শস্য ইত্যাদি নানাবিধ পণ্য উৎপাদনে কর্পোরেট সংস্থাগুলি কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে। সেখানকার সাধারণ মানুষ খাদ্যাভাবে ধুঁকছে, কিন্তু কোম্পানীগুলি খাদ্যপণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্জন করছে বিশাল পরিমাণ মুনাফা। খাদ্যাভাবে দেশে দেশে দেখা দিচ্ছে খাদ্য-দাঙ্গা।

৩

ভারত যে শুধু বর্হিদেশীয় জমি লুণ্ঠনে সুনাম অর্জন করেছে, তা নয়। অর্ন্তদেশীয় ক্ষেত্রেও চলেছে অবাধ জমি লুঠ। অর্ন্তদেশীয় লুণ্ঠনের পরিসংখ্যানগত তথ্য সুলভ না হলেও, অধিগ্রহণ-বিরোধী বিক্ষোভগুলির কল্যাণে, বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা কর্তৃক জমি লুঠের ঘটনা এখন আর অজানা নয়।

জমির মূল্য শুধু উপরিতলে নয়। জমি খনন করে আহরিত হয় বহুমূল্য খনিজ সম্পদ। ভারতবর্ষের উন্নয়নে জমির বহুমুখী ব্যবহার। জমির উপরিতল প্রয়োজন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিস্তার প্রকল্পের কারণে আর অভ্যন্তর প্রয়োজন খনি

সারণী-১: বিকাশমান ক্ষেত্রগুলিতে জমির চাহিদা (হেক্টর)[৪] —২০২৬ পর্যন্ত

ক্ষেত্র	*উপক্ষেত্র*	*জমির চাহিদা*		
		২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত	*ভবিষ্যত চাহিদা*	*মোট পরিমাণ*
শস্য-জ্বালানি	জ্যাট্রোফা	৫,০০,০০০	৪৪,০০,০০০	৪৯,০০,০০০
	জৈবশক্তি	২,৭৩,৭০০	২০,০০,০০০	২২,৭৩,৭০০
পরিকাঠামো	রাস্তা	১৮,১৬,৩৫৫	৩১,১৭,০০০	৪৯,৩৩,৩৫৫
	বাঁধ	২৯,০৭,০০০	৩৯,০৮,১৭১	৬৮,১৫,১৭১
	সেজ	৮৬,১০৭	১,৫০,০০০	২,৩৬,১০৭
খনি	কয়লা	১,৪৭,০০০	৫,৩৫,৪৪৫	৬,৮২,৪৪৫
	লোহা	৮৮,০৬৫	৩,২০,৭৭৫	৪,০৮,৮৪০
	বক্সাইট	৩০,০৫৯	১,০৯,৪৮৯	১,৩৯,৫৪৮
	চুনাপাথর	১,৪৪,৯৭৯	৫,২৮,০৮৩	৬,৭৩,০৬২
	অন্যান্য খনিজ	২,৪৪,৩০১	৮,৮৯,৮৬২	১১,৩৪,১৬৩
অপ্রচলিত শক্তি (২০৩২ পর্যন্ত)	বায়ু	১,৮০,০০০	৫,৪০,০০০	৭,২০,০০০
	সৌর	৭৬	১,০০,০০০	১,০০,০৭৬
অন্যান্য		৯৩,৬২৪	১৩,৬০,০০০	১৪,৫৩,৬২৪
মোট		৬৫,১১,২৬৬	১,৭৯,৫৮,৮২৫	২,৪৪,৭০,০৯১

খননে। আধুনিক এই উন্নয়ন যজ্ঞে ভারতের কতটা পরিমাণ জমি আহুতি দিতে হচ্ছে বা হবে, তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্ররূপ পূর্ব পৃষ্ঠায় ১নং সারণীতে বর্ণিত হয়েছে।

আগামী এক দশকে যে পরিমাণ জমি উন্নয়নের খাদ্য হবে, তা ভারতবর্ষের মোট কৃষিজমির ১৩.৪ শতাংশ এবং ভারতের মোট জমির প্রায় ৮ শতাংশ। ইতিমধ্যেই গত দুই দশকে ২৭.৬ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি হ্রাস পেয়েছে।[৫] কৃষিজমি, কৌমভূমি, জলাজমি, অরণ্যভূমি সম্পৃক্ত এই বিশাল ভূমির সমস্তটাই যাবে কর্পোরেট শক্তির হাতে। স্বীকৃত এবং ঐতিহ্যবাহী অধিকার থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করার এক দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা শুরু হয়েছে উন্নয়নের পটভূমিতে।

৪

২০০১ সালে ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৭২ শতাংশ। ২০১১ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৬৯ শতাংশে। কমলেও ভারতীয় ভূখণ্ডে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ৯৪ শতাংশ এখনও গ্রামবাসীদের কব্জায়। ভারতে গ্রামীণ পরিবারগুলির মালিকানাধীনে আছে ১০.৭২ কোটি হেক্টর এবং শহুরে পরিবারগুলির অধীনে আছে মাত্র ৭২.১ লক্ষ হেক্টর জমি (২০০৩)।[৬] দেশের নগরায়ন পরিকল্পনায় এই অনুপাতটাকে বদলে দেওয়ার আয়োজন চলছে। পি চিদাম্বরম যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তখন *তেহেলকা* পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে (৩১/০৫/০৮)বলেছিলেন, ‘‘আমি দারিদ্রমুক্ত সেই ভারতের স্বপ্ন দেখি, যেখানে অধিকাংশ, ৮৫ শতাংশের মতো ভারতবাসী, শহরে বাস করবে’’। চিদাম্বরমের স্বপ্নের ভারত ইতিমধ্যেই রূপ পেতে শুরু করেছে শহরের বস্তিতে, খালপাড়ে, রেললাইনের ধারে, নোনাডাঙার খোলা মাঠে। সেখানেও চলছে খেদাই অভিযান। মন্ত্রীমশাইয়ের স্বপ্নের ভারত থেকে শুধু গ্রামবাসীরা বিতাড়িত নয়, শহরের গরিবদেরও ঠাঁই নেই।

শহর হোক বা গ্রাম, জমির উপর প্রাথমিক অধিকার কার, আজকের উন্নয়নে এটাই মৌলিক প্রশ্ন। নব্য উদারনীতিবাদী উন্নয়নের যারা পুরোহিত, প্রোমোটার থেকে বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যান, জমি তাদের চোখে নিছক এক সম্পত্তি, যার ব্যবহারে বা কেনাবেচায় জমি মালিকের মুনাফা বাড়ে। দেশের প্রান্তিক মানুষ জমিকে সম্পত্তি হিসাবে যত না মূল্য দেয়, তার থেকে অনেক বেশি মূল্য আরোপ করে জীবন-জীবিকার সংস্থান হিসাবে। জমিকে ঘিরে যাদের জীবন নির্বাহ হয়, জমি তাদের অস্তিত্বের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। শুধু কৃষিজমির নিরিখে এই বিচার করা হচ্ছে না। এ দেশে এমন অনেক জমি আছে, যা সাধারণের সম্পত্তি (common property) বা কৌম সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। গোচারণ ভূমি, তৃণভূমি, জলাভূমি, পুকুর ইত্যাদি জমি সংশ্লিষ্ট মানুষজনের নিত্য জীবনের সাথী। এছাড়া আছে অরণ্যভূমি। গভীর অরণ্যে না হলেও, বনাঞ্চলে প্রান্তিক মানুষের বসবাস রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকে স্বীকৃত। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার হিসাবে ভারতের ভৌগোলিক ক্ষেত্রের ১৫ শতাংশ কৌম সম্পত্তি, অঙ্কের হিসাবে যার পরিমাণ ৪.৭৫ কোটি হেক্টর (১৯৯৮)। কৌম সম্পত্তির মধ্যে ২৩ শতাংশ গোচারণ ভূমি, ১৬ শতাংশ গ্রাম সন্নিহিত বনভূমি এবং পতিত জমি সহ অন্যান্য ক্ষেত্র ৬১ শতাংশ। ৪৮ শতাংশ পরিবার এই কৌমসম্পত্তি থেকে তাঁদের দৈনিক প্রয়োজনের কিছু না কিছু আহরণ করেন, সমীক্ষা সময়কালীন যার বাজারমূল্য ছিল অঞ্চলভেদে ২৬৬ টাকা থেকে ১১৭৪ টাকা। গড় মূল্য ৬৯৩ টাকা।[৭] সমীক্ষা-পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে ৯ লক্ষ হেক্টর কৌমজমি বিলুপ্ত হয়েছিল। এর অর্থ জনঘনত্বের বিচারে (২০০১) ভারতবর্ষের প্রায় ২৯ লক্ষ মানুষ হয় স্থানচ্যুত হয়েছিল অথবা জীবন-জীবিকার সংস্থান হারিয়েছিল। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে ভারতের কত মানুষ কৌমভূমির উপর নির্ভরশীল, তার স্পষ্ট তথ্য অমিল। জনঘনত্বের বিচারে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রদত্ত কৌমভূমি এলাকায় জনসংখ্যা ছিল ১৫.৪ কোটি (১৯৯৮)। অরণ্যভূমি জাতীয় নমুনা সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। ১৯৯৭ সালে FAO প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অনুমান করা হয়েছিল, ১০ কোটি মানুষ ভারতের অরণ্যভূমিতে বাস করেন। সব মিলিয়ে কম করেও ২৫/৩০ কোটি মানুষ কৌমভূমির উপর নির্ভরশীল।[৮]

৫

মানুষ যে পরিবেশের মধ্যে বাস করে, সেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষের জীবনযাত্রা রচিত হয়। জীবনযাত্রার পদ্ধতি প্রকরণের মধ্য থেকেই বিকাশ লাভ করে শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করলে মানুষ প্রকৃতিদত্ত কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা স্বাভাবিকভাবে অর্জন করে। নদীর ধারে যাদের জীবনযাপন, নদী তাদের মাছ দেয়। মাছই তাদের ভরণপোষণের প্রধান উপকরণ। বনে যাদের বাস, ফল-ফুল-পাতা-কাঠ নির্ভর করেই গড়ে ওঠে তাদের জীবনযাত্রা। এগুলো তাদের প্রাকৃতিক অধিকার। গ্রামের পুকুর, নদী-খাল-বিল থেকে পানীয় জল আহরণ কিংবা জমিতে সেচ দেওয়া, গ্রামের মানুষ তাদের স্বাভাবিক অধিকার বলেই জেনে এসেছে। এই অধিকারগুলি ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলির জীবনধারণ সম্ভব নয়। আর জীবনযাত্রার ছন্দ ব্যাহত হলে, বিপন্ন হয় তাদের সংস্কৃতি।

আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিতে, ভূমিজীবী মানুষের মূল্যবোধে অধিকারবোধের ধারণা একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। ঔপনিবেশিক শাসকরা এই বহুমাত্রিকতাকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি। মূলবাসী মানুষদের সঙ্গে তাই তাদের লেগেছিল সংঘাত। সেইসব সংঘাতের অভিঘাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের ব্যক্তিগত জমিজায়গার ক্ষেত্রে কিছু সুরক্ষা কবচ অর্জন করতে পেরেছিল। কিন্তু কৌম সম্পত্তির ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসকরা রাষ্ট্রের অধিকার কায়েম করেছিল। অর্থাৎ গোষ্ঠী মালিকানার

পরিবর্তে রাষ্ট্রকে করা হয়েছিল কৌম সম্পত্তির মালিক। জমির ব্যবহারের জন্য সরকারকে কর দিতে হতো। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের থেকে বেশি কিছু দিতে পারেনি। সেই একই ঔপনিবেশিকতার ধারা বহন করে এসেছে।

রাষ্ট্র মালিক হওয়ার ফলে, কৌম সম্পত্তির উপর ব্যবহারকারীদের আর নিয়ন্ত্রণ থাকলো না। রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে কৌম সম্পত্তির হাতবদল হতে লাগলো খুব সহজেই। বিশেষত কর্পোরেট সংস্থার কাছে ভারত রাষ্ট্রের আত্মসমর্পনের গতি যত বেড়েছে, কৌম সম্পত্তি অধিগ্রহণের গতিও তত বেড়েছে। অন্ধ্র, আসাম, গোয়া, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১ কোটি একর অধিগৃহীত জমির (২০০৮) মধ্যে ২১.০৮ শতাংশ ছিল বনভূমি, ১৫.৭২ শতাংশ কৌমভূমি, ৬১.৮৬ শতাংশ রায়তি জমি এবং অন্যান্য জমির পরিমাণ ১.৩৪ শতাংশ।[৯] এই আটটি রাজ্যেই স্বাধীনতার পর কৌম জমি ধ্বংস হয়েছে ৩৮ লক্ষ একর।

কার্ল মার্কস তাঁর এক রচনায় বলেছিলেন, বুর্জোয়াদের দৃষ্টিতে সম্পত্তি-সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র সম্পর্ক। কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই কৃষককে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জমি হারিয়ে সর্বহারা হতে হয়। ১৮৯৪ সালের জবরদস্তিমূলক জমি অধিগ্রহণ আইনে কৃষকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। বৃহৎ কর্পোরেট কোম্পানিগুলো যে জমির দিকে আঙ্গুল তুলবে, তা দিতে হবে। কাগজে-কলমে কেবল কোম্পানি স্বার্থকে জনস্বার্থের সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে কোম্পানি স্বার্থকে জনস্বার্থ দেখিয়ে বেসরকারি কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আইন বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের "eminent domain" থিয়োরির সুযোগ নিতে স্বাধীন ভারতের শাসকরাও ছাড়েনি। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে, পুঁজিপতিদের জমি হরণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকারি যে প্রকল্পগুলো হয়েছে, সেখানেও কৃষক-স্বার্থ যে রক্ষিত হয়েছে, তা নয়। বৃহৎ বাঁধগুলি হাজার হাজার গ্রাম ডুবিয়েছে, কিন্তু পুনর্বাসন হয়নি। ওয়ালটার ফার্ণান্ডেজের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৭ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে, জমি অধিগ্রহণ ৬ কোটি মানুষকে উৎখাত করেছে। কিন্তু পুনর্বাসন হয়েছে ২৫ শতাংশেরও কম। উচ্ছিন্ন মানুষের ৪০ শতাংশ আদিবাসী এবং ৪০ শতাংশ তপশিল সম্প্রদায়ের।

রাষ্ট্রের অধিকার আছে উচ্ছেদ করার, আর নিজেদের জীবন-জীবিকা রক্ষা করার ন্যূনতম দায় সাধারণ মানুষের থাকবে না, এই ব্যবস্থার সঙ্গে আর যাই হোক গণতন্ত্রের কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। ইংরাজিতে একটা শব্দ আছে, 'oligopoly', মুষ্টিমেয়র শাসনতন্ত্র। দেশের অর্থনীতি এখন মুষ্টিমেয়র কব্জায়। কর্পোরেট-ব্যবসায়ী-প্রমোটারদের বেদীমূলে অর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে ভূমিজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা, স্বত্বের অধিকার।

২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জমি অধিগ্রহণের নতুন এক আইন বলবৎ হয়েছে— Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013। বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে এই আইন প্রসঙ্গে বিশদ অলোচনা সম্ভব নয়। তবে যেটা উল্লেখ করা দরকার তা হলো, বিশাল এই নামের আড়ালে আদতে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করার পরিসর আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেসরকারি কোম্পানির জন্য অধিগ্রহণকেও, নতুন আইনে, সরাসরি জনস্বার্থের সংজ্ঞাভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশের সম্মতির নেওয়ার বিধান আইনে যুক্ত করা হলেও, বিষয়টিকে কেবলমাত্র বেসরকারি কোম্পানি এবং পাবলিক-প্রাইভেট প্রকল্পগুলির (পিপিপি) ক্ষেত্রেই সীমিত রাখা হয়েছে, সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত করা হয়নি। পরিকাঠামো সহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়টাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, পুনর্বাসনের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও পুনর্বাসনের রূপটি অস্পষ্ট। চতুর্থত, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলেও, ১৩টি বিভাগীয় আইনকে নতুন আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অধিগ্রহণ বিরোধী যে আন্দোলন বিগত দশকে সারা দেশে ব্যাপ্ত হয়েছিল, তারই চাপে শতবর্ষ প্রাচীন আইন পরিত্যক্ত হলেও, যেভাবে মুনাফাকামী ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে জনস্বার্থের আওতাভুক্ত করা হয়েছে, তাতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত কী ফলাফল দাঁড়াবে, তা বলা কঠিন। 'মুনাফা' এবং 'জনস্বার্থ'— পাশাপাশি পথ হাঁটা সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিক কালে আদিবাসী ও বনবাসী সম্পর্কিত দুটি আইন এ দেশে চালু হয়েছে। 'পেসা ১৯৯৬' [Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996)] এবং 'বনাধিকার আইন ২০০৬' [Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006]। পেসা আইনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে গ্রামসভাগুলিকে কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন, উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত অধিগ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভাগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ক্ষুদ্র খনিজের জন্য লাইসেন্স অথবা পারমিট পাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার অনুমতি বাধ্যতামূলক। বনাধিকার আইন অনুযায়ী বনবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত তদন্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া চলবে না।

আইন মানার প্রাথমিক দায়িত্ব তো সরকারের। তা সরকার আইন মানছে কই? আদালত বা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নেহাৎ বাধ্য না হলে, কোনো বৃহৎ কর্পোরেট কোম্পানির ক্ষেত্রে এই আইনগুলি বাধা হয়ে উঠছে না। উড়িষ্যায় 'পস্কো'-র ক্ষেত্রে বনভূমি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি গ্রামসভা স্পষ্ট বিরোধিতা করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে তা স্বীকারও করা হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও গ্রামবাসীদের

মতামত উপেক্ষা করে, রাজ্য সরকারের রিপোর্টের উপর "বিশ্বাস স্থাপন করে", কেন্দ্রীয় সরকার পস্কো-কে পরিবেশ ছাড়পত্র দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। উড়িষ্যারই অঙ্গুলে জিন্দাল কোম্পানিকে, বনাধিকার আইন লঙ্ঘন করার কারণে, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক কারণ দর্শাবার নোটিশ দেয়। কিন্তু একবার শুনানির পরই কোম্পানি পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়ে যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে 'পোলাভারম' বাঁধের ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে 'নিশ্চিত' করে রিপোর্ট দেয় যে, ঐ অঞ্চলে কোনো বনাধিকারের দাবিদার নেই। বাস্তবে অধিগৃহীত অঞ্চলের ৩০০০ বন-গ্রামের অধিকাংশই ছিলেন অরণ্যচারী আদিবাসী। বনাধিকারের দাবিতে ৮৭ হাজার ব্যক্তিগত এবং ১৮০০ কৌম অধিকারের আবেদন জমা পড়েছিল।[১০] সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এই জঘন্য মিথ্যাচারকে কেউ কখনো দুর্নীতি আখ্যা দিয়েছে শোনা যায়নি। একমাত্র বেদান্ত কোম্পানির ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমী ঘটনাটি ঘটেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সরকার গ্রামসভার মতামত নিতে বাধ্য হয়। বারোটি গ্রামসভার প্রত্যেকে বনাঞ্চলে খননের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করে। সরকার আপাতত অনুমোদন স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে।

পেসা-র ক্ষেত্রেও আইন মানার দায় সরকার দেখায় নি। আইন হিসাবে পেসা বেশ দুর্বল। অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে "আলোচনার" বিধান আছে, "লিখিত সম্মতির" কথা বলা নেই। কাগজে-কলমে 'আলোচনা' দেখিয়ে অথবা জোর-জুলুম করে নামে-বেনামে কাগজে সইসাবুদ করিয়ে, জমি অধিগ্রহণ করার নজিরের অভাব নেই। ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় ইন্দ্রাবতী নদীর তীরে ধুরাগাঁও গ্রাম। টাটা স্টিল এখানে ইস্পাত কারখানা করবে বলে যে ১০টি গ্রামের ১২ হাজার অধিবাসীকে উচ্ছেদ করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে, ধুরাগাঁও তারই একটি। অধিবাসীদের অধিকাংশ 'মাদিয়া' গোত্রের আদিবাসী। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, তাদের কখনও বলা হয়নি যে, তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হবে। কিন্তু তারা খবরটা সংবাদপত্র মারফৎ জেনেছে। ছলচাতুরি এবং জবরদস্তি করে সরকার অধিগ্রহণ শুরু করে। ২০০৬-এর জুলাই ও আগস্ট মাসে সরকার গ্রাম সভার বৈঠক আহ্বান করে। গ্রাম থেকে যাতায়াতের রাস্তায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঐ গ্রামেরই মাহাঙ্গু মাদিয়া বলে যে, "সভায় যাওয়ার আগে প্রবেশপথে আমাদের একটি রেজিস্টারে সই করতে হয়েছিল। সরকারের অফিসাররা আমাদের বলে যে আমাদের ভালোর জন্যই ইস্পাত কারখানা হচ্ছে। এর পরে আমরা দেখলাম, স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রশাসন বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে গ্রামবাসীরা তাদের জমি দিয়ে দিতে রাজি আছে।" মাহাঙ্গুর জিজ্ঞাসা "সরকার কি সত্যি গরিবদের জন্য ভাবে, নাকি সরকার কেবল বড়লোকদের জন্য?" প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত থোকরাগুরা গ্রামের সরপঞ্চ হিডমো রাম মান্ডবীর ক্ষুব্ধ ভাষ্য, "আমাদের সম্পত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু আমরা শান্তিতে আছি। জমি কেড়ে নিয়ে কোম্পানি আমাদের কুলি বা চাপরাশি বানাবে। এখন আমরা জমির মালিক, সরকারের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে আমরা কারখানার চাকরে পরিণত হবো। আমাদের সম্মতি পাওয়ার জন্য কেন জোরজুলুম করা হবে?" তিন মাস বাদে, অক্টোবরে, জেলা শাসক পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য গণশুনানি আহ্বান করেন। গ্রামে না করে ২০ কিমি দূরে সেই সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১১]

৬

রাষ্ট্রের একটা যুক্তি আছে। রাষ্ট্র বলে যে, এ দেশের বন-জঙ্গল, নদী-নালা-খাল-বিল, মাটির নীচের সম্পদ— এ সবের উপর রাষ্ট্র ছাড়া আর কারোর কোন অধিকার নেই। রাষ্ট্র চালায় সরকার। সুতরাং, এইসব জমি কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা ঠিক করবে একমাত্র সরকার। কিন্তু কৃষক যদি বলে যে, তার জমি কীভাবে ব্যবহৃত হবে, তা কৃষকই ঠিক করবে, তখন তো সে যুক্তি মানা হয় না।

আইন অনুযায়ী সরকার জনগণের সম্পত্তির রক্ষক বা জিম্মাদার। সরকারকে বলা যেতে পারে জনগণের সম্পত্তির অছি (Trustee)। উপভোক্তাদের (beneficiary) সম্মতি ব্যতীত অছি-সম্পত্তির ব্যবহারবিধি পাল্টানো যায়না। 'উড়িষ্যা সরকার বনাম পরিবেশ ও বন মন্ত্রক' সংক্রান্ত বিখ্যাত নিয়মগিরি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিল, "বনাধিকার আইন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, খনি অথবা সরকারি বনাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ খনিজের উপর, সরকারের অধিকার কেড়ে নেয়নি কিংবা হস্তক্ষেপও করেনি। সরকার জনগণের অছি হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদের দখলদার।" (State holds the natural resources as a trustee for the people)। কিন্তু রাষ্ট্র তার এই দায় স্বীকার করেনা। রাষ্ট্র মনে করে, সে এই সমুদয় সম্পত্তির রক্ষাকর্তা ঠিকই, তবে সেটা মালিক হিসাবে, জিম্মাদার হিসাবে নয়। মালিকি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে এই বিপুল সম্পত্তি হস্তান্তর করতে অসুবিধা। বিশেষত কর্পোরেট সংস্থাগুলির লোলুপ দৃষ্টি যখন একবার এই সম্পদের উপর পতিত হয়েছে, রাষ্ট্র তাদের বিমুখ করবে কোন সাহসে।

এখন আর একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইনগুলিতে যে সমস্ত জমি সরকারে খাস করা হয়েছিল, সেই সমস্ত জমি কৃষিজীবীদের মধ্যে বিলিবণ্টন না করে, বড়ো পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র কৃষকের জমি যথেচ্ছ দখল করার ক্ষমতা কর্পোরেট সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এইসব কাজগুলো করার জন্য আইনটাকেই বদলে ফেলা হচ্ছে। ভূমি সংস্কার আইনগুলি প্রণীত হয়েছিল উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের জন্য। সেই অগ্রাধিকারটা বদলে

এরপর ৯৭ পৃষ্ঠায়

মানুষের বন : বনের মানুষ

সুমন গোস্বামী

এক

সভ্য ও বন্য। বহু প্রাচীনকাল থেকেই তথাকথিত সভ্য জগতে এরা বিপরীতার্থক দ্যোতনার প্রকাশক। মহাভারত বা রামায়ণের ছত্রে ছত্রে দেখা যায় রাক্ষস, দস্যু, নিষাদ, কিরাতদের অত্যাচারে নাকি সরল ধর্মপ্রাণ মুনি ঋষিদের জীবন ওষ্ঠাগত। তারপর কোনও এক রাম, ভীম বা অর্জুনের দ্বারা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। এমনটাই লিপিবদ্ধ হত। এমনটাই লেখা হয়ে থাকে। এইসব রাক্ষস বা দানবরা থাকত জঙ্গলে। ওটাই তাদের নিজস্ব আবাসভূমি। আশ্চর্য কি, অনাদিকালের এই একপাক্ষিক প্রচারে প্রতিটি শহুরে মানুষ ছোট থেকে বড়ো হবে এই সুপ্ত জ্ঞান নিয়ে যে জঙ্গলের মানুষরা ঠিক সভ্য নয়। রাক্ষস-টাক্ষস না হোক, ওদেরকে সভ্য করার মহান দায়িত্বটা নাগরিক মানুষের কাঁধে।

'সভ্য' মানুষদের এই ধারণাটায় কড়া নাড়া দিয়েছিলেন মর্গান। ১৮৭৭এর বিখ্যাত *এনসিয়েন্ট সোসাইটি* সহ তাঁর অন্যান্য রচনাগুলিতে তিনি বনবাসী বা তথাকথিত 'বর্বর' দের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনাচরণ এবং উন্নততর সমাজব্যবস্থার কথা জানান। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৯ পর্যন্ত তথাকথিত বর্বর আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কাটাবার পর ক্যাটলিন বলেছিলেন, ''আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি, ওদেরকে নৈতিকতা ও সদ্‌গুণ শেখানোর দায় সভ্য দুনিয়াকে নিতে হবে না।'' মর্গানের লেখাপত্রেও আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাই সভ্য দুনিয়ার বাইরের এই জগতের মহানতার। যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে প্রায় কিছুই নেই, সবটাই গোষ্ঠীর বা সমাজের। শিকার করে সবাই, খায় সবাই। ভারতেও চমৎকার সমবায়িকার অবস্থান ছিল। আলেকজান্ডার-এর সেনাপতি নিয়ারখুস-এর থেকে জানা যায় খ্রিস্ট-পূর্ব ৪র্থ শতকে ভারতে বেশ কিছু গোষ্ঠী ছিল, যাঁদের ব্যক্তিগত জমি বলে কিছু ছিল না। গোষ্ঠীর জমি চাষ করতেন সবাই মিলে। ফসল ভাগ হত সবার মধ্যে। এই মানুষরাই কিন্তু আদিম বন্য মানুষ মহাভারত-রামায়ণের রাক্ষস-টাক্ষস।

মানব সভ্যতার শুরুটাই হয়েছিল জঙ্গলের সঙ্গে সখ্য পাতিয়ে। বনবাসী মানুষের কাছে বন মানে অনেক কিছু। বন মানে খাদ্য। জঙ্গলের ফল-মূল-কন্দ ঘেঁটে খাদ্যবস্তু তারা আবিষ্কার করেছিলেন এবং বাকি জগতকে শিখিয়েছিলেন কোনটা খাওয়া উচিত কোনটা নয়। এই মানুষেরাই প্রথম জঙ্গলের কাঠ থেকে ঘর-বাড়ি-আসবাব-এর কৌশল শিখেছিলেন। অরণ্যের গাছের পাতা, ছাল বা বল্কল হতো পরিধেয়। লজ্জা নিবারণ করত, প্রচণ্ড শীতে জীবন রক্ষা করত। প্রতিটি গোষ্ঠীর মানুষ পরম্পরাগতভাবে তৈরি করেছিলেন ওষধি বৃক্ষের জ্ঞানের এক সুবিশাল ভাণ্ডার। এই প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতিই বনবাসী মানুষকে রোগ-ভোগ থেকে রক্ষা করত। জঙ্গলের শিশুরা যেহেতু জঙ্গলেই বেড়ে ওঠে, তাই ক্রীড়া সরঞ্জামও যোগাত জঙ্গলই। একথায় অরণ্যের মানুষকে অরণ্য থেকে সরানোর অর্থ জীবনের অধিকার কেড়ে নেওয়া। কিন্তু সেই কাজটাই শুরু হয় 'সভ্যতা'র বাড়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। রাজা বা সামন্তপ্রভুরা কর্তৃত্বের সীমা বাড়ানোর জন্য বনভূমিগুলো দখল করত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বনবাসীদের সরে যেত হত। কখনও বা কিছু করদান করে থেকে যাবার অনুমতি মিলত। মাঝে মধ্যে অর্জুন-টর্জুনরা ফূর্তি করতে এলে হুজ্জতির একশেষ। 'রাক্ষস' নামধারী বনবাসীদের বধ করে রাজকুমাররা কীর্তিমান হত।

নগর সভ্যতার বৃদ্ধি ও ক্রমাগত জনসংখ্যার চাপ এরপর বনবাসীদের আরও কোণঠাসা করেছে। ক্রমবর্ধমান কৃষিজমির চাহিদা এবং সামন্তপ্রভুদের শক্তিবৃদ্ধির ইচ্ছা— যুগপৎ চাপ পড়ে বনবাসীদের ওপর। শুরু হয় রাজ-আদেশে বন কেটে কৃষিকাজ এবং বসতি স্থাপন। বনবাসীরা সরে যেতে থাকেন আরও প্রান্তসীমায়। যে বন এবং বনসংলগ্ন ভূমি ছিল গোষ্ঠী সম্পত্তি— তাতে কায়েম হয় ব্যক্তি অধিকার। ইউরোপ খাসা একখানা স্লোগান হয়েছিল— 'যে জমির মালিক নেই, সে জমি অভিজাতদের' (Pas de terre sans seigneur)। বস্তুত গুছিয়ে বনভূমি দখলের কাজটা ইউরোপে শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। কার্ল মার্কস-এর *দাস ক্যাপিটাল*-এর ২৭নং অনুচ্ছেদটিতে স্কটিশ ও ইংরেজ জমিদারদের সেইসব কুকীর্তির বর্ণনা আছে। শক্তিমান জমিদার বা ল্যান্ডলর্ডরা ইচ্ছেমত বনভূমি দখল নিত। বেড়া দিত। ওই জঙ্গলে শিকার, মাছধরা বা কাঠকাটা, ফলমূল সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ করত। ফলত একেবারে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছিলেন বনবাসী ও বননির্ভরশীল মানুষেরা। স্বভাবতই জন্ম নেয় প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ। ফ্রান্সের বিখ্যাত জ্যাকেরিজ (Jacqueries) বা কৃষক বিদ্রোহের কারণও এটাই। কিছু কিছু জায়গায় সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে বনবাসী মানুষ তাদের অধিকার কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

ভারত বা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে বনবাসী ও বননির্ভরশীল মানুষের ওপর আসল আঘাতটি হানে ঔপনিবেশিকরা। ব্রিটিশের হাতে জঙ্গলের কাঠ যেদিন থেকে বিক্রয়যোগ্য ও মুনাফাদায়ী সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল—

সেদিন থেকেই চূড়ান্ত দুর্দিনের শুরু বনবাসী ও বননির্ভরশীল মানুষের। জঙ্গল নামক গোষ্ঠীসম্পদ তার অর্ধেক পরিচিতি খুইয়েছিল আগেই। এবার রীতিমতো কোমর বেঁধে, হিসেব কষে গোটাটাকেই আত্মসাৎ করা হল। জঙ্গলে বসবাস করাটাই হয়ে উঠল বে-আইনি।

দুই

গোটা দুনিয়ায় বন-সংরক্ষণ ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল আসলে জঙ্গল ব্যবসার কারণে। যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়ছিল কাঠের। বিশাল সমস্ত প্রাসাদ বানাতেও তো প্রচুর কাঠ লাগে। তার ওপর রেলগাড়ি, জাহাজ ও কাগজ— এই তিনের ব্যবহার বৃদ্ধিতে কাঠের চাহিদা তুঙ্গে পৌঁছল। কাঠ আসবে কোত্থেকে? কেন, জঙ্গল থেকে ! ফলত জঙ্গলের গাছ— যা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নির্ভরশীল মানুষের নিত্য আবশ্যক বস্তু— তা হয়ে দাঁড়াল শিল্পের কাঁচামাল, এবং অনিবার্যভাবেই— মুনাফাদায়ী বস্তু। অতএব শুরু হলো জঙ্গলের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নামে প্রকৃতি ব্যবসা। যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে জঙ্গলে থাকতেন, সেইসব আদিবাসী ও বননির্ভরশীল মানুষের কাঠ কাটা নিষিদ্ধ হলো। নিষিদ্ধ হলো বনে আগুন লাগানো, ঝুম চাষ ইত্যাদি। জঙ্গলের ওষধিগুণ সমৃদ্ধ উদ্ভিদ— সে-ও তো ব্যবসার বস্তু! অতএব লাগাও তাতেও তালা।

এক ধাক্কায় অরণ্যবাসী মানুষকে এভাবে অবৈধ নাগরিক বানিয়ে দেওয়াটা অরণ্যবাসীরা ভালো মনে নেননি অবশ্যই। সাধ্যমতো তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন। লড়াই করেছেন। সিধু-কানুর হুল, বীরসার উলগুলান বা সর্দার-মুলকি বিদ্রোহ এসবেরই ফসল। আমরা জানি, প্রতিটি বিদ্রোহই দমন করা হয় নির্মমভাবে। তবে এসবের ফলে ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য কিছু কিছু অধিকার অর্জন করেছিলেন লড়াকু আদিবাসীরা। যেমন সর্দার-মুলকি বিদ্রোহের ফলে অর্জিত হয়েছিল ছোটনাগপুর অঞ্চলের জন্য ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট। তবে সাধারণ ভাবে বনবাসী মানুষেরা হয়ে পড়েন নিজভূমে পরবাসী।

সেই ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতাই পরবর্তীকালে স্বাধীন দেশেও প্রবাহিত হতে থাকে। জঙ্গল ব্যবসায়ের জন্য সৃষ্ট যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা বনবিভাগ— তারাই হয়ে ওঠে সমান্তরাল প্রশাসন। একের পর আইন চাপিয়ে অরণ্যবাসী মানুষের বেঁচে থাকাটাই অবৈধ করে ফেলা হয়। এর আগে জমিদার বা রাজপুত্ররা মারত একবার। তারপর বেশ কিছুদিনের বিশ্রাম পাওয়া যেত। কিন্তু এই সময়ে জন্মটাই মৃত্যুর থেকেও ভীষণ। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার ১৯৫২ সালে ঘোষণা করে নতুন বননীতি। এখানেই সরকারিভাবে অরণ্যচারী মানুষকে পুরোপুরি অবৈধ ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, সকল জঙ্গল সরকারের আর সরকারের (বনদপ্তরের) অনুমতি ছাড়া সেখানে বসবাস নিষিদ্ধ। ঔপনিবেশিকদের দেখানো পথেই আরও রমরমিয়ে ওঠে জঙ্গল ব্যবসা। জঙ্গলের সব গাছের কাঠ তো আর বাজারে সমান দামি নয়। অতএব ফালতু গাছ হঠাও— সেইসব গাছ লাগাও, যার কাঠ বাজারে ভালো দামে বেচা যায়। সুতরাং ধ্বসে পড়ল আদিম প্রাকৃতিক অরণ্য, দাঁড়িয়ে গেল শাল, সেগুন, ধূপী, ইউক্যালিপটাস, বাঁশের মুনাফাদায়ী আর্থিক অরণ্য। এই নয়া আক্রমণ অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, কারণ এতে অরণ্যের চরিত্রটাই গেল বদলে। শাল বা সেগুন গাছের নীচে জঙ্গলের স্বাভাবিক ঝোপঝাড় সেভাবে জন্মায় না। ঝোপঝাড় না থাকলে থাকবে না ছোটখাটো পোকা-মাকড় এবং ওইসব ছোট গাছ যাদের খাদ্য, সেইসব প্রাণী। পোকা-মাকড়ের ঘাটতি আবার পাখিদের খাদ্যভাণ্ডারে টান ফেলল। এককথায় গোটা অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যই বিপর্যস্ত হল। (আজকের দিনের পরিবেশপ্রেমীরা কিন্তু ভুলেও এসব বলে না!) সরকারি হিসেবেই ১৯৫২ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টর প্রাকৃতিক অরণ্য সাফ করে লাভজনক বৃক্ষের অরণ্য গড়ে তোলা হয়। প্রাকৃতিক জঙ্গল বননির্ভরশীল মানুষদের খাদ্য ও ওষধি যোগাত। সে-ও বন্ধ হবার উপক্রম। প্রাকৃতিক জঙ্গলকে এভাবে নির্বিচারে খতম করার বিরুদ্ধে ছোটবড় বেশ কিছু আন্দোলন হয়েছে স্থানীয় স্তরে। এদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত হল চিপকো আন্দোলন।

মজা হলো, অরণ্য দখল করার জন্য যাদের বেঘর করা হয়েছিল, নতুন অরণ্য সৃষ্টি ও তার রক্ষণাবেক্ষণের কষ্টকর কাজের দায়িত্বও পেলেন তাঁরাই। বনবাসী মানুষকে বাধ্য করা হলো প্রাকৃতিক অরণ্য সাফাই করে অর্থকরী গাছের বীজ বপন করতে এবং তার দেখভাল করতে। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বনবাসীরা যে অত্যাচার সয়েছেন, তা পূর্বেকার সমস্ত অত্যাচারকে ছাপিয়ে গেছে। কথায় কথায় চাবুক তো জলভাত, গুলিও চলত। দাসশ্রমিক হিসেবে বিনে পয়সায় শ্রমদান করতে হতো। তারপরেও কলাটা-মূলাটা বা একমাত্র মুরগিটা হতো বনবাবুদের সম্পত্তি।

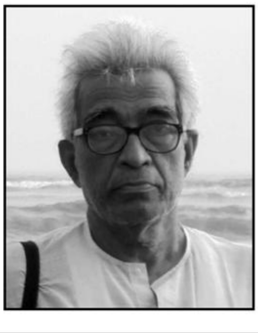
বিংশ শতকের শেষভাগে শখের পরিবেশপ্রেমীদের উৎপাতে অরণ্যবাসীদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল আরও করুণ। বিভিন্ন অংশের চাপে এমন সমস্ত আইন ও বিধির সৃষ্টি হলো যে অরণ্যবাসী ও বননির্ভরশীল মানুষের অরণ্যে থাকাটাই হয়ে উঠল অসম্ভব এবং একই সঙ্গে বাইরের জগতের কাছে তাদের পরিচিতি হলো অরণ্য সাবাড়কারী, প্রাণীহত্যাকারী, পরিবেশ ধ্বংসকারী হিসেবে। কী চমৎকার মিল! বৈদিক যুগে এঁরা ছিলেন রাক্ষস, অর্থাৎ বেদ-বিরোধী, মুনি-ঋষি বিরোধী। কালক্রমে তাঁদের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় মানুষখেকো হিসেবে। ইন্টারনেটের সভ্য দুনিয়া আবার বনবাসী মানুষের মধ্যে নতুন রাক্ষস আবিষ্কার করল। এঁরা বনধ্বংসকারী পরিবেশ-বিনষ্টকারী।

পরিবেশ বিষয়ক হই-চই শুরু হবার পর তথাকথিক বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার জন্য প্রচুর টাকাও আসতে থাকে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে। বাঘ, কুমীর বা পাঙ্গোলিন বাঁচানোর ওইসব টাকা আবার নতুন এক কায়েমি স্বার্থ তৈরি করে। বন হয়ে দাঁড়ায় সীমাহীন অর্থপ্রাচুর্যের মৃগয়াভূমি। তবে তার জন্য ওই 'প্রাক্তন রাক্ষস'দের তাড়িয়ে দেওয়াটা জরুরি। এর সঙ্গে পুরনো শতাব্দীর একেবারে শেষে এবং নতুন শতাব্দীর গোড়ায় শুরু হয় কর্পোরেট উৎপাত। মধ্য ভারতের বিশাল বনভূমি খনিজ সম্পদে ভরপুর। যার ওপর চোখ পড়ে বিভিন্ন খনিজ ব্যবসায়ীর। শুরু হয় আরও এক উচ্ছেদের গল্প। এই কাহিনীটা অবশ্য একেবারে সাম্প্রতিক, এবং এর সঙ্গে মাওবাদী আন্দোলনের নিবিড় যোগ থাকায় অপেক্ষাকৃত বেশি প্রচার পেয়েছে।

তিন

আমরা দেখলাম, অরণ্যের ইতিহাস অরণ্যবাসীর ইতিহাস আসলে সীমাহীন অধিকার ভঙ্গের ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক রক্তাক্ত করুণ ইতিহাস। পাশাপাশি এটা বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না যে, অধিকার আন্দোলনের অগ্রবর্তী সৈনিকদের কাছে বনবাসীদের অধিকার-এর সংগ্রাম কখনওই খুব একটা প্রাধান্য পায়নি। মূলধারার রাজনীতির কাছে তো এই মানুষগুলো স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাত্য। বনের মানুষের অধিকার বা বনবাসীদের নিয়ে সংগ্রাম আন্দোলন সাম্প্রতিক সময়ে সশস্ত্র উপায়ে যা হয়েছে, তার একটা বড়ো ভাগের হকদার অবশ্যই সিপিআই(মাওবাদী) দল। সশস্ত্র পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য তাঁদের সংগ্রামের কেন্দ্র যেহেতু ওই বনভূমি অঞ্চল, সেহেতু কর্পোরেট হাউসের আক্রমণ সামলাতে হয়েছে তাঁদেরই। নির্বিচার কর্পোরেটীয় উচ্ছেদের হাত থেকে কিছু ক্ষেত্রে হলেও রক্ষা পেয়েছেন বনবাসী আদিবাসীরা। যদিও এছাড়াও আরও কিছু সংগঠন বনের মানুষকে নিয়ে, তাঁদের অধিকার নিয়ে লড়াই করছেন, আন্দোলন করছেন। বন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করা বেশ কিছু সংগঠন মিলে ১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ফোরাম ফর ফরেস্ট পিপল অ্যান্ড ফরেস্ট ওয়ার্কার্স গঠন করেন। বনবাসীদের অধিকার আন্দোলনে এদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন একটি আইন জারি করেন। নানা দিক থেকে যা ঐতিহাসিক। আইনটির নাম 'The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006'। এই আইনের গোড়াতে স্বীকার করা হয়েছে, এতদিনে পর্যন্ত বনবাসী মানুষের ওপর ঐতিহাসিক অন্যায় (Historical Injustice) হয়েছে। এই আইনে অন্তত কাগজে-কলমে বনের ওপর বনবাসীদের অধিকারকে মেনে নেওয়া হয়েছে। বনবাসী ও বননির্ভরশীল মানুষকে কৃষিজমির অধিকার দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে নন-টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট অর্থাৎ কাঠ ব্যতীত অন্যান্য বনজ উপাদান ব্যবহারের অধিকার। আরও গুরুত্বপূর্ণ, বন ও পরিবেশ রক্ষা যে কেবল বনবাসীদের হাতেই সম্ভব, তা অন্তত কাগজে-কলমে মেনে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বনবাসীদের ওপর যে দীর্ঘকালীন পরিবেশ ধ্বংসকারী অপবাদ লাগানো হয়েছিল, তার বিরোধিতা রাষ্ট্র এবার নিজেই করছে। এই আইনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গোষ্ঠী বা সামুদায়িক অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া। সামুদায়িক অরণ্যের মালিক এখন থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বননির্ভরশীল মানুষ, অন্তত আইন তা-ই বলছে। যদ্যপি, ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা জানেন, আইনটির কণামাত্রও প্রয়োগ হচ্ছে না। আইনমাফিক গ্রামসভা বানিয়ে বনগ্রামবাসীরা তাঁদের হক চাইছেন, কিন্তু বদলে তাঁদের গলায় মামলার মালা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অতএব, আইনগত স্বীকৃতিতেই পথের শেষ নয়। বনবাসী মানুষকে আইনের প্রয়োগের জন্য আবার একটি অধিকারের সংগ্রাম চালাতে হবে।



দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণ

দীপংকর চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা

বক্তা : আনু মুহম্মদ, স্থান : ভারত সভা হল

বিষয়

দক্ষিণ এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ

১লা মার্চ, শনিবার ২০১৪, বিকেল ৪টা

ভারত, শ্রীলংকা এবং যুদ্ধাপরাধের দায়বদ্ধতা

ভারতের মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি কী করতে পারে?

ডঃ ভি সুরেশ

২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে, তামিল টাইগার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শ্রীলংকা সেনাবাহিনীর যুদ্ধের শেষ দিকে, শ্রীলংকা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত করার গুরুতর অভিযোগ ছিল। ১৯১২ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পর্ষদ শ্রীলংকা সরকারকে প্রথমবার সে সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে বলে। কত মানুষ নিহত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সংখ্যা পরিবেশিত না হলেও, আন্দাজ ৪০ হাজার থেকে ১ লক্ষের মতো নিরস্ত্র তামিল নাগরিক যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে নিহত হয়েছিল। শ্রীলংকা সরকার গঠিত ''লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং সামঞ্জস্য বিধান কমিশন''-এ (Lesson Learnt and Reconciliation Commission) মান্নারের বিশপ সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে উত্তর ও পূর্ব শ্রীলংকায় ১ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি তামিল জনগণের বসবাস ছিল— তাদের কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছেনা এবং সম্ভবত শ্রীলংকা সৈন্যবাহিনী ও এলটিটিই/ তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে তাদের মৃত্যু ঘটেছে।

সকল শ্রীলংকাবাসীর প্রতি ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতা, দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে নিশ্চিত এবং বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণের যে প্রতিশ্রুতি শ্রীলংকা রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পর্ষদকে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি তারা মান্য করছে কিনা, তা পর্ষদ ২০১৪ সালের মার্চ মাসে তৃতীয়বার পরীক্ষা করবে। এটা একটা রেকর্ড। ২০১৩ সালে শ্রীলংকা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পর্ষদের হাইকমিশনার শ্রীমতী নাভি পিল্লাইকেও বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

বিষয়টা কী?

তামিলদের নিজস্ব রাষ্ট্র ইলম প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জনের জন্য বিগত ৩০ বছর ধরে, উত্তর ও পূর্ব শ্রীলংকার তামিল গোষ্ঠীগুলি এবং শ্রীলংকা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তীব্র যুদ্ধ চলছে। ২০০৯-এর ১৮ মে, এলটিটিই নেতা প্রভাকরণ মুল্লাতিভু-র একফালি জায়গা নন্দীকাদালে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক নিহত হওয়ার সাথে সাথে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। শ্রীলংকার পূর্ব উপকূলবর্তী, ২ কিমি লম্বা এবং আধ কিমি চওড়া, সংকীর্ণ এক স্থানে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার তামিলকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। শ্রীলংকা সৈন্যবাহিনী ভারী কামানের গোলা, মর্টার এবং গোলাগুলি বর্ষণ করে নির্মম আক্রমণ শুরু করে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে পরবর্তী ৩/৪ মাসে এই গোলাগুলি বর্ষণে এবং তার সাথে সরকারের তরফে জল, খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি বুনিয়াদি চাহিদাগুলির ইচ্ছাকৃত প্রত্যাখানের ফলে কয়েক হাজার তামিল নাগরিকের মৃত্যু হয়।

গোঁড়া দক্ষিণপন্থী সিংহলী নেতা প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষের তত্ত্বাবধানে শ্রীলংকা সরকার ২০০৬ সালে, চতুর্থ ইলম-যুদ্ধ শুরু করে। তামিল নাগরিকদের গৃহহীন করতে এবং হাজার হাজার অন্তর্দেশীয় উচ্ছিন্ন মানুষের (internally displaced persons) দল ভারী করতে, ২০০৭-এর জুলাই থেকে মান্নার এবং জাফনা অঞ্চলে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হতে থাকে। ২০০৮-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০০৯-এর মার্চ-এর মধ্যে এলটিটিই-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ তুঙ্গে ওঠে এবং ক্রমশ স্থানীয় তামিলদের গ্রাস করে। ২০০৯ সালের মে মাসের ৪/৫ মাস আগে লক্ষাধিক তামিল অধিবাসীকে শ্রীলংকা সেনাবাহিনী তুমুল গোলাবর্ষণ করে এবং তামিল এলাকায় যত্রতত্র অভিযান চালিয়ে, নিরাশ্রয় করে দেয়। শ্রীলংকা বিমানবাহিনী লিফলেট ছড়িয়ে সাধারণ নাগরিকদের 'নিরাপদ এলাকা' (No Fire Zone) চিহ্নিত হাসপাতালগুলির নিকটবর্তী অঞ্চলে সরে যেতে বলে। তাদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে এইসব এলাকায় বোমাবর্ষণ করা হবেনা। হাজারে হাজারে মানুষ এই প্রচারে আশ্বস্ত হয়ে 'নিরাপদ এলাকায়' ভিড় জমায়। কিন্তু 'নিরাপদ এলাকায়' জনসমাগম হওয়ার পর সেনাবাহিনীর ভারী গোলাবর্ষণে এবং বিমান থেকে সরাসরি বোমাবর্ষণে শতাধিক মানুষকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

এটা পরিষ্কার যে সরকারের উচ্চতম স্তর থেকে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মারফত, শ্রীলংকা সেনাবাহিনীকে গণহত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এই তামিল গণহত্যা যুদ্ধাপরাধের সামিল এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ। স্বাভাবিক কারণে শ্রীলংকা সরকার কোনো হতাহতের কথা অস্বীকার করে।

আশ্চর্যের কথা, আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত সমস্ত মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে এবং কোনো দায় না নিয়েই এক লক্ষের উপর নিরস্ত্র তামিল মানুষের গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চীন, রাশিয়া, পাকিস্থান এবং দুঃখজনকভাবে ভারত— এই দেশগুলির সমর্থনই শ্রীলংকা সরকারকে দায় এড়াতে সাহায্য করেছিল। এইসব কারণের ফলেই রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পর্ষদের প্রস্তাব ছিল অতি সাধারণ পর্যায়ের।

এমনকি যুদ্ধাপরাধের, মানবতাবিরোধী অপরাধের এবং

গণহত্যার অকাট্য প্রমাণগুলি যখন প্রকাশ্যে এল, তখনও ভারতের বিদেশ দপ্তরের বক্তব্য ছিল, এটা অন্য এক সার্বভৌম দেশের "অভ্যন্তরীণ বিষয়" এবং রাষ্ট্রসংঘের কোনো নির্দিষ্ট দেশভিত্তিক প্রস্তাব সমর্থন না করা ভারতের দীর্ঘদিনের নীতি। ভারতের সঙ্গে শ্রীলংকা সরকারের "সক্রিয় বোঝাপড়া" আছে যাতে শ্রীলংকা সরকার চটে গিয়ে চীনের দিকে ঢলে না পড়ে। তা হলে সেটা হবে ভারতের নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক নীতির পক্ষে বিপজ্জনক।

ভারত সরকারের অবস্থা সেই প্রবাদ বাক্যের উটের মতো! স্বাধীন, বিশ্বাসযোগ্য, নিরপেক্ষ, সর্বত্র সম্মানিত রাষ্ট্রসংঘ নিযুক্ত সংস্থা যুদ্ধাপরাধ সহ মানবাধিকার এবং মানবিক আইনগুলি লঙ্ঘনের পর্বতপ্রমাণ সাক্ষ্য কর্তৃক উপস্থাপন করেছে। তৎসত্ত্বেও বৈদেশিক নীতি বিশেষজ্ঞরা ভারতবাসীদের বোঝাতে চান যে শ্রীলংকা সরকার মাত্রাতিরিক্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করেনি।

২০১১ সালের মার্চ মাসে 'শ্রীলংকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের দায়বদ্ধতা নিরূপক বিশেষজ্ঞরা' (UN Secretary General's Panel on Experts on Accountability in Sri Lanka) সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এলটিটিই ও তামিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রসঙ্গে শ্রীলংকা সরকার যতই দাবি করুক, এটা আসলে 'নাগরিক ক্ষয়ক্ষতি বিহীন পন্থায় মানবিক উদ্ধার কর্মসূচি', কিন্তু এমন প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে, যা প্রতিপন্ন হলে, আন্তর্জাতিক মানবিক ও মানবাধিকার আইনগুলি গুরুতর লঙ্ঘনের ব্যাপক ঘটনা প্রমাণিত হবে। এলটিটিই এবং শ্রীলংকা সরকার, উভয়পক্ষেরই যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের ঘটনাগুলি এই তথ্যসমূহে সন্নিবেশিত আছে।

বিশেষজ্ঞরা "শ্রীলংকা সরকার দ্বারা সংঘটিত (আইন) লঙ্ঘনের সম্ভাবনাপূর্ণ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেন। ক) ব্যাপক গোলাবর্ষণের ফলে নাগরিক হত্যা, খ) হাসপাতাল এবং মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে গোলাবর্ষণ, গ) মানবিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান, ঘ) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বেঁচে যাওয়া মানুষজনের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘন, ঙ) যুদ্ধাঞ্চল বহির্ভূত ক্ষেত্রে, সংবাদমাধ্যম ও সরকারের সমালোচক সহ অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন।"

শ্রীলংকা সরকার Lesson Learnt and Reconciliation Commission (LLRC) গঠন করে। এই কমিটি ২০১১ সালের নভেম্বরে রিপোর্ট পেশ করে। কমিশনের ৮ সদস্যের সর্বসম্মত রিপোর্টে সরকারকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ-মুক্ত করা হলেও ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার প্রভূত ঘটনার, উত্তর ও পূর্ব শ্রীলংকায় জীবিত তামিলদের নিরাপত্তার অবনতি, যুদ্ধ পরবর্তী কালে মে ২০০৯ থেকে প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষকে রিপোর্ট প্রদানের সময় পর্যন্ত বিরাজমান অরাজকতার এক ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেন। ২০১২ সালের মার্চে, রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন এলএলআরসি-র রিপোর্টের সারাৎসার করে বলে "বিচার বহির্ভূত হত্যা এবং সংঘটিত অন্তর্ধান (enforced disappearances) বিষয়ে ব্যাপক অভিযোগ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের প্রয়োজন আছে, শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলকে সামরিক বাহিনী মুক্ত করতে হবে, জমি বিবাদের সমাধান সম্পর্কে নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে, আটক রাখার নীতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে, পূর্বতন স্বাধীন নাগরিক সংস্থাগুলিকে আরো ক্ষমতা দিতে হবে, প্রদেশগুলিকে ক্ষমতা অর্পণের বিষয়ে রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হতে হবে, সকলের বাক-স্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে ও উৎসাহ দিতে হবে এবং আইন সংস্কার করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।"

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার একজন শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন বিচারপতি নাভি পিল্লাই, শ্রীলংকায় তামিলদের মানবাধিকার সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতির উপর এক রিপোর্ট রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনে দাখিল করেন। রিপোর্টে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, "আরও বেশি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া ও সর্বব্যাপী (inclusive) অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করার জন্য শ্রীলংকা সরকার সিভিল সোসাইটিকে নিয়োজিত করেনি।" পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করলেও এবং অন্তর্দেশীয় উচ্ছিন্ন মানুষের অধিকাংশের পুনর্বাসন সম্পন্ন হলেও "বিচার, সমন্বয় সাধন ও জীবিকা পুনরার্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ বাকি আছে।" মানবাধিকার লঙ্ঘনের আরো যে সব গুরুতর অভিযোগ এসেছে, সেগুলি অমীমাংসিত থেকে গেছে এবং আস্থা সঞ্চারের বিষয়টিতে নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার অভাব আছে। ইতোমধ্যে, বিগত বছরে সংঘটিত বিচার বহির্ভূত হত্যা, অপহরণ এবং সংঘটিত অন্তর্ধান সম্পর্কে ক্রমাগত যে রিপোর্ট আসছে, তা অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।"

রাষ্ট্রসংঘের সংস্থাগুলির রিপোর্ট থেকে প্রতিপন্ন হয়, বিষয়গুলির ক্ষেত্রে শ্রীলংকা সরকারের দায় গ্রহণের প্রতি বিরূপতা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে স্বাধীন তদন্তে তাদের অনীহা আছে। উত্তরের তামিল অঞ্চলগুলিতে ক্রমান্বয় সামরিকীকরণ ও সামরিক দখলদারির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সিংহলীকরণ। দক্ষিণ থেকে সিংহলী পরিবারগুলিকে প্রতিস্থাপন চালিয়ে যাওয়ার ফলে তামিল অধ্যুষিত এলাকাগুলির সামাজিক জনবিন্যাসে পরিবর্তনের এক প্রক্রিয়াও চলমান। তার সঙ্গে চলছে রাস্তা,

গ্রাম ও সর্বসাধারণের এলাকাগুলিতে তামিল নামগুলির পুনঃনামকরণ। ক্রমাগত ঘটমান বিচার বহির্ভূত হত্যা, অপহরণ এবং সংঘটিত অন্তর্ধান আইনের শাসনকে উপহাসে পরিণত করেছে এবং সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা বলবৎ করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিচারবিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পুরোপুরি ব্যর্থ।

এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইনগুলি লঙ্ঘনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বাধীন তদন্ত দাবি করার মাধ্যমেই একমাত্র গণহত্যা সম্বন্ধীয় সত্য উদ্ঘাটন হতে পারে। এটাকে কখনোই অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলা যায়না। ভারতের কূটনীতিবিদরা ২০০৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'রক্ষা করার অধিকার' (Right to Protect) নীতির কথা সুবিধামতো ভুলে গেছেন। যে সমস্ত ক্ষেত্রে মানবাধিকার নিদারুণ ভাবে লঙ্ঘিত, সেক্ষেত্রে সেই দেশের নাগরিকদের 'রক্ষা করার অধিকার' রাষ্ট্রগুলির 'সার্বভৌমত্বের দাবি'-কে প্রশমিত করে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রশ্রয় বা যোগসাজস থাকুক বা না থাকুক, এইরকম ঘটনা ঘটলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে।

১৮ মে ২০০৯ ইলম যুদ্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ বছর পরেও, শ্রীলংকায় তামিলদের অবস্থা আগের মতোই ভয়ংকর ও বিপজ্জনক। উত্তর ও পূর্ব শ্রীলংকার পুরোটাই প্রচণ্ডভাবে সামরিক নিয়ন্ত্রণে। সরকারি প্রশাসন, অর্থনীতি, জমি, সবকিছুই দেখভাল করছে সামরিক প্রশাসন। দক্ষিণাঞ্চল থেকে সিংহলীদের এনে তাদের বসতি স্থাপন করে এবং তামিল গ্রামগুলিতে তাদের জমি-জিরেত দিয়ে, পরিকল্পিত এবং সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়ায় উত্তর শ্রীলংকার সামাজিক ভূগোল পরিবর্তন করা হচ্ছে। ২০০৯ সালে প্রায় শূন্য থেকে উত্তর শ্রীলংকায় সিংহলী জনসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৩০/৪০ শতাংশের কাছাকাছি। তামিল নামাঙ্কিত রাস্তাগুলি সিংহলী নামকরণ করা হয়েছে। তামিল যুবকরা এখনও নিখোঁজ হচ্ছে। তামিল অঞ্চলগুলিতে, যেখানে ২০০৯ সালের যুদ্ধে অধিকাংশ পুরুষ নিহত হয়েছিল, সেখানে হাজার হাজার সিংহলী সেনার উপস্থিতিতে, তামিল মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতন নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। তাদের জীবন এখন অনিশ্চয়তা এবং নিষ্ফল ক্রোধে পরিপূর্ণ।

মনমোহন সিং সরকার, তামিলদের উপর শ্রীলংকা সরকারের চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় আদৌ চিন্তিত নয়। তামিলনাড়ুতে নির্বাচনী বাধ্যবাধকতার কারণে সিংহলী সংখ্যাগুরু সরকারকে খোলাখুলি সমর্থন জানায়নি। এ ব্যতীত ভারত সরকার এমন কিছুই করেনি যাতে শ্রীলংকা সরকার ২০০৯ সালে মে মাসে যুদ্ধান্ত পর্যন্ত এবং তারপর আশ্রয় শিবিরগুলিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে স্বাধীন, আন্তর্জাতিক তদন্তে মত দিতে বাধ্য হয়।

দেশের সংবাদপত্র এবং মানবাধিকার রক্ষার সংগঠনগুলি যদি যুদ্ধাপরাধ এবং মানবিকতা বিরোধী অপরাধের দায় নির্দিষ্ট করার দাবিতে ভারত সরকারকে আরো মাননীয় ও নীতিনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তবেই একমাত্র ভারত সরকারকে এই নির্লিপ্ত মনোভাব বদলের চাপ দেওয়া যাবে।

দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বৃহত্তর মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি শ্রীলংকার তামিল সমস্যা নিয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি। একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে শ্রীলংকার তামিলরা তামিলনাড়ুর তামিলদের থেকে উদ্ভূত এবং সেই কারণে তাদের পৃথক মাতৃভূমি ইলম-এর দাবি অসঙ্গত। সত্যটা একেবারেই ভিন্ন। উত্তর ও পূর্ব শ্রীলংকার জাফনা, ভাভুনিয়া এবং মান্নার অঞ্চলের তামিলরা ঐ অঞ্চলের মূল অধিবাসী, কেউই তামিলনাড়ু থেকে অভিবাসী নয়। আর একটা বিষয় আছে, যা তামিলনাড়ুর বাইরে হয়তো ততটা জানা নেই বা অতটা উপলব্ধি করেনা, তা হলো পঞ্চাশের দশক থেকে তামিলদের প্রতি বৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাস। সিংহলীকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, সরকারি কলেজ ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে তামিলদের চাকরি এবং শিক্ষার সুযোগ দিতে অস্বীকার— এ সবই বৈষম্যের উদাহরণ। সিংহলী দক্ষিণ-পন্থীদের দ্বারা তামিলরা যেমন নির্যাতিত হয়েছে, তেমনই সংখ্যাগুরু আধিপত্যাধীন পুলিশ, সেনাবাহিনী, প্রশাসন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপীড়নেরও শিকার হয়েছে।

২০০৮-০৯ সালে পিইউসিএল তামিল অঞ্চলে ব্যাপক যুদ্ধাপরাধের বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছে। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে, শ্রীলংকার সেনাবাহিনী পরিকল্পিত লক্ষাধিক তামিল জনসাধারণের হত্যার আশঙ্কা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। শ্রীলংকার তামিলদের সমস্যাটিকে দক্ষিণ এশিয়ার সকল জনসাধারণের সমস্যা হিসাবে দেখার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলির কাছে পিইউসিএল আবেদন জানিয়েছে এবং সেইমতো দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর মানবাধিকার রক্ষা গোষ্ঠীগুলির যৌথ এবং সমবেত কর্মসূচি দাবি করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে, রাজনীতি সচেতন সাধারণ বাঙালি জনগণ যাতে শ্রীলংকা তামিলদের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়, সেই উদ্দেশ্যে যে বন্ধুরা এই রচনাটি বাংলায় প্রকাশ করার কথা ভেবেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই।

লেখক পিইউসিএল-এর জাতীয় সাধারণ সম্পাদক

কোন অধিকারে?

সুচরিতা সেন

সম্প্রতি ভারত মার্কিন সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছে। কারণ কূটনৈতিক রেওয়াজ নিয়ে বিরোধ বা তারও অন্তরালে নৈতিক প্রশ্ন। ব্যাপারটা এই রকম। নিউইয়র্কের ভারতীয় ডেপুটি কনসাল দেবযানী খোবরাগড়ে দেশ থেকে একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে এনেছিলেন। এক মাদ্রাজি খৃস্টান সঙ্গীতা রিচার্ড। সঙ্গীতা মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করলো, তাকে ভুয়ো ভিসার ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনা হয়েছে। কাগজপত্রে যে পারিশ্রমিকের কথা লেখা আছে তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ তাকে বাস্তবে দেওয়া হয়। মার্কিন সরকার দেবযানীকে গ্রেপ্তার করে সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে সেলে রেখেছিল। তাঁর সঙ্গে করা হয়েছিল অত্যন্ত অপমানজনক ব্যবহার। শেষ পর্যন্ত বহিষ্কার করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ভারত সরকার তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া গোপন করেনি। ভারতে অবস্থিত মার্কিন কূটনীতিবিদদের উপর বদলা নেওয়ার কথা ভাবছে।

বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এক দলের মতে, মার্কিন সরকার দেবযানীর কূটনৈতিক নিরাপত্তা (diplomatic immunity) লঙ্ঘন করে অন্যায় করেছে। তাছাড়া দেবযানী এমন কিছু বড়ো অপরাধ করেনি যে তার সঙ্গে এতখানি দুর্ব্যবহার করতে হবে। অন্যরা দাবি করছে, জাল কাগজপত্রের সাহায্যে কারোকে সে দেশে আনা মার্কিন আইন অনুসারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ। সে ক্ষেত্রে কূটনীতিবিদদের বিশেষ অধিকার প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া সঙ্গীতার কথা ভাবা হবে না কেন? সেও তো ভারতীয় নাগরিক। সঙ্গীতা পাকাপাকি ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে চাইছে বলে এত কাণ্ড করেছে কিনা, সে প্রশ্নও উঠেছে। এমনকি ভারতে যা হয়, জাতপাতের বিষয়টি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দেবযানী জন্মসূত্রে দলিত। যে ছোট কিন্তু উল্লেখযোগ্য দলিত মধ্যশ্রেণী গড়ে উঠেছে, তার অন্তর্গত। এক্ষেত্রে তার ভূমিকা নির্যাতিতার না নির্যাতকের?

আমরা অন্য দিক দিয়ে বিষয়টিকে দেখতে পারি। আসল ব্যাপার যাই হোক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক উৎকর্ষ দাবি করার, নিজেকে অন্য দেশের উপরে তুলে ধরার কতখানি অধিকার আছে? ধরা যাক আইন মানার কথা। ধনীরা যত না আইন মানে, তার চেয়ে বেশি নিজেদের সুবিধা মতো প্রভাব খাটিয়ে আইন তৈরি করেছে। সেই কলোনিয়াল যুগ থেকে অর্থাৎ যখন আমেরিকা বৃটেনের কলোনি বা উপনিবেশ ছিল। প্রভাবশালী মানুষেরা সরকারের কাছ থেকে "উপহার" সূত্রে পেয়েছে অজস্র একর ভূমি। বিশাল রেলওয়ে ও ক্যানাল কোম্পানি এ ভাবেই গড়ে উঠেছে। নিজেদের গাঁটের পয়সা দিয়ে জমি কেনেনি। সেই সঙ্গে বিশাল অনুদান (subsidy)। বলা হয়, একটি মার্কিন কোম্পানি সরাসরি বিনিয়োগ করার বদলে সেই টাকা ঘুষ হিসাবে ছড়িয়ে দেয়। তাতে লাভ অনেক বেশি। Eminent domain নীতি অনুসারে সরকার যে কারোর জমি দখল করে হস্তান্তরিত করতে পারত। এ ভাবেই অসংখ্য আমেরিন্ডিয়ান বা নেটিভ আমেরিকান বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।

সাধারণ মানুষ যা করে আইনত শাস্তি পায়, বড়ো কোম্পানিদের বেলা পার পেয়ে যায়। যেমন ১৯৭৭ সালে Federal Energy Administration জানতে পারলো, Gulf Oil তার বিদেশি শাখাগুলি থেকে যে অপরিশোধিত তেল কিনেছিল, তার দাম ৭৯ মিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে বলেছিল। আর বাড়তি দাম আদায় করেছিল ভোক্তাদের (consumer) কাছ থেকে। পরের বছর ঘোষণা করা হলো, কোর্ট কেস এড়াবার জন্য Gulf Oil ৪২ মিলিয়ন ডলার ফেরত দেবে। এতে আর্থিক দিক থেকে অসুবিধা হবেনা। কারণ কোম্পানি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড জিন প্রশ্ন করেছিলেন, কোনো ব্যাঙ্ক ডাকাত যদি তার লুঠ করা টাকার অর্ধেক ফেরত দিত, তাকে কি ছেড়ে দেওয়া হতো?

মাছ পচে মাথা থেকে। হোয়াইট হাউসে অনেক অপরাধের বিচার বা শাস্তি হয়নি। অনেক কিছু যার তুলনায় দেবযানীর অপরাধ, যদি তা আদৌ অপরাধ হয়ে থাকে, কিছুই নয়। প্রেসিডেন্ট নিকসনের আমলের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি সুবিদিত। ভাইস প্রেসিডেন্ট ফোর্ড পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হয়ে নিক্সনকে ক্ষমা করে দিলেন। প্রেসিডেন্ট রেগানের আমলে ইরান কনট্রা কেলেঙ্কারি আরো জটিল। মধ্য আমেরিকার এক ছোট দেশ নিকারাগুয়াতে আশির দশকে বামপন্থী সান্দিনিস্তা সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। ভূমি সংস্কার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। মার্কিন সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এই প্রগতিশীল সরকারের পতন ঘটানো। দেশে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী কনট্রাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠানো হয়েছিল হামলা করতে। কিন্তু কনট্রাদের টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা ছিল। সে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের খুবই খারাপ সম্পর্ক চলছিল। ইরানকে অস্ত্র বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। রেগান (অথবা তার পরামর্শদাতারা, প্রাক্তন চিত্র তারকা প্রেসিডেন্ট নিজের বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন না) এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা করলেন। গোপনে ইরানকে অস্ত্র বেচে সেই টাকা কনট্রাদের সরবরাহ করলেন। বিষয়টি জানাজানি হলে রেগান রেওয়াজ মতো অস্বীকার করে পার পেয়ে গেলেন। অলিভার নর্থ ও

অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসাররাও গ্রেপ্তার হলেন না। কারাবাস করলেন না। নর্থও সরাসরি জানিয়ে দিলেন, তিনি প্রেসিডেন্টের আদেশে এক কোণে দাঁড়িয়ে ডিগবাজি খেতে পারেন। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য আইনের প্রতি নয়, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি। তাছাড়া বিচারে কেবল আইনের টেকনিকাল দিকটি তুলে ধরা হয়েছিল। একটি শান্তিপ্রিয় দেশের উপর খুনি কনট্রাদের লেলিয়ে দেওয়ার নৈতিক দিক নয়।

আইন নিয়ে নিজেদের সুবিধা মতো ছেলেখেলা মার্কিন শাসক শ্রেণীর পুরানো রেওয়াজ। যখন একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে আইন তৈরি হলো, শাসক শ্রেণী তা ব্যবহার করলো শ্রমিক সংগঠনের বিরুদ্ধে। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন নাকি বৃহত্তম মনোপলি। আইন অনেক সময়ে মার্কিন মুলুকে খুনের হাতিয়ার রূপে কাজ করেছে, যাকে বলে judicial murder, আইনসঙ্গত খুন। বিশেষভাবে শ্রমিক কর্মীদের প্রতিনিধিদের; কয়েকটি বিভিন্ন কালের উদাহরণ দেখা যাক। ১৯১৫ সালে খুনের মিথ্যা, অপ্রমাণিত অভিযোগে গুলি করে মারা হলো শ্রমিক নেতা ও জনপ্রিয় সঙ্গীতকার জো হিলকে। তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছিল এক বিখ্যাত গান-- "I dreamt I saw Joe Hill last night/ Alive as you or me/I said Joe, how can you are dead/I never died says he." অনুরূপ ভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল ইটালিয়ান বংশজাত অ্যানার্কিস্ট সাক্কো ও ভানজেট্টিকে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে শীতল যুদ্ধের যুগ। চরম কম্যুনিস্ট বিদ্বেষের যুগ। তরুণ দম্পতি জুলিয়াস ও এথেলে রোজেনবার্গকে চরম দণ্ড দেওয়া হলো পারমাণবিক তথ্য পাচারের অপ্রমাণিত অভিযোগে। কেবল তাই নয়, বিচারকের সাথে সরকারি কৌঁসুলির গোপন আঁতাতের কথা পরে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ সালে শিকাগোর শ্রমিক আন্দোলনের সময়ে মিটিং-এর মধ্যে বোমা ফেটেছিল। কে কে বোমা ফেলেছিল, তা আজও সঠিক জানা যায়নি। তবু সাতজন শ্রমিক নেতাকে প্রাণ দিতে হলো। এই ঘটনাই ঐতিহাসিক মে দিবসের উৎস।

১৯৭০ সালে আফ্রো-আমেরিকান নেত্রী এঞ্জেলা ডেভিস-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। তাঁর নামে রেজিস্টার করা একটি বন্দুক নাকি বন্দিমুক্তি প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত হয়েছিল। এঞ্জেলা কিছু দিন আত্মগোপনের পর ধরা পড়েন। সৌভাগ্যবশত তিনি বিচারে অব্যাহতি পান। আজও ষাট সত্তরের দশকের দুএকজন র‍্যাডিকাল 'ডেথ সেলে' আছেন চরম দণ্ডের অপেক্ষায়। অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে কেস বেশি জোরালো নয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রের পুলিশ ও সামরিক শক্তি র‍্যাডিকাল দলগুলির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল গুপ্তচর বা গুপ্ত ঘাতকের। মার্টিন লুথার কিং ও Malcolm X-এর হত্যাকাণ্ড আজও রহস্যাবৃত। তবে সন্দেহের আঙুল এক দিকেই ওঠে।

স্বদেশে মার্কিন আইন-প্রীতি লক্ষ্যণীয়। বিদেশেই বা তার আচরণ কেমন? ওয়াশিংটন ইরাক বা সিরিয়ার বিরুদ্ধে রাসায়নিক বা জীবাণু যুদ্ধের অভিযোগ এনেছে। কিন্তু সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে এক দল নেটিভ আমেরিকানকে বসন্ত রোগগ্রস্থদের কম্বল পাঠানো থেকে ভিয়েতনামে Agent Orange সহ সব রকম নীতিহীন যুদ্ধের উপায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তার মধ্যে মাদক দ্রব্যের চোরা চালানও বর্জনীয় নয়। যদিও মার্কিন সরকার মাদক-বিরোধী যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার নামে ল্যাটিন আমেরিকার বড়ো অংশের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। তার ইতিহাসও দীর্ঘকালীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপে, বিশেষত ফ্রান্স ও ইটালিতে, কমিউনিস্টরা অত্যন্ত জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তার বড়ো কারণ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে তাদের অনমনীয় সাহস ও নিষ্ঠা। ফরাসী ও ইটালিয়ান কমিউনিস্টরা, যুদ্ধোত্তর কালে যাকে সংসদীয় শান্তিপূর্ণ রাজনীতি বলা হয়, সেই পথই অনুসরণ করছিল। পার্লামেন্টে নির্বাচন, বৈধ সংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু সিআইএ মোটেই শান্তিপূর্ণ ও বৈধভাবে লড়াই করেনি। মার্সেই, কর্সিকা ও সিসিলির মাফিয়া দল ও গুন্ডাদের সাহায্যে ধর্মঘট ভেঙেছিল, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ধ্বংস করেছিল। কমিউনিস্টরা বিরোধীদের প্রচুর অর্থ দিয়েছিল। ট্রয়ের ঘোড়া হিসাবে আমদানি করেছিল মার্কিন সরকারপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন AFL (America's Federation of Labour) নামক সংগঠনকে। সর্বোপরি মাফিয়াদের মাদক এবং চোরাচালানের অবাধ অনুমতি ও সহায়তা দান করতো, বিশৃঙ্খলা ছড়াতে এবং কমিউনিস্ট বিরোধী যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতো। ভিয়েতনাম যুদ্ধের কালে মার্কিন বাহিনীর মধ্যে মাদক দ্রব্যের প্রচলন ছিল ব্যাপক। পৃথিবীর বহু স্থানে মাদক দ্রব্য চোরা চালানে সিআইএ-র হাত স্পষ্ট।

বীজাণু যুদ্ধেও মার্কিন সরকার পিছিয়ে নেই। কিউবাকে জব্দ করতে সিআইএ আফ্রিকার শূকরের অসুখ (swine fever) আমেরিকার মহাদেশে আমদানি করেছিল। কিউবার ফসল ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছিল। নিকারাগুয়াকে ব্লকেড করেছিল যা আন্তর্জাতিক আইন বিরুদ্ধ। অরো অনেক কিছু। না দেশে না বিদেশে আমরা মার্কিন সরকারের নিয়মনীতি প্রীতি দেখি।

তারপর যা আইনের বা নীতির সবচেয়ে বিপরীতে, সেই lynching। মানুষকে বিনা বিচারে গুলি করে বা পুড়িয়ে মারা, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া মার্কিন মুলুকে বহু দিন অবধি রেওয়াজ ছিল। যাকে Lynch Law বলা হয় তার সবচেয়ে বড়ো শিকার ছিল কৃষ্ণাঙ্গ বা আফ্রি-আমেরিকানরা। হিসেব করা হয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গড়ে প্রতি বছর শ'খানেক কৃষ্ণাঙ্গকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। ইভা কর্নেটি নামক আফ্রি-আমেরিকান নেত্রী ও অন্যান্যরা লিঞ্চিং বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কেবল

আফ্রো-আমেরিকানরা নয়, শ্রমিক, কর্মী ও বাম নেতাদেরও এমনই নৃশংস ভাবে হত্যা করা হতো। যেমন IWW (International Workers of the World), তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে, যথা ফ্রাঙ্ক লিটল বা এভারেটকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়াতেও বলশেভিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "লাল আতঙ্ক" ছড়িয়ে পড়েছিল। কমিউনিস্ট সন্দেহে যাকে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। এভারেটকে হত্যা করা হয়েছিল বীভৎস অত্যাচার ও অঙ্গহানির পর। একই সঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল কৃষ্ণাঙ্গ নিধন। ম্যাককেন আফ্রো-আমেরিকান কবি একটি বিখ্যাত কবিতা লিখলেন, যার সারমর্ম: "যদি মরতেই হয়, মেরে মরব।" বিশ্বমুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য ঘোষিত ভাবে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার ফল শুভ হয়নি।

যে সরকার এখন সঙ্গীতা রিচার্ডের পক্ষ নিচ্ছে, তারা যে বরাবর শ্রমিক-কর্মী দরদী ছিল এমন নয়। একেবারে গোড়ায় স্বাধীনতার পর পরই দেখা দিয়েছিল শেজ বিদ্রোহ। ছোট চাষি ও ভাগ চাষিদের অভ্যুত্থান। মার্কিন শিল্পায়নের ইতিহাস মসৃণ নয়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল যেখানে অপর্যাপ্ত জমি, সেখানে শ্রমিক মিলবে কী করে। স্বাধীন চাষি হতে পারলে কে আর কারখানার হুকুম-খাটা মজুর হতে চায়। বিশেষ করে মজুরি যেখানে রাজকীয় নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হবে এক কৃষি প্রধান দেশ। এমন কথা বলেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। প্রথম দিকে শিল্প মালিকেরা শ্রমের অভাব পূরণ করতে সচেষ্ট হলেন নানা উপায়ে যান্ত্রিকীকরণ, মজুরি বৃদ্ধি, নারী শিল্প শ্রমের ব্যবহার। তবে যখন "পুরানো পৃথিবী" থেকে মানুষের ঢল নামলো আর তাদের সবাইকে জমি দেওয়া হলো না, তখন শিল্পায়নের পক্ষে এ বাধা কেটে গেল। কিন্তু শ্রমিকদের কবজা করে রাখার কোনো পদ্ধতি মালিকরা বাদ দিলো না। রাষ্ট্রের ও অর্থনীতির সব ক্ষমতা এ ব্যাপারে কাজে লাগান হলো। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক। অনেক সময় টাকায় মজুরির বদলে শ্রমিক কর্মীদের দেওয়া হতো আমরা যাকে বলি 'ডিউ স্লিপ'। সেই স্লিপ দেখালে কোম্পানির বিশেষ দোকান থেকে মালপত্র দিত। এমন ভাবে হিসাব মেলানো হতো যে শ্রমিকরা বেশির ভাগ সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকতো। অথচ কিছু বলার ছিলনা। বাসস্থান অনেক সময় কোম্পানি সরবরাহ করতো। চাকরি গেলে বা শ্রমিক আন্দোলনের কাজে মালিকের মর্জিমতো মাথার উপর ছাদ থাকতো না। আন্দোলন বা দাবিদাওয়া নিয়ন্ত্রণের এ সব ছিল সহজ উপায়।

রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি সন্ত্রাসের মিলন অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক পেনসিলভানিয়া রাজ্যের কয়লা অঞ্চলে "মলি ম্যাকগুয়ের" নামে এক গোষ্ঠী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এদের অনেকেই ছিল আইরিশ বংশজাত। কোম্পানি তার বিপরীতে মোতায়েন করেছিল এক বিশেষ বাহিনী Coal and Iron Police। তাছাড়া ছিল Pinkerton নামে ডিটেকটিভ এজেন্সি। এই সংস্থার কাজই ছিল শ্রমিকদের শ্রমিকদের মধ্যে চর বৃদ্ধি করা ও আন্দোলন ভাঙা। এমনি এক গুপ্তচরের কার্যকলাপ 'মলি ম্যাকগুয়ের'-কে ভেঙে দিয়েছিল আর তারই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উনিশজন সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী ঐতিহাসিকরা এই সাক্ষ্যকে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। কনান ডয়েল ওই কাহিনী নিয়ে লিখেছেন The Valley of Fear। তাঁর সহানুভূতি অবশ্য কর্তৃপক্ষের দিকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ক্রমাগত আন্দোলন চলেছিল। দিনে আট ঘন্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন, শিকাগোর মে দিবস, বিভিন্ন রেল ধর্মঘট, Coxey-র বেকারদের মার্চ। ১৮৯২ সালে ধনপতি কার্নেগির সাম্রাজ্যে ধর্মঘট হলে কার্নেগির প্রতিনিধি ফ্রিক সন্ত্রাসী উপায়ে আন্দোলন ভেঙেছিলেন। সেই কোম্পানি বাহিনী, Pinkerton। নৈরাজ্যবাদী এমা গোল্ডম্যান ও আলেকজান্ডার বার্কম্যান প্রতিবাদে অবতীর্ণ হলেন। সশস্ত্র প্রতিবাদ। বার্কম্যান ফ্রিককে হত্যা করার চেষ্টা করলেন। সফল না হলেও খুনের প্রচেষ্টার অপরাধে আট বছর জেল খেটেছিলেন। এমা সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, নারীবাদ থেকে সমাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদ নিয়ে। ক্রমাগত পুলিশ বাধা দিত। মে ১৯০৯-এ এমার এগারোটি মিটিং পুলিশ ভেঙে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ গ্রহণ ও যুবকদের সেনাবাহিনীতে নেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সমাজবাদী নেতা ইউজেন ডেবস (Eugene Debs) ও অন্যান্যরা। এমা-র দুই বছর জেল হলো। তারপর তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সদ্যজাত সোভিয়েট ইউনিয়নে। এমা ও বার্কম্যান জন্মসূত্রে রুশ ছিলেন।

১৯১২-তে ম্যাসাচুসেটস-এর লয়েন্স অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলো টেক্সটাইল ধর্মঘট। তার পরের বছর কলোরাডো ধর্মঘট। ত্রিশের দশকে বিশ্বের বৃহত্তম মন্দার কালে শ্রমিক, কর্মী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র কৃষকদের আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। গাড়ি, ইস্পাত, রবার শিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্মঘট প্রায় যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। সাধারণ মানুষকে কিছুটা ছাড় না দিলে অবস্থা হাতের বাইরে চলে যেতে পারে, এই ভয়ে শাসক শ্রেণী কয়েকটি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল পদক্ষেপ নিল। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট "নিউ ডিল" নামক ব্যবস্থা প্রচলন করলেন। তার একটি দিক ছিল, ১৯৩৯ সালে Wagner Act-এর মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মীদের কিছু সাংগঠনিক অধিকার দেওয়া হলো। তৈরি হলো National Labour Relations Board।

শিশু শ্রম মার্কিন সমাজ ও অর্থনীতির অন্তর্গত অংশ ছিল বহুদিন পর্যন্ত। বিশেষত দক্ষিণ অঞ্চলে। দক্ষিণে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল উত্তরের তুলনায় দেরিতে। তুলনামূলক

সুবিধা বলতে দক্ষিণের ছিল সস্তা, অসংগঠিত শ্রম (দক্ষিণের অনেক জায়গায় ট্রেড ইউনিয়নকে মাথা গলাতে দেওয়া হতো না) আর তার অংশ হিসাবে শিশুশ্রম। এর বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করলে জবাব দেওয়া হতো ধর্ম আর শ্রেণীশক্তির ভাষায়। শিশুশ্রম নাকি ন্যায়সঙ্গত, ধর্মসঙ্গত। তাছাড়া কোনো ধরনের কাজকে নিষিদ্ধ করা মানে ''শ্রেণীভিত্তিক'' আইন, যা নাকি অনুচিত। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণের প্রায় সব রাজ্যে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলো। কিন্তু ফাঁক ফোকর রয়ে গেল।

শীতল যুদ্ধের ছায়া শ্রমিক সংগঠনের উপর পড়েছিল। ট্রেড ইউনিয়নকে কমিউনিস্ট প্রভাব মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আইন পাশ হয়েছিল। আশির দশকে রেগান আমলে 'এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার'-দের ধর্মঘট যে ভাবে ভাঙা হয়েছিল, তা বিগত যুগের শ্রম যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বর্তমানে সমাজ চিত্র বদলেছে। যান্ত্রিকীকরণ ও অপেক্ষাকৃত কম প্রযুক্তি এবং মজুরি সম্পন্ন কাজ দেশের বাইরে রপ্তানি শিল্প শ্রমিকদের সংখ্যা ও গুরুত্ব কমিয়েছে। বেড়েছে সার্ভিস সেক্টর। বলা হয় যত মার্কিন কর্মী ইস্পাত বানায় তার চেয়ে বেশি হামবার্গার বেচে। তবে র‍্যাডিকাল আন্দোলন ও তার কারণ মিলিয়ে যায়নি। এই তো সেদিন ''ওয়াল স্ট্রিট দখল'' আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ সামিল হয়েছিল। যে সব মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি বিদেশে বিনিয়োগ করে, তাদের শ্রম সংক্রান্ত রেকর্ড খুব ভালো নয়। যেমন মেক্সিকোর সীমান্তবর্তী ''মাকিলাদোরা'' শিল্পাঞ্চলে। জুতো কোম্পানি নাইক-এর খাস তালুকে বর্ণবিদ্বেষের আমলে দক্ষিণ আফ্রিকায় মার্কিন বিনিয়োগ অপ্রতুল ছিলনা।

সার্ভিস সেক্টরের ক্ষেত্রে কর্মী সংগঠন অপেক্ষাকৃত কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বর্তমানে ওয়ালমার্টে ধর্মঘট চলছে। ওয়ালমার্ট বিশ্বের বৃহত্তম বিপণন সংস্থা। ভারতে খুচরো ব্যবসায় তাকে আনার ব্যাপারে মনমোহন সরকার অত্যুৎসাহী। ওয়ালমার্টের মালিক ওয়ালটন পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। মনে করা হয়, তাদের সম্পত্তির পরিমান ১৪৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি। বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান ওরাই করে। দুনিয়া জুড়ে কর্মীর সংখ্যা ২২ লক্ষের অধিক। তবে খোদ মার্কিন মুলুকে ওয়ালমার্টে একজন কর্মীর বার্ষিক মজুরি ২৫০০০ ডলারের কম। মার্কিন মানদণ্ড অনুযায়ী যা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আন্দোলন, ধর্মঘট।

দেবযানী-সঙ্গীতার বিষয়টি যে ভাবেই বিচার করা হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে সত্যবাদী, নিয়মানুবর্তী ও শ্রমিক দরদি হিসাবে তুলে ধরা কি সাজে?

ভূমিজীবী মানুষের ভূমি অধিকার

৮৭ পৃষ্ঠার পর

গেছে। ভূমি আইনগুলি এখন কর্পোরেট পুঁজির সেবক।

বিষয়টা যেটা দাঁড়াচ্ছে, জমির উপর ভূমিজীবীদের অধিকার বহাল থাকছে না। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে,পুঁজির অধিকার, কর্পোরেট অধিকার। আর এই অধিকার হরণের কাজটি হচ্ছে রাষ্ট্রের মাধ্যমে, উন্নয়নের দোহাই পেড়ে। এমন একটা উন্নয়ন যেখানে ভূমিজীবীদের কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। আছে কেবল উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন রাষ্ট্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, ''রাষ্ট্র হলো শ্রেণী আধিপত্যের সংস্থা, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণী পীড়নের সংস্থা, রাষ্ট্র হলো এমন 'শৃঙ্খলার' প্রতিষ্ঠা, যাতে শ্রেণী সংঘাত নরম করে এই পীড়নকে বিধিবদ্ধ ও কায়েম করে।''[১২] যে অভিজ্ঞতা এতক্ষণ আমরা আলোচন করলাম, তাতে রাষ্ট্র সম্বন্ধে লেনিনের থেকে ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। কাজেই মানুষের সামনেই এখন একটাই কাজ— সংঘবদ্ধ হওয়া, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। পুঁজি অভিমুখীর বদলে শ্রম অভিমুখী উন্নয়নের জন্য, পাল্টা শ্রেণী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনিবার্য উত্তর— শ্রেণী সংগ্রাম।

তথ্যসূত্র

1. *Global Land and Water Grabbing* : Maria Cristina Rullia, Antonio Savioria, and Paolo D'Odoricob. PNAS 2013
2. India Waterportal : www.indiawaterportal.org/post/34608
3. *Global Land Grab* : Terry J Allen
4. *Undemocratic and Arbitrary: Control, Regulation and Expropriation of India's Forest Commonlands* : Shankar Gopalakrishnan 2012
5. *The Economic Times*, 27 Feb 2011
6. *Household Ownership Holdings in India, 2003* : NSS 59th Round
7. *Common Property Resources in India*, 1998 : NSS 54th Round
8. *People and Forests in Asia and the Pacific* :FAO Paper, 1997
9. *India Tribes after Sixty Years* : Walter Fernandes
10. *Undemocratic and Arbitrary Control, Regulation and Expropriation of India's Forest and Common Lands* : Shankar Gopalakrishnan, 2012.
11. *PESA, Left-Wing Extremism and Governance: Concerns and Challenges in India's Tribal Districts* : Ajay Dandekar & Chitrangada Choudhury, Institute of Rural Management, Anand
12. *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* : ভি আই লেনিন

অনীক

বার্ষিক সূচি : ২০১৩

ঘটনা প্রবাহ

প্রবন্ধ

সাক্ষাৎকার

নাটক

গল্প

কবিতা

গ্রন্থ আলোচনা

পত্রপত্রিকা থেকে

দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা

পিট সিগার প্রয়াত

বিশ্ব লোকসঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী পিট সিগার প্রয়াত। গত ২৭ জানুয়ারি নিউইয়র্কের প্রেসবিটারিয়ান হাসপাতালে ৯৫ বছর বয়সে থামলো ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। জন্ম : ১৯১৯ সালের ৩ মে। মাত্র ১৬ বছরের হাতে তুলে নেন প্রায় হারিয়ে যাওয়া বাদ্যযন্ত্র ব্যাঞ্জো এবং লোকসংগীতের উৎসমুখে মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে জুড়ে দেওয়ার মহা দায়িত্বে সারা জীবন উৎসর্গ করেন।

যৌবনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। প্রশাসনের কালো তালিকাভুক্তও হন। চিহ্নিত হন 'দেশদ্রোহী' হিসাবে— যেমনটা সেই ম্যাকার্থি জমানায় প্রায়ই ঘটত কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে। তবে বাধাবিপত্তিকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে চালিয়ে গেছেন পুঁজিবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। হাতিয়ার : যৌবনের বন্দনায় উন্মুখ তাঁর কালজয়ী সব গান, যা গত শতকের চারের দশক থেকে কোনো না কোনো গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সবসময়েই সম্পৃক্ত থেকেছে।

চারের দশকে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন, পাঁচের দশকের মানবাধিকার রক্ষার লড়াই, ছয়ের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী প্রচার, পরিবেশবাদীদের স্বপক্ষে সাতের দশক জোড়া লড়াই— সর্বত্রই পিট সিগার এগিয়ে এসেছেন। সঙ্গে থেকেছে তাঁর পাঁচ তারের ব্যাঞ্জো আর সাত তারের গিটার।

সম্ভবত তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি আফ্রো-আমেরিকান সিভিল রাইট্‌স মুভমেন্টের সময় রচিত ''উই শ্যাল ওভারকাম...'', যা আদতে আমেরিকার কালো চামড়ার কমপোজার অ্যালবার্ট টিন্ডলে-র গির্জার প্রার্থনাসঙ্গীত ''উই উইল ওভারকাম...''-এ ''will''-এর পরিবর্তে ''shall''— এই নিশ্চয়তাবাচক ক্রিয়াপদ প্রয়োগে বিনির্মিত বিগত দশকের জনপ্রিয়তম গণসঙ্গীত।

যুদ্ধবিরোধী ''Where have all the flowers gone'', শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে ''If I had a hammer'', স্প্যানিশ কবি হোসে মার্তি-র গুয়ান্তেনামেরা অবলম্বনে কিউবার জন-আন্দোলনের গান প্রভৃতি পিট সিগারকে সংগ্রামী মানুষের স্পন্দনে অমর করে রাখবে।

শেষবার কলকাতায় আসেন ১৯৯৬-এ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট সম্মানে ভূষিত করে। নাতি রডরিগ ও সুমন চট্টোপাধ্যায়ের (বর্তমানের কবীর সুমন) সঙ্গে নজরুল মঞ্চে গেয়ে গেছেন একের পর এক গান। মাত্র তিন বছর আগেও 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলনে যৌবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পথে হেঁটেছেন ৯২ বছরের এই তরুণ। সারা বিশ্ব জোড়া অগুনতি মেহনতি মানুষের কণ্ঠে আজ মিশে গেছে পিট সিগারের গান।